



RAP

বৈশাখ ১৩৬৭

এপ্রিল ১৯৬০



শ্রীহীরেন গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীগায়ত্রী চক্রবর্তী ( সম্পাদিকা ) শ্রীরূপেন্দু মজুমদার ( কর্মসচিব )

" শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

"

অধ্যাপক শ্রীঅমল ভট্টাচার্য ( সভাপতি )

এই সংখ্যার সম্পাদনী সভা





ছবির ব্লক তৈরী করেছেন : শ্রীস্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাভানা খ্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

		সূ চী প ত্র

• • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	• •
কলেজ প্রদঙ্গ		2
রণসঙ্গীত	রামচন্দ্র মিত্র	3.
আমার ডায়েরী থেকে : নাট্যাচার্যের সান্নিধ্যে	শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩
একটি প্রত্যয়	মহীতোষ বিশ্বাস	২৩
সাধারণ মেয়ে	বিমলেন্দু বস্থ	२8
কবিতা : মর্ম ও স্থর	দীপক রুদ্র	२२ं
হুটি কবিতা	স্থ্রজিৎকুমার দাশগুপ্ত	৩৩
ডোভারের উপকূলে	এম. আর্নল্ড্ । অনুবাদ : অমিয় বস্থ	9¢
-খেলার মাঠে কয়েকদিন	দিব্যহ্যতি হাজরা	ওণ
দেওঘরে : সকাল	কাননবিহারী গোস্বামী	89
ঘসা হু'আনি	রূপেন্দু মজুমদার	88
রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাঙলা কবিতা	অশান্তকৃষ্ণ দেব	¢ 0
ফ্রয়েড ও নবমূল্যবোধ : মাক্স বাদীর দৃষ্টিতে	পল্লব সেনগুপ্ত	<b>« «</b>
বিংশ শতাব্দীর অপেরা	স্বহাস চৌধুরী	¢ ዞ
ন্থবিশত	অধ্যাপক শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার	৬৫
সমালোচনা ৭৩	আমাদের কথা ৭৭	

STUDENT INDISCIPLINE	Editorial	1
A NEWCOMER'S IMPRESSIONS	Gautam Chakravarti	4
ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE INTELLE	CTUAL	
	Pranab Kumar Bardhan	6
On Saying No	Samir Das	12
PURE POETRY	Paritosh Sanyal	15
PIRENNE AND THE DECLINE OF ANTIQUITY	Dilip Kumar Chakraborty	19
THE NEW MOON : A SKETCHY SKETCH	Syed Tanweer Murshed	21
ENCOUNTER	Sasthibrata Chakravarti	23
BETRAYAL OF DEMOCRACY BETWEEN THE V	Vorld Wars	
	Premendra Addy	27
SYMMETRY, PARITY AND ANTIMATTER	Chanchal Kumar Mazumdar	32
THE CONDEMNED	Manish Nandy	37
INDIA SEARCHES FOR 'LIQUID MINERAL HYDI	ROCARBONS'	
· ·	Rabindu Narayan Roy	41
A CASE OF FEUDALISM IN INDIA	Dilip Kumar Basu	44
PROSODY FOR BEGINNERS	Nemai Chand Roy	50
DESCARTES' PROOFS OF THE EXISTENCE OF C	GOD : A CRITIQUE	
	Madhumati Hajara	54
ARISTOTLE'S CONCEPT OF TRAGIC KATHARS	s Shukla Roy	59



প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

বৈশাথ ১৩৬৭

এপ্রিল ১৯৬০

# কলেজ প্রসঙ্গ

কলেজ পত্রিকা আমাদের স্বাধীন চিন্তার স্বাক্ষর। এটা পত্রিকার দ্বিচন্ধারিংশৎ জন্মদিন ; এতদিন ধরে কলেজের সামগ্রিক সত্তার অথগুতা এর মাধ্যমে ধরা পড়েছে। প্রায় অর্ধশতান্ধী আগে যেদিন পত্রিকার উদ্বোধন হয়েছিল, সেদিনকার নিশ্বাস অন্থভব করছি।

العانية المعالية ال معالية المعالية معالية معالية معالية معالية معاليية معالية معالية معالية معالية م

ংতৰ গৃষ্টাৰে—"A command of the English language and a familiarity with its literature and science have been acquired to an extent rarely equalled by any schools in Europe...The moral effect has been equally remarkable."

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে—"ইংরেজির পরিমাণ ও মান আমাদের পাঠক্রম থেকে কক্ষে যাবে সত্য এবং যাওয়াও উচিত।…যে শক্তি আগে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করতে ব্যয়িত , হত তাকে নিয়োজিত করতে হবে উন্নত মানের শিক্ষালাভের জন্তু।"°

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে----"···সংস্কৃতকে বাদ দেবার ইচ্ছা ছাত্রদের মধ্যে বেশী প্রবল, না বিশ্ববিত্তালয়-কর্তৃপক্ষের মধ্যে বেশী প্রবল, তা আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়, কারণ

<sup>&</sup>gt; Presidency College Magazine, Vol. III, January 1917 "The Beginnings of English Education in India"-D. G.

 $_{\bigcirc}$   $\gtrless$  Ibid. Passage quoted from the Report of the Committee of Public Instruction

৩ প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা, পৌষ ১৩৫৪. সম্পাদকীয় : ''শিক্ষাব্যবস্থা ও নতন পরিবেশ''

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের নিয়ম-অন্থসারে ইংরেজী অনার্দের ছাত্র সংস্কৃতকে পাশের বিষয় হিসাবে নিতে পারলেও বাংলা অনার্দের ছাত্র সে-সম্মানের অধিকারী নন। নিজের দেশের পুরাতন ও নৃতন ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে একই ব্যক্তি একসঙ্গে অনেক কিছু জেনে ফেলবে, এটা বোধহয় অপরাধ।"'

👞 আজি হতে শতবর্ষ পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ কি বলবে কে জানে। কিন্তু আমরা যা বলব তা হারিয়ে যাবে না।

পরীক্ষাজগতে কৃতী বলে প্রেদিডেন্সি কলেজের একটা পরিচয় আছে। সার্থক অন্তিত্ব কৃতিত্বের চেয়ে বড়। কলেজ যে অন্তিত্বের অধিকার হারায় নি, এ মুখপত্র তার প্রমাণ। ছাত্রছাত্রীদের সম্পূর্ণতর সহযোগিতায় এবং কর্তৃপক্ষের প্রচুরতর অর্থসাহায্যে এ প্রমাণ আরো উচ্জল হত নিঃসন্দেহে। কলেজ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রী এইচ্. আর্. জেম্স্ লিখেছেন—"There will be six issues in the year three from July to September, three from November to March." মন্তব্য নিশ্রযোজন।

অধুনা কয়েক বছরের সম্পাদকদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমাকেও পরীক্ষাব্যবস্থা এবং অবদর-অভাবের দোহাই দিতে হচ্ছে। তবে আগামী সম্পাদক এবং বিভার্থিদের কাছে আমার অন্থরোধ, তাঁরা যেন নেহাৎই অকেজো এ দোহাইটাকে শেষকথা বলে শিরোধার্য না করেন। "Activity without insight"-এর চক্রব্যুহ থেকে নিজেদের বাঁচানোর দায়িত্ব একান্ডই তাঁদের।

আপাত-দৃষ্টিতে এবং গভীরতর নিরীক্ষায় এ সংখ্যায় অনেক ক্রটি ধরা পড়বে, এ কথা অনস্বীকার্য। আমাদের তারুণ্য আর অনভিজ্ঞতা---চিরকালের এ হুটো প্রথাসর্বস্ব কারণ হাজির করলাম না। এ বছরের ভুল আগামী বছরের পত্রিকাকে নির্ভুল হতে সাহায্য করবে--এই বিশ্বাস করবার হুঃসাহস সঞ্চয় করছি।

ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক শ্রীঅমল ভট্টাচার্য সম্প্রতি হুগলি মহনীন কলেজ থেকে আবার প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিরে এসেছেন। শ্রীমতী কাজল বস্থ ইংরাজী বিভাগে অধ্যাপনা গুরু করেছেন; বর্তমান বছরে এ বিভাগে যোগ দিয়েছেন শ্রীকালিদাদ বস্থ এবং শ্রীতীর্থংকর বস্থ।

দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী বিদেশী বিশ্ববিষ্ঠালয়ের আমন্ত্রণে আমেরিকা যাত্রা করেছেন। বর্তমানে শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য এঁর স্থান পূর্ণ করছেন।

- > প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা, বৈশার্থ ১৩৬৬. সম্পাদকীয়
- Residency College Magazine, Vol. I, 1914 "Introductory"-Prin. H. R. James

#### কলেজ প্রসঙ্গ

এই বিভাগের অধ্যাপক শ্রীতারাশংকর ভট্টাচার্য ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে অধ্যক্ষরপে যোগদান করেছেন। এঁর পরিবর্তে এসেছেন শ্রীকাত্যায়নীদাস ভট্টাচার্য। দর্শন বিভাগের আরো একটি নতুন অধ্যাপক—শ্রীজটিলকুমার মুথোপাধ্যায়।

শ্রীস্থশীলচন্দ্র দাশগুগু প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিত বিভাগ থেকে বিদায় নিয়ে সম্প্রতি বেংগল এঞ্জিনিআরিং কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দিয়েছেন। শ্রীগোপালচন্দ্র পাল তাঁর স্থান পূর্ণ করেছেন।

পদার্থবিতা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীহরিপদ রায় সম্প্রতি স্থানান্তরিত হয়েছেন। রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত লক্ষ্ণৌ ড্রাগ রিসার্চ ইন্ষ্টিটিউটে কাজ নিয়েছেন। রসায়নের অধ্যাপক শ্রীরণেন্দ্রকুমার দাস হগলি কলেজে যোগদান করেছেন; এবং হুগলি কলেজ থেকে এ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত পুনরায় প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেছেন। এ বিভাগের অধ্যাপক শ্রীপরিমলরুষ্ণ সেন সম্প্রতি স্থানান্তরিত হয়েছেন; এঁর জায়গায় এসেছেন শ্রীস্থবোধচন্দ্র চক্রবর্তী। রসায়ন বিভাগের সাম্প্রতিকতম অধ্যাপক-শ্রীতারকেশ্বর চক্রবর্তী।

অর্থনীতি বিভাগের শ্রীঅমিয় বাগ্চি সরকারী বৃত্তি নিয়ে উচ্চতর শিক্ষার্থে বিদেশযাত্রা করেছেন। এ বিভাগে যোগদান করেছেন কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র যোষ।

প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীশিবতোষ মুথোপাধ্যায় ভিজিটিং সায়ান্টিন্ট রূপে নিউ ইয়র্ক রকফেলার ইন্ষ্টিটিউটে যোগদান করেছেন। ইতিহাস বিভাগে শ্রীশ্র্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ করেছেন ও শ্রীপ্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় যোগদান করেছেন। শারীরবৃত্ত বিভাগের নতুন অধ্যক্ষ প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মুথোপাধ্যায়; এ বিভাগে যোগদান করেছেন শ্রীস্থণময় লাহিড়ী। উদ্ভিদ্বিতা বিভাগে নবাগতা অধ্যাপিকা জ্রীমতী স্থমিত্রা তালুকদার। বাংলা বিভাগ থেকে বিদায় নিয়েছেন শ্রীধীরানন্দ ঠারুর। এই বিভাগে যোগদান করেছেন শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

পরিশেষে কলেজের কলা বিভাগের গ্রন্থাগার থেকে শ্রীমুজিবর রহমান সায়েবের বিদায়গ্রহণ স্মরণ করছি। প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে তিনি সহকারী গ্রন্থাগারিকের কাজ স্নযোগ্যভাবে সম্পন্ন করেছেন।

গত আই. এ. এবং আই. এন্-সি. পরীক্ষায় আমাদের ছাত্রদের পাশের হার যথাক্রমে ৯৩'১% এবং ৯৭'৮%। আই. এ. পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে তিনজন এবং আই. এন্-সি. পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে ছয়জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। ১৯৫৯-এর বি. এ. এবং বি. এন্-সি. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর সন্মান পেয়েছেন যথাক্রমে ১২ এবং ১৮ জন। কলা বিভাগের গণিতের ছাত্র শ্রীপ্রণবকুমার লাহিড়ী ঈশানরত্তি লাভ করেছেন।

8

বিজ্ঞানে গণিতের ছাত্র শ্রীপিনাকীশংকর রায় বিশ্ববিত্যালয়ের সকল বিজ্ঞানপরীক্ষার্থিনে মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। তাঁদের সাফল্য কলেজের মথ উজ্জ্ঞল করেছে। ইতিহাস, অর্থনীতি, গণিত (বিজ্ঞান ও কলা), পদার্থবিত্যা, রাশিবিজ্ঞান (বিজ্ঞান ও কলা), উদ্ভিদ্বিত্যা, ভূতত্ব, প্রাণিতত্ব এবং ইংরাজীতে আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

১৯৫৯ সালের এমৃ. এ. এবং এমৃ. এস্-সি. পরীক্ষার ফলাফল সন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যতদুর জানা গেছে, এমৃ. এ.-তে ৩ জন এবং এমৃ. এস্-সি.-তে ৫ জন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। অর্থনীতি, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব এবং রাশিবিজ্ঞানে আমাদের কলেজের ছাত্রেরা প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। এই পরীক্ষার ফলাফলে অসম্পূর্ণতাজনিত ক্রটি থাকা সম্ভব।

১৯৫৯ দালে যথাক্রমে ইংরেজী দাহিত্যিক ডক্টর স্থামুয়েল জনসন্-এর ২৫০তম জন্মবার্ষিকী, এবং রুশ ঔপন্থাসিক চেথন্থ, ইংরাজী দাহিত্যিক ডি কুইন্সি, স্থপণ্ডিত মেকলে ও বাংলাদেশের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শতবার্ষিকী অহুষ্ঠিত হয়।

সম্প্রতি যশস্বী পদার্থবিত্থাবিশারদ শ্রী নীল্স্ বোহর কলকাতায় এসেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিত্থালয় তাঁকে অনরাব্ধি ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন। মিসৌরি বিশ্ববিত্থালয়ের প্রেসিডেণ্ট শ্রী এল্মার এলিস্ও সম্প্রতি ভারতে এসেছিলেন। বিশ্ববিত্থালয় সমাবর্তন অন্নষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে তিনি একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

শিক্ষাত্রতী- এবং শিক্ষার্থি-মহলে এ বছরের বিশেষ উল্লেথযোগ্য ঘটনা অর্থনীতির অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত ও শ্রীতাপদ মজুমদারের কলিকাতা বিশ্ববিহ্যালয় থেকে পদত্যাগ। ১৯৫৯ সালের এম্. এ. (অর্থনীতি) পরীক্ষার দিতীয় দিনে ছাত্রেরা, প্রশ্ন শক্ত এবং পাঠক্রম-বহির্ভূত, এই অজুহাতে, পরীক্ষাকক্ষ ত্যাগ করেন। বিশ্ববিত্যালয়-কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক দত্ত এবং অধ্যাপক মজুমদার (প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক)-এর মত না নিয়েই ছাত্রদের গ্রেদমার্ক দেওয়া স্থির করেন। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তাঁরা পদত্যাগ করেন।

তাঁদের বক্তব্য এই, যে—তাঁদের মত না নিয়ে গ্রেসমার্ক দিতে প্রতিশ্রুত হওয়া বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অন্তায়। এই প্রসঙ্গে তাঁরা গ্রেসমার্কদান ব্যবস্থার নিরুষ্টতার উপর মন্তব্য করেন। বর্তমান প্রাক্সাতক পরীক্ষার বিক্ষোভের পটভূমিকায় তাঁদের মহান্ আচরণ আমাদের সপ্রদ্ধ সমর্থনের যোগ্য।

১৯৫৯ সালের অর্থনীতিতে এম্. এ. ডিগ্রীধারীরা "ইকনমিক্ থিওরি"র পেপারে পরীক্ষিত না হয়েই এই ডিগ্রী অর্জন করেছেন। ভবিয়তে তাঁদের অধ্যাপনা-জীবন,

#### কলেজ প্রসঙ্গ

কর্মজীবন এবং নাগরিক-জীবনের পক্ষে এই তথ্যটি, এবং তাঁদের পরীক্ষা দেওয়ার ধরনটি, অশেষ গৌরবময় হবে সন্দেহ নেই।

এবারে অভিনন্দনজ্ঞাপনের পালা।

ইংরাজী রিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর স্করোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বাংলা সাহিত্যে গবেষণার জন্ কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের "সরোজিনী বর্ষ স্কর্বেণ পদক" লাভ করেছেন। ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর অমলেশ ত্রিপাঠী এ বৎসরের ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস (গৌহাটী)-এর অধিবেশনে আধুনিক ইতিহাস শাখার সভাপতি। ইতিহাস বিভাগের শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস বন্ধীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান- এবং সংস্কৃতি-বিষয়ক মন্ত্রণাগার প্রাণিতত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর শিবতোধ মুথোপাধ্যায়কে তিন বংসরের জন্ত জীববিতা গবেষণা সভাব সভাপদে সন্মানিত করেছেন। উদ্ভিদ্তত্ব বিভাগের ডক্টর পরমনাথ ভাচ্ড়ী ভারতীয় যাত্যের এবং কোয়েম্বাটুর এগ্রিকালচারাল কলেজ থেকে বক্ততার আমন্ত্রণে সমুদ্ধ হয়েছেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীকুলদাচরণ দাশগুপ্ত সম্প্রতি ভারতীয় স্থপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি ১৯২০ সালে এ কলেজ থেকে অর্থনীতিতে বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং ১৯২২ সালে সরকারী বৃত্তি লাভ করেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং অধ্যাপক শ্রীস্থরজিৎকুমার লাহিড়ী কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি ১৯২১ সালে এ কলেজ থেকে দর্শনে বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯২৫ সালে তিনি এ কলেজের দর্শন বিভাগে অধ্যাপনা করেন।

বিচারপতি শ্রীঅজিতনাথ রায় সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি কলেজের পরিচালক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ১৯৩১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর সন্মান লাভ করেন এবং ১৯৩৩ সালে প্রথম শ্রেণীতে এম্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৯-৩১ সালে তিনি পত্রিকার কর্মসচিব এবং ১৯৩১-৩২ সালে তার সম্পাদক ছিলেন।

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ নিথিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৩১ সালে সাম্মানিক ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীন্তে প্রথম হন।

কলেজের অর্থনীতি বিভাগে ১৯৫৩ দালে শ্রীঅমর্ত্যকুমার দেন বি. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন্। তিনি কেম্ব্রিজে অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীর ট্রাইপস্ অর্জন--করেন এবং অ্যাডাম্ স্মিথ পুরস্কার লাভ করেন। সম্প্রতি তিনি কেম্ব্রিজে ট্রিনিটি কলেজের ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন।

শ্রীবরুণ দে আমাদেব কলেজ থেকে ১৯৫৩ সালে বি. এ.-তে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর সন্মান অর্জন করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি উচ্চশিক্ষার্থে অকৃস্ফোর্ড যাত্রা করেন। সম্প্রতি তিনি অকসফোর্ডে ইতিহাসে নাফিল্ড ফাউণ্ডেশন রিসার্চ রত্তি অর্জন করেছেন।

শ্রীস্থখময় চক্রবর্তী ১৯৫৩ দালে এই কলেজ থেকে অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীর সন্মান অর্জন ক'রেন। তিনি অ্যাম্স্টার্ডাম বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ডক্টরেট উপাধি অর্জন করে বর্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ব্রত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গবেষণা করছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীসত্যজিৎ রায় "পথের পাঁচালী" ও "অপরাজিত" চিত্রের জন্ত ডেভিড্ ও সেল্জ্ নিক পুরস্কার লাভ করেছেন। ভারতীয় চিত্রপরিচালকদের মধ্যে তিনিই প্রথম এ সন্মান পেলেন।

গত I. A. S. পরীক্ষায় আমাদের কলেজের যেসব প্রাক্তন ছাত্র সাফল্য অর্জন করেছেন, তাদের মধ্যে অন্ততম প্রীত্মশোককুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রীগঙ্গাধর যশ। ১৯৫৬ সালে শ্রীচট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ইনি ১৯৫৬-৫৭র কলেজ পত্রিকার সম্পাদক। ১৯৫৭ সালে ইনি উচ্চশিক্ষার্থে কেম্ব্রিজ যাত্রা করেন, এবং বিদেশেই I. A. S. পরীক্ষার লিখিত অংশটি সম্পন্ন করেন। শ্রীষশ ১৯৫৭ সালে বি. এ. পরীক্ষায় অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন।

কলেজের পক্ষ থেকে এঁদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

\*

এ বছর কলেজ যাঁদের হারিয়েছে তাঁদির মধ্যে অন্ততম—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীস্থরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগিবিজাপ্রসন্ন মজুমদার, শ্রীরণজিৎকুমার লাহিড়ী, শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীমতী শ্রীলা গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীকালীপদ দাশগুপ্ত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯০৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ পাশ - করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রখ্যাতনামা সাহিত্যস্রষ্টা। "বিচিত্রা" পত্রিকার সম্পাদক-রূপে বাংলাদেশ তাঁকে স্মরণ করবে।

শ্রীষ্থবেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০১ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯০৭ সালে তিনি প্রথম শ্রেণীতে এম্ এ (উদ্ভিদ্বিত্থা) উত্তীর্ণ হন। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল অবধি স্থদীর্ঘ পঁচিশ বংসব ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজের উদ্ভিদ্বিত্থা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। এঁর পিতা স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি উজ্জল জ্যোতিষ্ণ। ১৮৬০ থেকে ১৮৬৬ সাল অবধি তিনি অবিচলিত গৌরবে এই কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং কিছুকাল গণিত বিভাগে অধ্যাপনা করেন। তাঁর বহু পরিচয়ের মধ্যে একটি—তিনি কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্ষ।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার ১৯১৪ দালে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান কবেন। ১৯২২ দাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যস্ত তিনি উদ্ভিদ্বিন্থা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি

ঙ

#### কলেজ প্রসঙ্গ

ইডেন হিন্দু হস্টেলের কিছুকাল সহকারী স্থণারিন্টেণ্ডেন্ট্ ও কিছুকাল স্থণারিন্টেণ্ডেন্ট্ ছিলেন।

শ্রীরণজিৎকুমার লাহিড়ী ১৮৯৭ থেকে ১৮৯৯ সাল অবধি এ কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি যথাক্রমে ১৮৯৮ ও ১৮৯৯ সালে বি. এ (দর্শন) ও এম্. এ. (দর্শন) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৯১৮ থেকে ১৯২১ সাল অবধি ইংরাজী বিভাগে অধ্যাপনাঁ করেন। বর্তমান ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকেই তাঁর ছাত্র ছিলেন।

শ্রীমতী শ্রীলা গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৫১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সাম্মানিক দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন—এবং ১৯৫০ সালে দর্শনে এম. এ.-তেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। সরোজিনী নাইডু কলেজের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা থাকাকালীন অত্যস্ত তরুণ বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি এ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপক, "ইণ্ডিয়ান্ স্ট্যাটিষ্টিকাল ইনষ্টিটিট্ট্"-এর প্রতিষ্ঠাতা (অধুনা অধ্যক্ষ), শ্রীপ্রশাস্তচন্দ্র মহলানবীশের লাতুপুত্রী।

শ্রীকালীপদ দাশগুপ্ত ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল অবধি এ কলেজের ইংরাজী বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি উচ্চতর শিক্ষার্থে ইংলণ্ড যাত্রা করেন ও লণ্ডন বিশ্ববিহ্বালয়ের ডক্টরেট লাভ করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি আবার এ কলেজের ইংরাজী বিভাগে যোগদান করেন। সম্প্রতি তিনি কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। অধ্যাপনাকালীন তাঁর আকন্মিক মৃত্যু সকলকে অভিভূত করেছে।

কলেজের পক্ষ থেকে এঁদের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং এঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে গতীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

এ বছরে আমাদের দেশে যেসব মনীষীরা লোকান্তরিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্ততম নাট্যাচার্য শ্রীশিশিরকুমার ভাড়ড়ী, পণ্ডিত শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্বী ও পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

সম্প্রতি বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক Albert Camus-এর মৃত্যু জগতের হুংথের বিষয়। তার রচিত "The Myth of Sisyphus" ১৯৫৭ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করে। বিপ্লবী ভাস্কর এপ্স্টাইন্-এর মৃত্যু যুরোপীয় ভাস্কর্যের একটা যুগাবসান ঘটালো।

বিজ্ঞান-জগং থেকে তিরোধান করেছেন R. A. Millıkan এবং C. T. R. Wilson। Millikan-এর অণু-পরমাণু সম্বন্ধীয় গবেষণা বছবিখ্যাত। ১৯২৩ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। Nuclear particle detection-এর প্রথম আবিষ্কৃত উপায়গুলির মধ্যে Wilson's Cloud Chamber অন্যতম।

সম্রতি Lady Mountbatten এর মৃত্যু ভারতের পক্ষে বিশেষভাবে শোঁকাবহ। এঁদের শ্বতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধাঞ্চলি অর্পণ কর্ছি।

তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স অনতিবিলম্বেই চালু হবে। তার জন্ত সরকার এখনে কোনো বিশেষ আয়োজনের নির্দেশ দেন নি। তবে এই নতুন কোর্স কলেজে প্রতিষ্ঠিত হলে--ইউনিভার্সিটি প্রেপারেটরি কোর্স (১ বংসর) এবং ডিগ্রী কোর্স (৩ বংসর)-এর সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো প্রাক্সাতক ও সাতক শিক্ষাব্যবস্থাও অন্তত আপাতত স্থায়ী থাকা উচিত। তার জন্ত অধ্যাপক-সংখ্যা এবং কলেজের আয়তন বহুলভাবে রুদ্ধি করা প্রয়োজন।

এমন একটা গুজব শোনা যাচ্ছে যে, পরিমিত অধ্যাপর্ক-সংখ্যার জন্ত, তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স চালু হবার সঙ্গে সঙ্গেই, সরকার এ কলেজ থেকে বর্তমান স্নাতক শিক্ষাব্যবস্থা তুলে দেবেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে কলকাতা তথা বাংলার শ্রেষ্ঠ ছাত্রছাত্রীরা পড়তে আসেন। এই নিয়ম জারি হলে, পুরাতন প্রথায় প্রাকৃঙ্গাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ উজ্জ্ব ছাত্রছাত্রীদের উপর অত্যন্ত অবিচার হর্বে।

আগ্নতনবৃদ্ধির প্রয়োজন কলেজ এখনই অন্নতব করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা যে কদিন কলেজে হয়, ততদিন অত্যস্ত দর্বার্গারি টিউটোরিআল ক্লাসগুলি প্রায়ই বন্ধ রার্থতে হয়। "আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র গবেষণাগার"-এর সংলগ্ন নতুন বাড়ি এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, এবং সেটি যে কবে থেকে ব্যবহারযোগ্য হবে সে সম্বন্ধেও কোনোই স্থিরতা নেই।

- তা ছাঁড়া, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলনের পর সমস্ত স্থলে নতুন পাঠক্রম পড়ানোর পক্ষে যথার্থ উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায় নি। কিন্তু নতুন ডিগ্রী কোর্স আয়তন এবং জটিলতায় কিছু কম যায় না। অবশ্বই এই নতুন ব্যবস্থার ভালমন্দ বিচার এখনো অলস ভবিশ্বদাণীর কোঠায়। তবুও এই সব কথাগুলি চিন্তা করা প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি।

১৯১৭ সালে ( হিন্দু কলেজের সে বছর শতবর্ষজয়ন্তী ), সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজে স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানের অধিকার নাকচ করেন । কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, শ্রী এইচ. আরু. জেম্স্ ইংলণ্ড থেকে পত্রে এর বিরুদ্ধে-তীব্র প্রতিবাদ করেন ৷ বলা বাহুল্য, সে প্রতিবাদ ফলপ্রস্থ হয় নি ৷ ১৯৫১ সালের "ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট"-এ সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজকে একটি "কন্ষ্টিটিউএণ্ট কলেজ" বলে সম্মানিত করেন, অর্থাৎ তাকে সাতকোত্তর শিক্ষাদানের অধিকারে পুনংপ্রতিষ্ঠিত করেন ৷ ১৯৫৩ সাল থেকে এই অ্যাক্ট কার্যকরী হয় ৷ কিন্তু অত্যন্ত হংথের বিষয় এই যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্সি কলেজের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সরকার শুধু নামেই স্বীকার করেছেন ; স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানের আয়োজনকল্পে কলেজ এ পর্যন্ত কোনো সাহায্য পায় নি ৷ আজ তাই মনে হচ্ছে যে নতুন ব্যবস্থার প্রচলনের পূর্বে পুরাতন অব্যবস্থার দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। আমাদের কলেজের স্নাতকেরা যখন বিশ্ববিত্তালয়ে পদার্পণ করেন, তখন কিছুকালের মধ্যেই তাঁদের শিক্ষার আগ্রহ ও উত্তম বিক্ষিগ্ত হয়, প্রেসিডেন্সি কলেজের নিবিড় অধ্যাপক-ছাত্র সম্পর্কের পরিবর্তে তাঁরা একটা ভয়াবহ ব্যক্তিনিরপেক্ষতার সম্মুখীন হন, এ কথা কোন অংশেই অতিশয়োক্তি নয়। গত "প্রতিষ্ঠাত্দিবস সভা"য় এই অশ্বস্তিকর পরিস্থিতির জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয়কে ব্যাপকভাবে দায়ী করা হয়। কিন্তু বোধ করি, এ বিষয়ে সরকার আপন অধিকার দাবি করলে, বিশ্ববিত্তালয় সে দাবি নিশ্চ্য়ই মেনে নেবে।

এই হুত্রে গ্রহাগার সম্পর্কে তুটো অভিযোগ মনে পড়ছে। প্রথমতঃ, সকালসন্ধ্যে (কলেজের সময়ের আগে ও পরে) এবং রবিবারে গ্রহাগার ব্যবহার করবার জন্ত ছাত্রেরা বহুকাল ধরে উৎস্থক। এই ব্যবহার জন্ত লাইব্রেরির কর্মচারিদংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন---এই অন্থরোধও কর্তৃপক্ষ কম দিন গুনছেন না। তারা এই অভাব সম্বন্ধে সচেতন হলে কলেজের মঙ্গল।

দিতীয়তঃ, গ্রন্থাগারের বই বাঁধাতে দিতে হয় আলিপুরে সরকারি দপ্তরীখানায়। দেখানে ছশো'র বেশি বই একবারে নেওয়া হয় না; এবং বই বাঁধিয়ে ফিরে আসতে ছ-তিন বছর লাগে। উদাহরণ স্বরূপ, গুধুমাত্র শেক্স্পিয়রের গ্রন্থাবলীর মধ্যেই W. J. Craig ও R. H, Case সম্পাদিত আর্ডেন গ্রন্থমালার "Measure for Measure" (1905). "The Tempest" (1905), "The Tragedy of King Richand II" (1912); William J. Rolfe সম্পাদিত "Much Ado About Nothing" (1879); ও Alexander Chalmers সম্পাদিত শেক্স্পিয়র গ্রন্থাবলীর তৃতীয় থণ্ড (১৮২৩), বহুকাল ধরে দপ্তরীখানায় পড়ে আছে। এতে, এবং বই রাখবার নির্নন্ট ব্যবস্থার দরুন, সরকারের নিজেরও কম ক্ষতি হচ্ছে না।

পরিশেষে কয়েকটি চিরপরিচিত অভিযোগ জানাচ্ছি। কলেজে একটি ভন্তগোছের ক্যান্টিন এবং কমন্কমের অভাববোধ ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কলেজ Hall-এর অভাব এ শতান্ধীর স্হচনা থেকে অধ্যক্ষ-অধ্যাপক-ছাত্র নির্বিশেষে সকলেই অহুভব করছেন। অনেকদিন ধরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হলের স্বপ্ন দেথছে। আরো কতদিন দেখবে কি জানি!

# রণসঙ্গীত

# রামচন্দ্র মিত্র

[ হিন্দু কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের স্থবিখ্যাত অধ্যাপক ডেভিড লেসটার রিচার্ডসনের Battle Song Addressed to the British Sepoys কবিতাটি বাংলায় অন্থবাদ করেন সেই কলেজেরই বাংলার অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র। এই অন্থবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ৪ঠা আগস্ট ১৮৩৮-এর Bengal Harkara & Chronicle পত্রিকায়।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত সাহিত্যসাধক চরিতমালা থেকে রামচন্দ্র মিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। রামচন্দ্র (১৮১৪-১৮৭৪) হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর আমলে শিক্ষালাভ ক'রে ১৮৩০ গ্রীষ্টান্দের ১লা মার্চ থেকে এই কলেজেই শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ৩০ বংসর অধ্যাপনার পর ১৮৬২ গ্রীষ্টান্দের শেষাশেষি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তিনি অবসর নেন। এঁর রচিত ছটি বইয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে : রামচন্দ্র বিত্তাবাগীশের রচিত 'হিন্দু কালেজ পাঠশালার পাঠারগুকোলে বক্তৃতা'র ইংরেজি অন্থবাদ (১৮৪০) এবং 'মনোরম্য পাঠ ১ম ভাগ' (১৮৫৫)। এ ছাড়া কলিকাতা ক্ষুল বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত পঞ্চবলি নামে একটি বাংলা মাসিক প্রত্নিরার দ্বিতীয় পর্যায় তিনি পরিচালনা করেছিলেন। নব্যক্ষ পরিচালিত 'জ্ঞানাহেষণ' পত্রিকার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। 'জ্ঞানোদন্ন' নামে একটি পত্রিকা এবং 'পক্ষির বিবরণ' নামে একটি পুন্তিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

অন্মবাদে কবিতাটির কোনো নাম ছিল না। 'রণসঙ্গীত' নামটি আমাদের দেওয়া।

—ভৰতোষ দত্ত ]

### BATTLE SONG

### Addressed to the British Sepoys

#### Ι

Oh ! Warriors of India ! whose hearts are with ours, The foe is around us—the battle-cloud lowers— But the glory of England still gleameth afar, And the darker the tempest, the brighter her star !

#### Π

Oh 1 Warriors of India ! O'er mountain and plain Qur bayonets and banners shall glitter again ! Brave comrades, unparted by colour or creed, Together we triumph, together we bleed !

### III

Remember, remember, the deeds we have done. The hosts we have vanquished, the name we have won,

### রণসঙ্গীত

Remember how long British glory endures, Remember how much of that glory is yours !

### IV

Hurrah—then—hurrah! To the bright field of fame The Pèrsian we'll startle, the Muscovite tame, The braggarts of Birmah, the hordés of Nepaul, Once more shall be driven from mountain and wall!

July, 1838

Literary Leaves or Prose and Verse chiefly written in India. vol. II, 1840, p. 113

2

ভারতবর্ষের যোদ্ধা গুন সবে ভাঁই। তোমাদের মনে যাহা আমাদের তাই। শত্রুগণ আমাদের চারিদিগে আছে। যোরতর যেন রণ ঘন নামিয়াছে॥ কিন্তু দেখ বিলাতের গৌরব সকল। অত্তপিও দূরে থাকি করে ঝলমল॥ যোরতর ঝড় যত হইবে প্রবল। ততই তাহার তারা হইবে উজ্ঞল॥

२

ভারতীয় হুর সব সমরের সাজে। চল যাই মাঠে আর শিখর সমাজে॥ আমাদের বন্দুকাদি বাণ শত শত । উজ্জল হইবে পুন অস্ত্র শস্ত্র যত॥ •সাহসী সকল সঙ্গী বান্ধব আমার। বর্ণে বর্ণে ধর্ম্মে নাই প্রভেদ প্রকার॥ একত্র হইব জয়ী সংগ্রাম সন্ধানে। মরি মরি একত্র মরিব সবে প্রাণে॥

৩

মনে কর মনে কর সে সকল মর্শ্ম। করেছি যে সব অগ্রে প্রশংসার কর্ম। মনে কর মনে কর যত যোদ্ধাগণে। সমরে জিনিয়া নাম পেয়েছি ভুবনে॥ মনে কর মনে কর যত দিনাবধি। আমাদের যশপুঞ্জ আছে নিরবধি॥ মনে কর মনে কর সেই সে গৌরব। নিয়ত যাহাতে ভাই ভাগি আছে সব॥

8 ~

জয় জয় সাবদি সাবাস জয় রবে। উজল খ্যাতির মাঠে চল যাই সবে॥ পারসে দেখাব ভয় সকল স্থ্শিয়া রুসিয়া করিব বশ রুসিয়া রুসিয়া॥ বর্ম্মাদেশী অহঙ্কারি লোক সকলের। আর যন্ত সৈন্তগণ আছে নেপালের। পুনশ্চ ভান্ধিব সে সকলের ভুর। দেশ আর পর্বাত হতে করে দিব দুর॥

# আমার ডায়েরী থেকে : নাট্যাচার্যের সান্নিধ্যে

### শনীক বন্দ্যোপাধ্যায়-পঞ্চম বর্ষ, ইংরাজী

### ১লা জুলাই, ১৯৫৯॥

কোন বন্ধুজনের চিঠি থেকে: "শোন—হাঁয়—সভ্যি ব'লছি বিশ্বাস করো—ঠিক এথুনি, এই মুহূর্তে যদি সন্তব হ'তো—ছুটে যেতাম তোমার বাড়ীতে আর তোমাকে ব'লতাম কাল সকালের বেদনাময় শ্বুতির কথা। সকাল হ'তেই কাগজ দেথে ছুটেছি ওঁর বাড়ীতে। দেখান থেকে গেছি কাশীপুর শ্বশানে। কিন্তু সব হৃংথ ছাপিয়ে আমার কান্না পাচ্ছিলো এই ভেবে যে কাল কাউকে আমি ওই শোকযাত্রার ভিড়ে পাইনি যাঁকে বাঙালী সংস্কৃতির উত্তরস্থরী মনে হতে পারে।…'শিশিরকুমারকে তুমি বুবেছো'—এই তোমার মন্তব্য। কিন্তু আমি জানি আমি বুঝিনি—না—না—কেউ বোঝেনি ওঁকে—কেউ না—কেউ না— তাহ'লে আজ শোকযাত্রার রূপ ভিন্ন হ'তো। বাঙলাদেশের সমন্ত রঙ্গালয় আর চিত্রগৃহ পরমাত্মীয়ের বিয়োগব্যথা অন্থভব ক'রতো। আর আমরা বাঙালী ছাত্ররা বাঙলা রূপ-লোকের চিত্ররথ গন্ধর্বের জন্তে চোথের জল ফেলতাম। তুমি শিশিরকুমারের অন্থরাগী ভক্ত—দে নিষ্ঠা তোমার কর্মে ও কথায় পেয়েছি অনেকবার। নিজের মত ক'রে ভাবার হুর্লভ ক্ষমতাও তোমার আছে। তাই তোমার কাছে আমাদের ঝণস্বীকার শুধু স্বীকার ক'রেই যদি ফুরিয়ে যায়—তাঁকে আমরা কাজে না লাগাতে পারি যদি—যদি স্থদে না বাড়াতে পারি—তবে এই হবে আধুনিক বাঙালী চিত্তের শক্তিশেল।"

### ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ ৷৷

বাদে যেতে যৈতে "গ্রন্থজগৎ"-এর দেবকুমার বস্থর দঙ্গে দেখা। খবর পেলাম, আগামী ২রা অক্টোবর নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের জন্মবার্যিকী পালন ক'রবে—আমন্ত্রিত হ'লাম। জ্ঞানলাম, নাট্যাচার্যকে ঘিরেই গ'ড়ে উঠেছে এই ছোট্ট গোগ্ঠী—গোগ্ঠীর পুরোভাগে আছেন শ্রীবিনয়ক্তফ দত্ত, শ্রীভোলা চট্টোপাধ্যায়, ডাং রাম অধিকারী প্রমুখ। সেদিনই স্থির ক'রলাম, পরিষদের বৈঠকে নিয়মিত যোগ দেব।

[ ···তারপরে তিন মাস নব্য বাংলা নাট্য পরিষদের বৈঠকে যোগ দিয়েছিলাম। নাট্যাচার্য নিয়মিতই আসতেন—নানা কথার কিছু কিছু আমি টুকে রাথতাম। ]

### ৩রা অক্টোবর, ১৯৫৮॥

গতকাল নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাহুড়ীর পাশে ব'দে তাঁর কথা শুনেছি। "নাটক জমানোর কথা ব'লছ ? এখনও একটা পাদপীঠ দাও, আর যে-কোন একটা

Ŷ

নাটক দাও, জমিয়ে দিচ্ছি। নাটক ভালো হোক খারাপ হোক, it must suffer a seachange, if the actor is worth anything."

"যখন আমি আর দর্শক এক হ'য়ে যাই, যখন জানি, আমি কথা ব'লছি, আর এতগুলো মান্নুষ মাচছে, that one moment"—ব'লতে ব'লতে শিশিরকুমার থেমে গেছলেন। সারা ঘর স্তব্ধ হ'য়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে—অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে ব'ললেন, "সে আমি বোঝাতে পারব না।"

"মাঝে মাঝে এক-একটা পার্ট অভিনেতাকে গ্রাস করে। কিন্তু অভিনেতা কখনও পুরোপুরি নিজেকে ভুলতে পারে না—-সে মনে রাথে, আর এগোলে আলো পাবে না, সে জানে, পাশের লোকটার মুথ দেথাতে হবে।"

কবিতা সম্পর্কে কথা হ'চ্ছিল। প্রথমে ইংরেজি কবিতার প্রসঙ্গ। শিশিরকুমার ব'ললেন, "টেনিসনের কবিতা আমার কোনদিন ভালো লাগে নি, আজো লাগে না। ব্রাউনিং ভালো। আমার বায়রনকে খুব ভালো লাগে—হয়তো খুব depth নেই—কিন্ত Don Juan আশ্চর্ষ। আধুনিক ইংরেজি কবিতা ? আমার মন ব'লছে, ও একশো বছর পরে টিঁকবে না।" কে একজন বাংলা কবিতার কথা তুললেন—শিশিরকুমার ব'ললেন, "আধুনিক বাংলা কবিতার প্রগতির কথা ব'লছ ? ইংরেজি কবিতায় স্নইন্বার্ন জবিধি যে variety আছে, তা' আমাদের নেই।"

আবার অভিনয়ের কথা এল। "আটচল্লিশ বছর ধ'রে অভিনয় ক'রেছি, ১৯০৮ থেকে ১৯৫৬। হু'টো যুগকে বেঁধে রেখেছি। আমার থিয়েটারের দরজা খোলা থেকেছে। কত নদী ব'য়েছে, শুকিয়ে গেছে। কত লোক এসেছে, কত লোক গেছে। আমি অভিনয় ক'রে গেছি। একবার শুধু বাইরে গেছি—নিউইয়র্কে গিয়ে ছ'মাদ ছিলাম, অভিনয় ক'রলাম।"

হঠাৎ কথার মধ্যে গর্জন ক'রে উঠলেন, "জেনে রেখো, দেব্ ( দেবব্রত মুথোপাধ্যায় — শিল্পী ), a white man can never be my friend !"

বিদায় নেবার সময় প্রণাম ক'রে পরিচয় দিলাম। উনি আশীর্বাদ ক'রে ব'ললেন, "তোমরাই সব, তোমরা বড় হও। I'm drying up."

কাল "নরনারায়ণ"-এর শেষ পর্ব প'ড়ে শোনালেন।

১৭ই অক্টোবর, ১৯৫৮॥

কালকে শিশিরবারু "দিগ্রিজয়ী" পাঠ আরম্ভ ক'রলেন।

কথাপ্রসঙ্গে ব'ললেন, "বিলেতকে একটু অগ্রাহ্য ক'রতে হবে। চারশো বছর ধ'রে 'যাত্রা' চ'লছিল ; তাকে ছেড়ে এক লাফে থিয়েটার ধ'রলাম—সেথানেই আমাদের দোষ হ'য়েছিল। আমাদের 'যাত্রা' এখনও মরে নি।" ভোলা চট্টোপাধ্যায় ( শিল্পী ) যোগ

ক'রলেন, "আমাদের 'যাত্রা' অজর, অমর, অক্ষর---আত্মার মত।" শিশিরকুমার হেসে সায় দিলেন।

কোন বাঙালী কথাসাহিত্যিক মস্কোতে চারদিন কাটিয়ে বিরাট বই লিথে ফেলেছেন। সেই প্রসঙ্গে কথা উঠতে ভোলাদা ব'ললেন, "কোন দেশ সম্পর্কে লিখতে গেলে সেখানে যাও, সেখানকার কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়, বিয়ে কর, বারো বছর পরে নিজের দেশে ফিরে এসে বই লেখ।" শিশিরবারু ব'ললেন, "তথন কলেজে ফার্ফ ইয়ার-এ পড়ি, গোঁফের রেখা ওঠেনি। হরিনাথ দে-কে গিয়ে একদিন ব'ললাম, 'শুর, ফ্রেন্চ্ শিখতে চাই, কী বই প'ড়ব ?' উনি ব'ললেন, 'Look here, my boy, the best way to learn a language is to have a mistress who speaks that language.' বোঝ আমার অবস্থা!"

ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রসন্ধে শিশিরবাবু ব'ললেন, "The dramatist must have a pictorial vision of a procession of events."

### ২৪শে অক্টোবর, ১৯৫৮॥

কালকে শিশিৱবাবু "দিগ্বিজয়ী" পাঠ শেষ ক'ৱলেন।

কথাপ্রদঙ্গে ব'ললেন, "ভগবান্ আমাকে কোন স্থবিধে দেননি—আমার চোথ ছোট, আমি বেঁটে, আমি কুৎসিত। তাই বলি, ওসবে হুঃখ করার কিছু নেই—you have to fight with them. যদি চোথ ছোট হয়, তাদের খুঁ চিয়ে বের কর—let them speak."

"শুধু কবিতা পড়ার কথা বলি কেন, নাটকেও একই কথা একেক দিন একেকভাবে . বুঝি, একেকভাবে বলি। শুধু baseটা ঠিক থাকে, আর সব-কিছু বদলে যায়। এইটেই স্বাভাবিক, you have to live through the lines.'

"যোড়শী"র রচনাকালে শিশিরকুমার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে একত্রে কাজ ক'রেছেন, যামিনী রায় তাঁর মঞ্চের সজ্জা ক'রে দিয়েছেন, দুশুপট এঁকে দিয়েছেন—সেই সব কথা ব'ললেন।

ভোলা চট্টোপাধ্যায় আধুনিক কবিতার কথা ব'লছিলেন, "সেদিন প'ড়লাম— 'আকাশে চাঁদ ছিল'। আরে, আকাশে কি হন্তমান থাকে যে, চাঁদ ছিল ব'লে কবিতা লিখতে হবে ?"

### ১৪ই নভেম্বর, ১৯৫৮ ॥

মাঝথানে দিনহুয়েক বাদ প'ড়েছিল। কাল আবার "গ্রন্থজগতে" গেলাম। শিশিরবাবু "যোড়শী" পাঠ শেষ ক'রলেন।

"যোড়শী" প্রসঙ্গে ব'ললেন, "আমি শরৎচন্দ্রকে ব'লেছিলাম, আপনি যখন লেথেন, তথন আপনি সব; কিন্তু এখানে আমি রাজা, আমার কথা শুনতে হবে। শরৎচন্দ্র শুনতেনও আমার কথা। কিন্তু মাঝখানে বাইরের লোক মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, ওঁকে গিয়ে ব'লল, আরে, ঐ ভেড়ের ভেড়ে শিশির ভাহড়ী, ওর কথা শুনে চ'লছেন ? যথন 'যোড়শী' বই বেঞ্চল, তখন চেষ্টা ক'রলেন আমার suggestionএ যা নিয়েছিলেন, তা সব পুঁছে ফেলতে। শেষ দৃশ্যে ডাক্তার আসার পরেই জীবানন্দের কথা সন্তা সেন্টিমেন্ট্যালিটি; মরবার সময় মান্থয অমন ক'রে কথা বলে না।"

ভালো অভিনেতা কে ? শিশিরকুমার প্রশের উত্তর দিলেন, "শিক্ষা সকলেরই দরকার হয়। যে সেই শিক্ষাকে আপন ক'রে নিতে পারে, তাতে নিজের কিছু ঢেলে দিতে পারে, সে-ই স্থ-অভিনেতা। একটা নাটক কি একদিনে তৈরি হয় ? অনেক রিহার্সাল চাই। একটা পার্ট অভিনেতার মধ্যে ধীরে ধীরে sink করা চাই। অবশ্য যার নিজের ভিতরে কিছু আছে, তার কথা আলাদা।"

বিনয় দত্ত শেক্স্পীয়রের নাটকের স্থত্র-আবিষ্কার-প্রয়াসের কথা তুললেন। শিশিরকুমার ব'ললেন, "লোকে বলে, শেক্স্পীয়র প্লট চুরি ক'রেছেন। তাতে কিছু এসে যায় না। তিনি যেন একটা ভাঙা হাড় থেকে এক পরমা স্থন্দরী নারী স্ঠি ক'রেছেন।"

শিশিরবার্ ব'ললেন, "রবীন্দ্রনাথ উপন্থাস লিখতে জানতেন না। যদি কোনটা অন্তত কিছুটা perfect হ'য়ে থাকে, তবে তা' চতুরঙ্গ'।" বিনয় দত্ত আপত্তি ক'রলেন, " 'চতুরঙ্গ'-কে technically perfect ব'লবেন কোন হিসেবে ? দামিনী যে-তাবে বেড়ে যায়, তাতে উপন্থাসের structure ধ'সে পড়ে।" শিশিরবার্ জবাব দিলেন, "Life-এ অমন হয়।" বিনয়বার্: "Life-এ অনেক কিছুই হয়; কিন্তু নভেলের structure আছে। তাতে সবকিছু হ'তে পারে না; তার Form আছে।" রাম অধিকারী যোগ ক'রে দিলেন, "অর্থাৎ তার জিওমেট্রি।" শিশিরবার্ জবাব দিলেন, "যদি তা-ই হয়, তবে Art-কে ছেড়ে Life-কে নেব, তাকেই বড় ব'লে মানব।" বিনয়বার্ ইতি টানলেন, "তা' ব'লতে পারেন।" রাম অধিকারী অন্থযোগ ক'রলেন, "বিনয়, তোমাদের মন্ড যাদের এমন analytical mind, তারা কখনও রসগ্রাহী হ'তে পারে না।"

কে একজন শিশিরবারুকে জিজ্ঞেদ ক'রলেন, "আপনার জীবনের best part কী ?" বিরক্ত হ'য়েই শিশিরকুমার উত্তর দিলেন, "কোন অভিনেতাই অমন কিছু ব'লতে পারেন না। যখন যে পার্ট করি, তখন সেটাই best ব'লে মনে হয়। দিগ্বিজ্ঞন্নী ক'রে যেমন আনন্দ পাই, জীবানন্দ ক'রেও তেমনই।"

নাট্যোৎসবের কথা চ'লছে। শিশিরকুমার ব'ললেন, "এবার আমাকে 'আলমগীর' ক'রতেই হবে। ও নাটকটা আমার জঘন্ত লাগে। লোকে কেন চায়, বুঝতে পারি না।"

কথায় কথায় ব'ললেন, "আমার সত্তর বছরের জীবনে দেখেছি, মাহুষ একটা কিন্তুতকিমাকার ব্যাপার। তার কোন ব্যাপারে কোন absolute statement করা যায়না।"

## ১৮ই নভেম্বর, ১৯৫৮॥

কাল শিশিরবাবু "মালিনী"র মহড়া আরম্ভ ক'রলেন।

"আমার যে বয়দ হ'য়েছে তারই প্রমাণ আজকাল আর কাঠের উপর বসতে পারি না। যথন মনোমোহন থিয়েটারে ছিলাম, তথন শানের মেঝেতে শুতাম ; তথন শরীর বেদনাকে welcome ক'রত।"

কোন অভিনেতার ক্রটি শুধরোতে গিয়ে ব'ললেন, "অভিনয়ে হাতের movement সবাই আরম্ভ করে কোমর থেকে, বিশেষত মেয়েরা। Movement আরম্ভ হবে shoulder থেকে।"

#### ২৪শে নভেম্বর, ১৯৫৮ ॥

"মালিনী"র মহড়া চ'লছে। শিশিরবারু উচ্চারণের কথা ব'লছিলেন, ওঁর মতে হুগলীর উচ্চারণই সবচেয়ে শুদ্ধ ; ওঁর নিজের কথায় আগে নদীয়া-ক্লফনগরের উচ্চারণ ছিল, এখন আর তা' নেই। গিরিশ ঘোষের ছুটো কথায় ভুল হ'ত, "মুন্ত্রী" আর "কুহুক" : "'মুন্ত্রী'টা আমি আয়ত্ত করি নি, তবে 'কুহুক'-এর ভুলটা আমারও হয়, কুহুকের কুহকে আমি এখনও আচ্ছন।"

"অধিকাংশ অ্যামেচার অভিনেতা কথা বলে ঠোঁট থেকে। কথা ব'লবে হৃদয় থেকে, আরো গভীর ক'রে ব'লতে চাইলে পেট থেকে। সাধারণ জীবনে কথা বলা আর মঞ্চে কথা বলার মধ্যে পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। এখনকার ছেলেদের ব'ললে হাসে, তরু বলি: রোজ সকালে ছাদে উঠে গলা ছেড়ে চেঁচাও, গলা হবে।"

রবীন্দ্রনাথের নাটক-প্রসঙ্গে শিশিরকুমারের বক্তব্য : "রবীন্দ্রনাথ কখনও আমাদের 'স্টেজ'-এর কাছে আসতে পারেননি, সেইখানেই ওঁর নাটকের হুর্বলতার কারণ। আমি যথন ওঁকে ডাকলাম, তথন একের পর এক ধাকা এসে ওঁকে আসতে দিল না।"

#### ২৭লো নভেম্বর, ১৯৫৮ ॥

আজ "শর্মিষ্ঠা" পড়া শেষ হ'ল। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীবিনয় দত্তকে ব'ললেন, "জানো, বিনয়, আমি রিহার্সালের সময় কখনও কোনদিন বসিনি। জন্মলগ্নের শনি-মঙ্গলে মিলে হাতটা ভেঙ্গে এখনই আমাকে বুড়ো ক'রে দিয়েছে। তাই, ব'সে থাকতে হয়।"

"শর্মিষ্ঠা" নাটকে পরিচারিকাদের কাননে যযাতির চাঞ্চল্য দেখে ডাঃ রাম অধিকারীকে ব'ললেন, "ভীন্মদেব, রামচন্দ্র, আর হু'একজন ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যের সব ক'টা মিনশে bogus."

### ১লা ডিসেম্বর, ১৯৫৮॥

"মালিনী"-র মহড়া চ'লছে। ক্ষেমস্বরের চরিত্রাভিনেতাকে উপদেশ দিতে গিয়ে ব'ললেন, "এ-যে কথার সংলগ্নতাটা, ওটা ছেড়ে দাও। প্রত্যেকটা কথা যেন আলাদা আলাদা দানা বেঁধে থাকে। তাতে ছন্দ ঠিকই থাকবে।"

### ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮ ৷

কাল "রুষ্ণকুমারী"র প্রথম অঙ্ক পড়া হ'ল। পাঠশেষে নাট্যাচার্য ব'ললেন, " 'রুষ্ণকুমারী'-র পর বাংলা নাটক এক পা-ও এগোয়নি—ভাষা হয়তো ব'দলেছে construction-এর বিচারে বরং পিছিয়েছে। আগে Todd প'ড়ে শোনালে দেখতে, এতটুকু বেঁকিয়েছেন, অথচ dramatize ক'রে ফেলেছেন। কি বিরাট প্রতিভা!"

নাট্যাচার্যের জীবনী এখনও কেউ লেখেনি। জীবনের নানা অধ্যায়গুলো কথার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। আগে একদিন ব'লেছিলেন হুণ্ডীর দালালি করার কথা। কালকে ব'ললেন হাইকোর্টে articled clerk থাকার কথা—পেছনের দিকে ব'গতেন, ভালো কেস থাকলে শুনতে যেতেন—ঐ প্রসন্ধে রাসবিহারী ঘোষের কথা উঠল। রাসবিহারীর শ্বতিশক্তি ছিল প্রথর—ব'লতে পারতেন না ভালো—"মাতালের চেরা গলা"। লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলে রাসবিহারীর বক্তৃতার প্রথম কয়েকটি ছত্র মুথস্থ ব'লে গেলেন—"আগে আরো মনে ছিল, এখন ভীমরতি হ'য়েছে, ভুলে গেছি।" বক্তৃতার প্রোটা ছেপে ফেট্ন্ম্যান্ শিরোনামা দিয়েছিল—"The brilliant Rashbehari"—শুরু হ'য়েছিল কালিদাস থেকে quote ক'রে, শেষ হ'য়েছিল "Little Dorrit"-এর লাইন দিয়ে —"আর ভেতরটা full of reminiscences, ইংরেজি আর সংস্কৃত থেকে।"

গিরিশ ঘোষের প্রতি শিশিরকুমারের শ্রদ্ধা স্থগভীর। "মধুস্থদনের কথা ছেড়ে দিলে বঙ্কিম আর রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলা সাহিত্যে আর বড় লোক কোথায়? আসতে হবে সেই গিরিশ ঘোষের কাছে। তা তাঁকে তো আর আমরা স্বীকার ক'রব না। তিনি বাগবাজারে থাকতেন, মদ থেতেন।"

যোগীন্দ্রনাথ বস্তর মধুস্থদন-জীবনী প্রসঙ্গে বললেন, "ও বইটা জ্বন্স-জু'তিন পাতার পর পড়া যায় না। জীবনী লেখার নাম ক'রে খুব একচোট গালাগালি দিয়ে নিয়েছে। ও লোকটা ছিল পিউরিটান, দেওঘরের ইস্থলের সেকগু মাস্টার: ও মাইকেলকে বুঝবে কী ক'রে ?"

### দই ডিসেম্বর, ১৯৫৮॥

"মালিনী"র মহড়া চ'লছে। দেরি ক'রে পৌছলাম। শিশিরবাবুর নাট্যোৎসবের প্রস্তুতিতে সবাই ব্যস্ত, খুব হৈ হৈ। আজ মহড়া খুব ভালো জ'মল না। তবু নাট্যাচার্যের নালিশ নেই, বিরক্তি নেই, ক্লান্তি নেই।

### আমার ডায়েরী থেকে : নাট্যাচার্যের সান্নিধ্যে 📲 ১৯

গতকাল "চন্দ্রগুপ্তে" চাণক্যের ভূমিকায় ওঁর অভিনয়ের কথা উল্লেখ ক'রে একজন ব'ললেন, ওঁকে কাল এতটুকু অস্তুস্থ মনে হয়নি। উত্তরে ব'ললেন, "অভিনয়ের সময়ে কবে আমাকে অস্তুস্থ দেখেছ ?"

# ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮॥

গত ১১ই ডিসেম্বর শিশিরকুমার অভিনীত "মাইকেল মধুস্থদন" দেখলাম। এই নিয়ে হু'বার দেখা হ'ল। শিশিরকুমারের অভিনয় বিচারের অধিকার আমার নেই। তাই এইটুকু বলা, অভিভূত হ'য়েছি। শিশিরবাবু প্রায়ই বলেন, "গলাকে থেলাতে হবে।" সেই গলাকে থেলানো যে কি বিরাট ব্যাপার, তা' একমাত্র উনিই জানেন, জানাতে পারেন।

১২ই ডিসেম্বর দেখলাম "যোড়শী"। আবার অভিভূত হ'লাম। বাধক্য, আঘাত, শারীরিক অস্বস্থতার সমস্ত অক্ষমতাকে জয় ক'রে নাট্যাচার্যের অভিনয়—কিন্তু কি প্রচণ্ড সে জয়।

### ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮ ॥

"মাইকেল মধুস্থদন" ও "যোড়শী"র 'টেন্শন্'-এর পর কাল "বিজয়া" দেখে আবার অবাক হ'লাম। সহ-অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের জ্বযন্ত অভিনয় সত্ত্বেও একা শিশিরকুমার নাটককে তরিয়ে নিয়ে গেছেন।

### ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮॥

কাল আবার দেখলাম "মাইকেল মধুস্থদন"—এই আমার তৃতীয়বার। এবারকার আনন্দ অন্যরকম। প্রত্যেক দৃশ্যের আগেই মনে মনে কল্পনা ক'রে নিয়েছি নাট্যাচার্বের দৃষ্টি, কণ্ঠ, ভঙ্গিমা—সব মিলিয়ে অভিনয়। কিন্তু প্রতিবারই নাট্যাচার্য আমার কল্পনাকে ভেঙে তাকে অতিক্রম ক'রে অনেক অনেক উর্দ্বে চ'লে গেছেন।

### ১৬ই সে, ১৯৫৯॥

গত ১০ই মে শিশিরবাবুর "রীতিমতো নাটক" দেখলাম। হাসি আর কান্নাকে একাস্ত সান্নিধ্যে রক্ষা করা সহজ নয়। জাত-শিল্পীর মতই শিশিরবাবু সেই অসাধ্যসাধন ক'রেছেন। "মঁসিয়ে ভাহ্ব" বা "লাইম্লাইট"-এর চ্যাপলিনকে মনে পড়ে। 'ফাউন্টেন পেন' বা 'হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ'-এর সঙ্গে বিরুতমন্তিষ্ক রসিকতার পরমূহুর্তেই "যেদো, একটু ঠাণ্ডা জল" ব'লে সেই ভাবগভীর আর্তনাদ—অভিনয়বিচারে এটা অসাধারণ। এক-একটা কথা নাট্যাচার্য অনেক সময়ে প্রকাশগুণে অবিশ্বরণীয় ক'রে রেথে দেন। "রীতিমতো নাটক"-এর একটা মুহূর্ত এমনি অবিশ্বরণীয় থাকবে। দিগম্বরাবু (শিশিরকুমার) সাল্বনাকে ( রেবা দেবী ) ব'লছেন, "যাবো অনেক দ্রে"—অনেক অনেক দ্রে—যেন কোন মেক্ষপ্রাম্ভে —দূরত্বের এক আশ্চর্য অন্তভ্তি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে—পরমূহূর্তে গলাটা সামাত্ত নামিরে, "এই পাশের ঘরে"—একান্ত নিকট—একান্ত সন্নিহিত—নেহাৎই ঘরোয়া—এক জগৎ থেকে অন্ত জগতে। অসংখ্য কবিতার আরুত্তির মধ্যে হু'টো ম্বরণীয়—"এই ক'রেছ ভালো, নিঠুর" ও "জনম অবধি হম্ রূপ নেহারত্ন"। আরুত্তিশেষে সান্থনাকে প্রশ্ন করেন, "কিছু ব্বলে ?" সান্থনা ঘাড় নেড়ে জানান, "হ্যা"। দিগম্বরণাবুর উত্তর, "তোমাের ঐ 'ফাউন্টেন পেন'-এর মত কিছু বোঝনি"—এ যেন বাংলাদেশের মান্থযের কাছে নাট্যাচার্যের অন্তযোগ।

[ ······সেদিন ভাবতেও পারিনি, শিশিরক্মারকে আর কোনদিন দেখতে পাব না। সেইদিনই তাঁর শেষ অভিনয়। তিরিশে জুনের খবরের কাগজের কালো হরফে শেষ থবর পেয়েছিলাম। ]

## ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০ ॥

মাত্র কয়েকটা মাদ কাছ থেকে দেখেছিলাম। স্থনাম-তুর্নাম যাচিয়ে দেখার সময় পাইনি, চেষ্টাও করিনি। মাহয় হিসেবে তাঁকে শ্রদ্ধা ক'রেছি, তাঁর প্রতিভার প্রকাশে অভিভূত হ'য়েছি—তাঁকে বিচার করার দাহদ পাইনি—দে-অধিকার আমার নেই, বুঝেছি। "শিশিরবাবুর অভিনয় 'ইন্ষ্টিটিটে' দেখে এদে পথের মোড়ে ফুটপাথে তাই নিয়ে মেতে থাকা"—শতাব্দীর গুরুতে বিভূতিভূষণের যে অভিজ্ঞতা—শতাব্দীর মধ্যকালে আমার জীবনে সেই অভিজ্ঞতা পেয়ে ধন্তু হ'য়েছি।-

বয়সে সত্তরের সীমা পেরিয়েও শিশিরকুমার ক্লান্ত হননি, চ'লতে ভোলেননি--জীবনের শেষ বছরে তাঁকে দেখেছি, স্ট্যানিস্লাভ্স্কি ও বার্টোল্ড ব্রেখ্ট্-এর বই প'ড়ছেন---আগ্রহ আর শ্রদ্ধা নিয়ে। আমি দেখেছি, পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে রঙ্গালয়ের ক্ষেত্রে, শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রে যে-কোন সামান্ততম আন্দোলন তাঁকে আগ্রহে-কৌতূহলে চঞ্চল ক'রে তুলত। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর থোলা মনে চিন্তার ধারা কখনও রুদ্ধ হয়নি।

নাটকের চরিত্রকে পরিবেশপ্রভাবসীমিত পূর্ণাঙ্গ জীবন্ত মান্থম হিসেবে দেখবার তুর্লভ ক্ষমতা ছিল ব'লেই শিশিরকুমার নাটককে বাস্তবের এত কাছে নিয়ে আগতে পেরেছিলেন। "দিখিজয়ী" নাটকের নাদির শাহ, মেষপালকের সন্তান—সেই অতীতকে অতিক্রম ক'রতে পারার মধ্যেই তার যা-কিছু মহত্ব—তাই সেই অতীতকে ভূললে চ'লবে না। শিশিরকুমারের অভিনয়ে নাদির শাহের চলনে ঘোড়দৌড়ের মাঠের ওন্তাদ ঘোড়সওয়ারের হাঁটার চাল—মেষপালকের হাঁটার স্বাভাবিক অভ্যস্ত ভঙ্গী— সেই অতীতকে প্রতিষ্ঠা করে, সঙ্গে সঙ্গেই নাদির শাহের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ রূপটিকে প্রকাশ করে। নাদির শাহ, রাজবংশজাত শৌখীন দিখ্রিজয়ী নন—তিনি এক ধারে দিখ্রিজয়ী আর ফক্ষ পার্বতা প্রদেশের অশিক্ষিত মেষপালক, জীবিকার জন্ত আর জীবনের জন্ত সংগ্রাম ক'রতে অভ্যস্ত—তাই নাদির শাহ, 'শিতাল্রি'-র শৌখীনতায় আস্থা রাথেন না—তিনি

# আমার ডায়েরী থেকে : নাট্যাচার্যের সান্নিধ্যে

তুর্বিনীত, নৃশংস। "রঘুবীর" নাটকে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে লুকনো ভীলসন্তান নিজেকে চিনতে পেরে উত্তাল উদ্দাম হ'য়ে ওঠে—মল প'রে কথার তালে তালে সে মঞ্চের ওপর প্রায় নাচতে থাকে, "সংহার, সংহার" ব'লে তুই পা তুলে লাফাতে থাকে। এতদিনের অবরুদ্ধ প্রাকৃত সত্তা যখন প্রশান্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাঁধ ভেঙে তুর্বার গতিতে বেরিয়ে আদে—তথন অন্ত কোনভাবে সেই ঘটনাকে প্রকাশ করা যায় না। সেই দৃশ্ত দেখে এ-কালের কোন প্রখ্যাত অভিনেতা অভিভূত হ'য়ে গেছলেন: "এর প্রবল ভীষণতায় আমার মনে হয়েছিল যে আমি ম'রে গেছি। আমার জীবনে বিরাট শিল্প যে ক'বার আমাকে মুহ্মান ক'রে দিয়েছে এটি তার মধ্যে একটি।" আশাভঙ্গের যন্ত্রণায় অন্ত মাহয কেঁদে উঠতে পারে—কিন্তু "আলমগীর"-এর উরঙ্গজেব অন্ত কোন মাহুযের মত নয়— তাই অমাহযিক জান্তব আর্তনাদে সে নিজেকে প্রকাশ করে।

একটি কবিতার জন্ম এক আশ্চর্য ঘটনা। স্থষ্টির মৃহূর্তের ভুর্ভেন্স রহস্তকেও শিশিরকুমার ভেদ ক'রতে গেছেন "মাইকেল মধুস্থদন" নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে। "ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন"—"তিলোত্তমাসন্তব-কাব্যে"র এই ছটি ছত্রের জন্ম সাধারণ ঘটনা নয়। একটি মান্থষ নিজের চেতনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে এক স্বপ্নলোকে পৌছে যায়—সেখানে বিশ্বমানবের চেতনার গভীরতম অন্তভূতিগুলি সে জন্নভব ক'রতে পারে—পঞ্চেন্দ্রিগ্রাহ্ম এই জগৎ থেকে কল্পনায় মায়ালোকে যাত্রার ভূর্লেভ মৃহূর্তেই কবিতার জন্ম। সেই অবর্ণনীয় ভূর্লভ মৃহূর্তটিকেও শিশিরকুমার তাঁর অভিনয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন। একটা মান্নযের সমগ্র সন্তায় সেই প্রচণ্ড বিগ্লব তাঁর অভিনয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন। একটা মান্নযের সমগ্র সন্তায় সেই প্রচণ্ড

"মালিনী"র মহড়ায় লক্ষ্য ক'রেছি, নাটকে কথোপকথনের ক্ষেত্রে সকল ভন্ধিকে তিনি বর্জন ক'রেছেন—নিজের বুদ্ধি দিয়ে প্রত্যেকটি কথাকে উপলব্ধি ক'রে তবে তাকে প্রকাশ করার নীতি শিশিরকুমার বুঝেছিলেন তথা মেনেছিলেন। নাটকে কথা বলার কোন বিশেষ স্থর বা ভঙ্গি তিনি চর্চা করেননি (যেমন চর্চা ক'রেছেন শস্তু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র—"রক্তকরবী", "পুতুলখেলা" ও "শুভবিবাহ"-এ তৃপ্তি মিত্রের বাচনভঙ্গী তাই কখনও বদলায় না)। একটি নাটক পাঠ করার সময়ে বিভিন্ন চরিত্রের চরিত্রগত বাচন-ভঙ্গীর বিচিত্রতা তিনি রক্ষা ক'রতেন—প্রত্যেকটি চরিত্রকে কোন-না-কোন ভাবে বিশিষ্টতা দান ক'রতেন। ভারী থেকে হালকা, স্থরেলা থেকে বেস্থর, গভীর থেকে অগভীর এক স্তর থেকে অন্ত স্তরে তাঁর কণ্ঠম্বর বিচরণ ক'রতেন। "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকে চাণক্য-আত্রেয়ীর মিলনের দৃশ্যে (শিশিরকুমারের কণ্ঠ আর্ভি শুনেছিলাম), "মাইকেল মধুহুদন" নাটকে বিছাসাগরের কাছে মধুহুদনের আশীর্বাদ-প্রার্থনোর দৃশ্যে ও "বোড়শী" নাটকে যোড়শীর কুটীরে সপ্তম দৃশ্যে যোড়শী-জীবানন্দের সাক্ষাংকার-কালে কণ্ঠম্বরে

২১

"মডিউলেশন"-এ শিশিৱকুমার অসাধ্যসাধন ক'রতেন। কণ্ঠস্বরের এমন সহজ-সঞ্চর ক্ষমতা আর কোন অভিনেতার গলায় পাইনি— শন্তু মিত্র "মডিউলেশন"-এর চর্চা ক'রে থাকেন, সীমিত ক্ষেত্রে সফলতাও অর্জন ক'রেছেন, কিন্তু নাট্যাচার্যের কণ্ঠস্বরের দ্বপ্রান্তচারী বিচিত্রতা তাঁর গলায় নেই।

কোন বিশিষ্ট বাঙালী নাট্য-সমালোচক শিশিরকুমারকে বাংলা রঙ্গালয়ের প্রঞ্ম "প্রয়োগকর্তা" ব'লে বর্ণনা ক'রেছেন। মঞ্চে মঞ্চোপকরণের বাছল্য বর্জন ক'রন্ড উপকরণে-সাজ-পোশাকে-দৃষ্ঠসজ্জায় নাটকের ঐতিহাসিকতা রক্ষায় তিনি সচেষ্ট ছিলেন। "রীতিমতো নাটকের" অভিনয়ে অডিটোরিয়মের ব্যবহার বাংলা রঙ্গালয়ের প্রয়োগকলার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—উত্তরকালে গণনাট্য সংঘ ও অপেশাদারী রঙ্গালয় এদিকে সচেষ্ট হ'লেও শিশিরকুমারের সাফল্য অর্জন ক'রতে পারেননি। "সীতা" নাটকে পাদপ্রদীপ তুলে দিয়ে স্বাভাবিক আলোক-সম্পাতের প্রয়োগে শিশিরকুমার একদা বাংলা রঙ্গালয়ের আলোক-প্রয়োগরীতিকে এক যুগ এগিয়ে দিয়েছিলেন। অভিনয়-শিক্ষায় যে নীতি তিনি অহুসরণ ক'রতেন, তাতে শিক্ষার্থী অভিনেতার অভিনয়-ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হ'ত। শিশিরকুমারের শিক্ষায় যে অভিনেতারা লাভবান হ'য়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিশ্বনাথ ভাহড়ী, যোগেশ চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রুষ্ণচন্দ্র দের হিলাব স্বদিকেই সমান দৃষ্টি তিনি রাথতে পেরেছিলেন ও সমান ক্ষমতার দেবী। নাট্যকলার স্বদিকেই সমান দৃষ্টি তিনি রাথতে পেরেছিলেন ও সমান ক্ষমতার স্বাক্ষর রেথেছিলেন ব'লেই শিশিরকুমারের প্রায়ার প্রোগনৈপুণ্যকে রবীন্দ্রনাথ প্রদান ক্ষালয়ে ছিলেন।

আমাদের হর্ভাগ্য, বাংলা রঙ্গালয় শিশিরকুমারের শিক্ষাকে আত্মস্থ ক'রতে পারেনি। তাই পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে তৃতীয় শ্রেণীর নাটক শতরজনী অতিক্রম করে—শিশিরকুমারের জাতীয় রঙ্গালয়ের স্বপ্ন পূর্ণ হয় না।

# একটি প্রত্যায়

**মহীতোষ বিশ্বাস**-পঞ্চম বৰ্ষ, বাংলা

আলো থেকে অন্ধকার, অন্ধকার থেকে পুনরায় আলোর অতল রাজ্যে অকস্মাৎ ফিরে যেতে যেতে মনে হয় একদিন সময়ের বিরূপ আয়নায় এ হাদয় মুছে যাবে, জীবনের শাদা দেয়ালেতে ডোরাকাটা মৃত্যু-ফাঁদ, প্রত্যয়ের দরিদ্র সংসার, স্মৃতি-ঝাপ্সা মায়া-চোঞ্চ, নদী বৃষ্টি আকাশের রঙ, চিরায়ত ফুলফোটা, হৃদয়ের কোমল গান্ধার পড়ন্ত বৈকালী রোদে মানমুখ গৌড়-সারঙ্। যেন এ হৃদয় নয়, বিবর্ণ নায়ক ছায়ানট অস্তুহ সত্তাকে তার বহুদুর অরণ্যের কোলে ফেলে এসে অন্থমন মর্মরিত পাতার সংকট নীলাভ আলোর কেন্দ্র সময়ের যন্ত্রণাকে ভোলে। রঙ-বিক্ত পোড়ামাটি বৃষ্টির থির-চিহ্ন বুক মৃত্যু-মূল্য ভুলে যাবে পৃথিবীর বহতা সময়, উধাও সমুদ্র নদী, ইতিরত্তে অন্তিম অস্থথ দিনান্তের শুদ্ধফুল অবিশ্বাসী ফলের অভয়।

সেই সব হিসাবের আবরণে নিগৃঢ় আঙ্গিকে মেলে দিলে আড়ালের অত্যাশ্চর্য ছটি চোখ নীল মনে হয় রক্ত-ঝরা দ্রাভাস দিগন্তের দিকে বলিষ্ঠ জীবন-স্বপ্ন গ'ড়ে তোলে ঘূমন্ত ফসিল। এই আলো অন্ধকার, —সীমাচক্রে একই আনাগোনা ত্বর্যালোক মুছে দেয়, পুনরায় ভরে তোলে সমস্ত সংসার। অন্ধকারে স্বপ্নছবি, আলো ঘিরে মূর্তি আরাধনা প্রত্যহের ব্যাপ্তি জুড়ে অনির্বাণ প্রাণের প্রস্লার। বিষণ্ধ জোনাকি কাঁদে, শৃত্তরাত্রি কাঁপে ঝিকিমিকি, কালের শায়কবিদ্ধ হতবাক ক্রৌঞ্চ পরিয়ান, তবু তো প্রাণের মূলে বীতনিন্দ্র কালার বাল্মীকি শোক থেকে শ্লোক রচে চিরাগত জীবন-অভিজ্ঞান।

আলো আর অন্ধকার, ব্যাপ্তি আর অবলুপ্তির পাশে বহুরূপে রূপ নিয়ে সত্য থেকে হবো সত্যতর। এ-আকাশ এ-বাতাস পৃথিবীর প্রতি ঘাসে ঘাসে আমার জন্মের রঙ সবিশ্বয়ে স্থথ-থরোথরো।

# সাধারণ মেয়ে

### বিমলেন্দু বস্থ-চতুর্থ বর্ষ, সাহিত্য

|| ज़रू ||

বয়সটা হু হু করে বাড়ছে।

বাথরুমের একফালি ঝাপস। কাঁচের সাঁমনে নিজের মুখোমুথি দাঁড়ায় অহরপ। ফর্সা পালজোড়া বুভুক্ষু।

একটি ছোট্ট নিশ্বাস। মিষ্টি আঠারো কেঁপে ওঠে।

দারাটা দিনই একটা মেশিনের গতি। সকালে কলেজ। ফিরে ঊর্ধ্বশ্বাস ঘরকর্না। ভোজনপর্ব সারা হতে ঘড়িতে একটা। টুইশনের সময় চঞ্চল হয়ে ওঠে। বেশ দ্বের পথ। ফি-রোজ ট্রামের কড়ি যোগান দায়। টুইশনের পঁচিশ টাকা সংকুচিত হয়ে আদে। আদিম পা হুটির উপর ভরসা। ফিরতে বিকাল গড়ায়। স্লিপারটা ফুটপাতের উপর দিয়ে টেনে চলতে থাকে অহুরূপা। গাঁঢ় অবসাদে দম আটকে আসতে চায়। দিনের শেষে ঘরম্থো পথ যেন মরুভূমি।

তারপর—সেই নির্জন সময়টা। সংক্ষিপ্ত। তড়িঘড়ি জ্ঞানের রাজ্যে স্থড়ঙ্গ না কাটতে নামলেই নয়।

মন এক-এক সময় কক্ষচ্যত হতে চায়, কিন্তু হায় !…বাবার বয়সটা এখন পড়তির শেষধাপে। তবু মেরুদণ্ডের উপর স্থির সংসারটা। একটি তারাও খনেনি। মাস্টার— মাইনে পান আর কত। তাতে গোটা মাসের কিনারা নাগাল পাওয়া সত্যি বড়ই কঠিন।

ভুলে যায়, বাবা ভীষণ রগচটা মান্নষ। অথবা যথন-তথন তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কে ফেনিয়ে একটা ফইজত বাধিয়ে বসেন। অর্থাৎ একটু থোঁচা পেলেই চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একটা বিশ্রীরকম কাণ্ড জুড়ে দেবেন। এবং আশপাশের বাড়ির জানালাপ্তলিতে কৌতুহলী চোখ জেগে উঠবে।

### সাধারণ মেয়ে

আহা, দাম্পত্যজীবনটা যদি ফুলশয্যাই হত !—নীল মুক্তি কী জিনিস জানে না তো সে,—স্বপ্ন দেখে। মার সমর্থনের জোরে কলেজে ভর্তি হয়েছে। কাছাকাছি বিয়ের সম্ভাবনা যখন নেই, তখন—। হোক না সে মিসট্রেস। কত কচি হৃদয়ের ভালোবাসা পাবে,—ভালোবাসা দেবে। হৃদয় গান গায়।

অক্ষরগুলি থমকে দাঁড়ায়। আহত অন্থরণা দেথে, অজস্র পিঁপড়ের মতো হরফগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে শৃন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। মুখ তুলে তাকায়—তাকায় মাথার পাঁচ হাত উপরে। চল্লিশ পাওয়ারের বাল্**ৰ্টা**র প্রাণহীন ঘোলাটে দৃষ্টি।

নাঃ, পাওয়ার বদলাতেই হল। অগতোক্তি।

মেয়ে ছটিকে পড়াতে বদেও দৃষ্টি নিবে আদে।

অথচ গত মাদের হরলিক্সটার দাম বাকীর থাতায়। গলির মোড়েই ডাক্তারখানা। একটা পাড়া-পাতানো সম্পর্কের ধুয়ো ঠেকোর কাজ করেছে। ক্লান্তি—তবু ক্লান্তির ভার নামল কই ?

একটা প্রচণ্ড অভিমান। কার উপর ? তা তো অন্থরপা জানে না। হয়তো বাবার উপর। মার উপর। অর্থবিজ্ঞানের হিসাবে কলেজের মাইনে দিয়েও 'সারপ্লাস' থাকে। সংসারে যথন এত টানাটানি তথন সেক্ষেত্রে 'ইন্ভেস্ট' করতে ক্ষতি কী। প্রক্নতপক্ষে—

একটা মানসিক তিক্ততা। 'রেমেডি' কী ?—আরেকটা টুইশন ?

বান্তবিকই আরেকটা টুইশন নিল অন্তরপা। বিশুদ্ধ ভট্টাচার্যি বাবা নারাজ। কিন্তু শাঁসালো টুইশন। খুশি-খুশি মার একটু ওকালতি—অন্তরপা কলেজে-পড়ুয়া মেয়ে। বুঝেন্ডনে চলবার মতো কাওজ্ঞান তার জন্মেছে।

স্থতরাং—।

গুরু হল রাতের টুইশন। বাসায় ফিরতে নটা। কোনোদিন ঘড়িতে দশটা। বাবা থচমচ বাধান। অর্থই অনর্থ। কোলকাতা শহর। অঘটন ঘটতে কতক্ষণ।

কিন্তু মোটাম্টি অন্থরপা খুশি। ধর্মতলা থেকে বালিগঞ্জ। ট্রামবাদের ভিড়। যাতায়াতে সময়ের অপচয়। তা হোক—মস্ত লোক, তেমন ভন্ত্রও। কালচারই আলাদা। আর পথঘাট? কোলকাতা শহরে যে দিনেরাতে তফাৎ নেই তা চক্ষ্মান ব্যক্তিদের কে না জানে?

গুমোট ভাৰটা কেটে যায়। ছোট ভাইয়ের জন্তে জুতো। মার জন্ত শাড়ি। উপরন্ত ক্যাশ। তাতে বাড়ি-ভাড়াটা হয়, নয় বাজার-থরচা। ব্যস, খুশি।

### । হই ।

কিন্তু বদলে গেল কি মেয়েটা ? মার মুছবিম্ময়। প্রথম যা খেয়ালে আনেননি এখন তা চোথের পক্ষে বেদনাদায়ক। সাজপোশাক অহুরপার কাঁছে ছিল একটা

> . El Mercal Y Correlation

আতঙ্ক। কলেজে যাবার সময় নিজেকে একটু হুরস্ত করে নেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু অস্বাভাবিক অন্তরপা তার উত্তরে চোথ মটকে জবাব দিয়েছে, কলেজে কনে সেজে যাবার দরকারটা কী। ভোরবেলা যুম থেকে উঠে মুথে পাউডার ঘযতে আর চোথে স্থর্মা টানতে আমার ধৈর্য নেই।…এক বটকায় গলিতে বেরিয়ে পড়েছে অন্থরপা। ল্লিপার ঘযতে ঘযতে চলল।

বান্ধবীরা হাসাহাসি করত। কোন মেয়েবন্ধু বলেছিল, ভুই পাগলী সেজে ঘুরিস কেন বলু তো ?

ভাববিকারহীন জ্বাব ছুঁড়ে দিয়েছিল অন্থরপা, তোমাদের মতো বিজ্ঞাপনের ছবি সেজে ঘুরেই বা কী লাভ, ভাই ?--তৎক্ষণাৎ মুথ বন্ধ।

সেই অন্তরণা আজকাল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মেক-আপ নেয়। পাউডারের রঙীন প্রলেপ স্থম্পষ্ট। স্থমার শায়কে কী অর্থ কে জানে। কবরীরচনায় ক্লাসিকাল কারুকার্য। ঝকঝকে মহুণ শাড়ি। দেহে ফুটিয়ে তোলে একটা রক্তিম উল্লাস। আর ঠোঁটের কোণে একটা আলেয়া হাসি। এই সান্ধ্যমুহুর্তে অন্থরপার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে এ কোন্ অপরিচিতা? সকালে হপুরে সেই নির্জীব অন্থরপা, যেন থ্যস্ত।

শুধু এই ? অত রাতে টেবিল-ল্যাম্পের সামনে লেখে কী মেয়েটা ! পড়ার একটা গুঞ্জন দব গুয়ে না পড়া পর্যন্ত। লাইটটা নিবে গেলে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি ফেলে চারদিকে। তারপর—তারপর দেরাজের তালাটা খুট করে খুলে ফেলে। একতাড়া কাগজপত্র। ঘাড় ঝুঁকে পড়ে। মাঝে মাঝে দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয় কড়িকাঠের দিকে। মাধ্যাকর্ষণ করছে বায়ুগামী চিন্তাগুলিকে ?

একটা অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তিনি ছড়িয়ে রেথেছেন সর্বত্র। লুকিয়ে-চুরিয়ে লেথালেথি। দেরাজে তালা। সন্ধ্যার পর ফি-রোজ নটী সেজে পড়াতে যাওয়া। প্রতিটা প্রেসিজই মারাত্মক।

আবিষ্ণারের মোহ তাঁকে পেয়ে বসেছে। ঘর নিরিবিলি। বিপত্তি—দেরাজের তালা কিছুতেই থোলে না। কপাল ফুটে ঘাম বেরুল। শেষতক্ চিচিংফাঁক হল। উত্তেজনায় হাত কাঁপতে থাকে তাঁর। তিক্ত কোঁতৃহলের স্বাদ নিয়ে লাভ কী ? হয়তো একটা—একটা মারাত্মক রকম আঘাত অপেক্ষা করছে তাঁর জন্তা। কিন্তু এও তো সন্তব—। একটা বাটকা টান দিয়েই ফেলেন।

কাগজ আর কাগজ। এ-ছাড়া পেন্সিল, চুলের কাঁটা, ক্লিপ, কত কী। রুদ্ধনিশ্বাসে কাগজগুলি ওলটপালট করেন। কিন্তু কোথায় কী। বাজে—টাকা-আনার ছককাটা হিসাব। কৌতৃহল মুষড়ে না পড়ে পারে কি ?

সেয়ানা মেয়ে—টের পেয়ে সব-কিছু অন্ত কোথাও সরিয়ে ফেলেছে? চুপসে গিয়েছিলেন আর কি, এমন সময় আবার ফুলে উঠলেন। নিরীহ লাল কোটো একটি।

#### সাধারণ মেয়ে

বিশ্বয়টা তুলে নিলেন হাতে। খুললেন। এই বিশ্রী রঙের প্রসাধন করে নাকি অন্থরণা! এই অসম্ভব জিনিসটা কল্পনা করতেও যে তাঁর মন বিষিয়ে ওঠে। তবে কি অন্থরপা 'অসম্ভব' কিছু একটা করে চলেছে তলে তলে? সিদ্ধান্তে আসতে গিয়ে তিনি শিউরে ওঠেন।

স্বামীর কাছে সব ফাঁস করে দেবেন ? তারপর—একটা আলোড়ন। চারপাশে এরিয়াল তো উঁচু করাই আছে। তখন—মেয়ে একটা কিছু করে বসলে ?

অগত্যা—।

অহেরপাও অহেরপ। কলেজে যায় আদে। বিকালের টুইশন। তারপর স্নান ও সজ্জা। নিজের হাতেই চা-পর্ব সারে। স্থলের থেকে ফিরতি পথে টুইশন করে বাবা ফিরবার আগেই বেরিয়ে পড়ে। তার আগে অহ্ররপাকে তার 'সেফটি-চেস্ট' খুলতে দেখা যায়। তবু কী যেন অন্তরাল করতে দেখা যায়। আর দেখা যায়--ফ্যাকাশে গাল হুটিতে মেকি রক্তিম উচ্ছ্রাদ ?

কিন্তু কী ট্র্যাঙ্কেডী! আকস্মিকভাবে—হাঁ, আকস্মিকভাবেই উড়ে এল একখানা নীলরঙের খাম। সর্বাঙ্গ বৈশিষ্ট্যময়। এ যে রঙীন খবরের রঙ আর রোশনাই। অসহায়-ভাবে তাকান হাতের খামখানার দিকে। গোটা গোটা উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন হরফের নৃত্য। অহুরপার নাম।

পুরানো ধারণাটাই ছুরির ফলার মতো নিমেষে উত্তত হয়ে ওঠে না কি ?

এরপরও অক্ষতভাবে থামথানা তুলে দেবেন অন্থর্নপার হাতে ? একটা অনপেক্ষিত স্থযোগ। বিস্তর কায়দায় খুলে ফেলেন মুখটা। সাদা ঝকঝকে একথানা চিঠি। কী মোটা আর মন্থণ কাগজটা!

ভাঁজ খুলতে গিয়ে হাত অসাড় হয়ে আদে তাঁর। স্পন্দন দ্রুততর হতে থাকে। হায়, তবু তাঁকে খুলতেই হবে।

একি ! আগাগোড়া ইংরেজীতে লেখা। 'ডিয়ার মিস'…। বাঙলায় যেন কী বলে ওটা। প্রিয়। হতচ্ছাড়ার কী মধুর সন্তাষণ !

আগুন ধরে যায় মাথায়। চোথ হুটি স্থানান্তরিত হয়। প্রণব মুথার্জী। প্রশ্নচিহ্নে মতো জ কুঞ্চিত হয়। এই সেই বালিগঞ্জের মিঃ মুথার্জী—যার ব্যাখ্যান অহুরপার মুথে অনেকদিন গুনেছেন। কী আক্ষেপ—সারাল পত্রাংশটুকু তাঁর কায়দার বাইরে থেকে গেল। অবশ্রুই একটা ফয়সালা দরকার। কী কেলেঙ্কারি—বাড়িতে চিঠি লেখালেখি।

#### । তিন ।

ডাক পড়ল । বাবা গন্তীরমুধে চৌকির উপর বসে । হাতে চিঠিথানা । মা রানাঘরের জ্বালির আড়ালে ।

এসব কী অনি ?…কর্কশ প্রশ্ন।

নির্বাক।

এদব কী ? · · · গ্রীক শুনছে অহুরপা ? মুখ নীচু করে সে বলল, আমি কিছু বুঝতে পারছি না বাবা।

বুঝতে পারছ না ?…এবার বিক্ষোরণ হল। নিক্ষেপ করলেন চিঠিটা, নাও, পড়ে দেখ,—কিছু বুঝতে পার কিনা।

তার চিঠি ? চোথে কিছু দেখছে না অন্থরপা। লাইটের নীচেও ঝকঝকে অক্ষরগুলি বারবার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। ত্ব-কান দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে একটা অসহ উত্তাপ।

চোখ তুলবার উপায় নেই। ঘুণা আর ক্রোধের চাপা আগুন মেশানো একটা তীক্ষ দৃষ্টি বিদ্ধ করে আছে তাকে। আজ তার এর কৈফিয়ত না দিয়ে মুক্তি নেই।…

### ।। চার ॥

অন্নরণা মুক্তি পেয়েছিল কি না সে ঔৎস্থক্য আমাদের নেই। কারণ সে কোনো রাজকন্তা নয়, ফিল্মকন্তা নয়, একজন সাধারণ মেয়ে। তবে তার 'সিক্রেট'টা প্রেসির ভাষায় দাঁড়ায় এইর্প—

কলেজের এক বান্ধবীর আত্মীয় প্রণববাব্। চৌরঙ্গী এলাকায় তাঁর বিরাট স্টোর। বান্ধবীকে বলেছিল এক টুইশন দেখে দিতে। পেল এক নতুন প্রস্তাব। তাতে খাটুনি কম। মাইনে বেশি। সন্ধ্যার\_পর কয়েক ঘণ্টা প্রণববাবুর স্টোরে স্টোরমিসট্রেদের কাজ। প্রণববাবু কিছুদিনের মধ্যে খুঁৎখুঁৎ করতে শুরু করলেন। অহুরূপা নাকি তেমন মার্ট নয়। চিঠিটা জ্বাব।\*

\* বিশ্ববিন্তালয় সাংস্কৃতিক পরিষদের উত্তোগে 'আন্তঃকলেজ ছোটগল্প প্রতিযোগিতা'য় ( '৫৯ ) প্রথম স্থান।
# কবিতা : মর্ম ও স্থর

দীপক রুদ্র-পঞ্চম বর্ষ, অর্থনীতি

মর্ম :

অনেকে বলেন, যে-কবিতার বর্তমানের সঙ্গে প্রাণের যোগ বা মজ্জাগত সম্পর্ক নেই, দে-কবিতা গ্রাহ্ণ নয়। কোন রাজনৈতিক বিষয়ে লেখা কবিতা সহজেই সময়োপযোগী বলে স্বীকৃতি পাবে। তবু, এই বাইরের খোলসটুকু থাকু আর না-ই থাকু, কবিতাকে পড়া হবে তার নিজের অধিকারে। কবিতার অন্তর্বর্তী রাজনীতিকে যদি পছন্দ না করলাম, তবে সোজাস্থজি কবিতাটিকে হয়তো বলে বসলাম 'উত্তেজক'; আর, অধিকাংশ পাঠকই বোধ করি চান না যে নিতাস্তই আনন্দের সামগ্রী কবিতায়, সাম্রাজ্যবাদ বা সাম্যবাদ কল্পনাকে ছাপিয়ে উঠুক। কেন্দ্রিক সমস্র্যাটুকু চলমানকে নিয়ে নয়, স্থায়ী একটা অন্তভূতিকে ঘিরে। যে-কবিকে মনে হল তাঁর সমকালীন যুগ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন, তিনি হয়তো প্রকৃতপক্ষে রেথে গেলেন খুব বড় রকমের কোন ইন্ধিত; আবার, যাঁকে দেখলাম প্রোপুরি সমসময়ে নিমগ্ন, তাঁর প্রশ্ব-সমাধানগুলোও ভবিয়তে একেবারে অন্তঃসারশ্ন্যু হয়ে যাবে না। ম্যাথু আর্নল্ড-এর 'স্ট্যানজাস ফ্রম দি গ্র্যাণ্ড চার্টক্লজ' ঐতিহাসিক এক সন্দেহকে ধরে রেখেছে চিরকালের জন্তা। ভিক্টোরিয়ান রক্ষণশীলতার মধ্যে অমন স্বয়ংক্রিয় মন আর-একটিও দেখা গেল না।

কবিতার হুর্বোধ্যতা ( আধুনিক কবিতাকে এই ছর্নাম সকলেই দিয়ে থাকেন ) নানা কারণে ঘটতে পারে। প্রথমতং, ব্যক্তিগত কোন কারণে কবিকে হয়তো বাধ্য হয়েই দোজা পথ ছেড়ে ভণিতা ধরতে হয়। এটা ছংখের বিষয়, কিন্তু তিনি যে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছেন, তাতেই তাঁর রুতিত্ব। দ্বিতীয়তং, অনেক ক্ষেত্রে নৃতনত্বকেই দুর্বোধ্য বলা হয়েছে—-ইংরেজী কাব্যসাহিত্যে পর পর ওয়ার্ডস্বার্থ, শেলী, কীট্স, টেনিসন ও রাউনিং, এবং অতি-আধুনিক বাংলা কবিতার অগ্নিব্যুহে জীবনানন্দ দাশ, স্থণীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বস্থ ও বিষ্ণু দে'কে এই কারণে প্রথম-প্রথম বিদ্ধপ করেছেন অনেক স্থযোগ্য সমালোচক। তৃতীয়তং, পাঠকের মনে আগে থেকেই কবিতাবিশেষের সম্বন্ধে দুর্দ্ধিব্যতার ভীতি বন্ধমূল হয়ে থাকতে পারে। তা হলে, চিন্তাশক্তিকে প্রাণপণে কেবল বৃদ্ধি-খাটানো থেলায় নিযুক্ত করে রাথলে স্ক্ষ্ম কাব্যাহেভৃতির পথ যে বন্ধ হয়ে গেল ! অধিকতর পাকা পড়ুয়া ( যিনি এই কবিতা-পড়ার ব্যাপারে কিঞ্চিং স্থিরস্বভাব হয়েছেন ) কবিতার অর্থ বোঝা নিয়ে অত মাথা ঘামান না, অন্ততং প্রথম পাঠে তো নয়-ই। সর্বশেষে, কবিতাবিলাসীর দল মাঝে মাঝে এমন বিশ্লেষণ দিয়ে বনেন কোন-না-কোন

¢

কবিতার, যা রচয়িতা কস্মিনকালে-ও ভেবে দেখেন নি। তাই, সব-কিছু অস্বাভাবিৰ রকমের ঘোরতর হয়ে উঠবেই।

কবিতাকে মর্ম দেবার প্রধান উদ্দেশ্ত পাঠকের মনকে আঁকড়ে রাখা, যতক্ষণ না কবিতার প্রভাব বসে যাচ্ছে। এই ধরা গেল ব্যাপক একটি অবস্থা। কিন্তু গর কবির চিন্তাধারা তো আর একই দিকে বইছে না—কেউ কেউ উপজীব্যটাকে অতিরিক্ত বলে দিলেন বাতিল করে, কবিতার কেন্দ্রিকতা বা বাঁধুনি গাঢ়তর হবে আশা করে। অবশ্ত এটাও চরম সত্য নয়; তবে, কবিতা আমরা লিখব যে যেমন পারি ও তা গ্রহণ করব, যে অবস্থাতেই পাই না কেন। কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে কোন-এক পর্যায়ে কিছুটা ছাড়া-ছাড়া, ও অপর কোন পর্যায়ে অপেক্ষায়ত সংঘবদ্ধ লেথার 'চল্' থাকতে পারে। বর্তমান মাপকাঠিতে উনবিংশ শতকের অতিমানবশ্রেণীর মধ্যে ওয়ার্ডমের্থ, রাউনিং, স্থইনবার্ণ ও ফরাসী কবিদ্বয় বদ্লেয়র-মালার্সে'র অতিকথনদোষ প্রায় সের্বত্ত। এ-কথা বলব না যে, 'দীর্ঘ' কবিতা আর লোকে পড়ে না, তবে দীর্ঘ কবিতা হলেই আজকাল চেয়ে বসব আঁটবাধা মর্মের ঠাসবৃন্থনি। সব কথা ছেড়ে দিলেও এই প্রশ্ন উঠতে পারে, 'যা গতেই ভালো বোঝানো যায়, তা পত্তে লিথব কেন ?' স্বচেয়ে পাড় কাব্যান্থরাগীকেও মানতে হবে যে, অন্ততঃ অর্থের দিক্ দিয়ে পত্যের চেয়ে গতের বক্তব্য অনেক বেশী।

কবিকে দিয়ে অন্ত লোকের কাজ করানো চলবে না, সত্যি, কিন্তু কবিতাকে গত্ত-সাহিত্য থেকে নিতে হবে রচনাশৈলীর কিছু কিছু বিশেষত্ব, ভাব-সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য অংশ ও শব্দসৌন্দর্বের সবিশেষ মুন্সীয়ানা। গত্ত-পত্তের 'পার্টনারশিপ' ভাষার প্রাণশক্তি অক্ষুণ্ণ রাথার জন্ত অপরিহার্য।

#### স্থর :

কবিতার 'স্থর' কবিতার মর্মার্থ থেকে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নয়। নয়তো, এমন কবিতা হতে পারত যা স্থরস্থদর অথচ অর্থহীন। ব্যতিক্রমগুলোতে কেবল প্রবলতার তফাৎ থাকতে পারে। কতকগুলো কবিতা আছে যেখানে স্থরই প্রধান, অর্থটা একরকম স্বীকার করে নেওয়া হয়; তেমনি, এমন কবিতাও আছে, যেগুলো মর্মের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, স্থরের পরশটুকু অনস্থভূত থেকে যায়। ত্ব-একটা চরম উদাহরণ দেখা যাক-স্থকুমার রায় বা এডওয়ার্ড লিয়ার'এর কৌতুক-কবিতা। এঁদের থামথেয়াল র্দ্ধিবিকারের লক্ষণ নয়, বরং, রীতিমত, গোমড়াম্থো চিন্তাশীলতার 'প্যারডি'। 'রামগরুড়ের ছানা'বা 'দি ডং উইথ এ ল্মিনাস নোস' অপূর্ব হৃদয়বত্তাসম্পন্ন কবিতা-প্রায় 'ব্রু' বা করুণ গানের শামিল। স্থরের চাইতে এখানে অনেক বেশী উপভোগ করি কর্তব্যহীনতার আনন্দটুকু। অন্ত তরফায়, উইলিয়ম মরিস'এর 'ব্লু ক্লোস্টে' বা

.

জীবনানন্দ দাশের 'নগ্ন নির্জন হাত' স্থথপাঠ্য বটে তবে হুরুহ ঠিকই। সমস্ত ধারণাটা কেমন যেন স্বপ্নালু-এই স্বপ্নসৌন্দর্য পরিবেশন করাই উল্লিখিত কবি তু-জনের সজ্ঞান প্রচেষ্টা ( অবশ্র, কবিতা ছটির সার্থকতা খুঁজবার দরকার পড়ে না রসাম্বাদ করতে )। কোন-কোন ক্ষেত্রে কবিতার অন্তিম অর্থ কবির রচনাকালীন উদ্দেশ্তকে ছাড়িয়ে গিয়ে বেশ অদ্যে একটা ব্যবধানের স্বষ্টি করে। বর্তমান যুগরুচির—তুর্বোধ্যতার—প্রবর্তক ফরাসী সংকেতধর্মী ( 'সিমবলইস্ট' ) ষ্টিফ্যান মালার্মে -সম্বন্ধে ওঁর স্বজাতীয়েরা মাঝে মাঝে বলেন, তাঁর কবিতার ভাষায় নাকি একমাত্র বিদেশীরাই দন্তস্ফুট করতে পারবেন। তত্ববোধিকা ঘ্রেঁটে আপনি জানলেন, মালার্মে'র কোন-একটি কবিতা চকচকে টেবিলে প্রতিবিম্ব দেখে অন্থপ্রাণিত, অপর-কোনটি মাদকফেনায় স্হর্যালোক থেকে উদ্ভত। কিন্তু, এ নেহাৎই জন্মরহস্ত-উদ্যাটন, ভাব-বিশ্লেষণ নয়। যদি পড়ে চমক না লাগল, তবে কবিতা হিসাবে নিশ্চয় সে-রচনা সর্বাঙ্গসক্ষম নয়। কিন্তু ধরা যাক, সম্পূর্ণ অজানা ভাষায় কোন-এক কবিতার আবৃত্তি শুনে গভীরভাবে উদ্বন্ধ হলাম; তারপর, যখন শুনলাম, দে-সবের ভেতর পদার্থ ছিল না, তখন মনে হবে ঠকে গেছি--জিনিসটা কবিতাই নয়, যন্ত্রদংগীতের অন্তুকরণমাত্র। এ-ও অবশ্য মান্ত যে ব্যাখ্যা করে কবিতার আংশিক অর্থই বোঝা যায়, কারণ কবিকে সেই সমন্ত চেতনা-সীমা নিয়ে ব্যন্ত থাকতে হয় যার ওপারে ভাষার রেওয়াজ নেই। একই কবিতা ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের কাছে পৃথক পৃথক মর্ম সাজিয়ে দেবে, এটাই স্বাভাবিক। প্রত্যেক ব্যাখ্যাই সমপরিমাণে স্বীকার্য হবে এ অবস্তায়।

তাই, যদিও কবিতা জানাতে চায় এমন তথ্য যা গন্ত-ছন্দের অতীত, তবু তা ব্যক্তিবিশেষের নিজেকে বোঝাবারই প্রয়াস। বোঝানো-পর্বটুকু যেমন কথায় কথায় বলা যায়, তেমন গানের মত গাওয়াও যায়, কারণ গান তো কথোপকথনেরই আরেক ধরন! কবিতার ক্ষেত্রে দব পরিবর্তন আসে কথ্যভাষার পায়ে-হাঁটা পথ বেয়ে। নব-আন্দোলনের ধুরন্ধররা প্রচলিত ভাষাটিকে মার্জিত ও ঝরঝরে করে তোলেন, 'ইডিয়ম' পর্যায়ে ফেলেন---অথচ, ইতিমধ্যে কথ্যভাষা যায় বদলে আর কাব্যসরঞ্জামও অকেজো হয়ে যায়। কবিতার দঙ্গে চলতিভাষার এমন একটা সম্পর্ক থাকা উচিত, যাতে করে শ্রোতা বা পাঠক বলতে পারেন, "কবিতায় আলাপ চালু হলে ঐভাবে বলতে হবে"। ঠিক এই কারণে, সমসাময়িক কবিতা আমাদের এক আন্চর্য উত্তেজনা ও পরিপূর্ণতার দন্তোষ দিতে পারে, যা বিগতযুগের বহুলাংশে উন্নত কবিতাও পারে না।

কবিতার 'স্থর'কে সাম্প্রতিক কথ্যভাষার ভেতরই নিহিত থাকতে হবে। কবির কাজ, তাঁর চতুর্দ্রিক যে-কথার প্রচলন, যার সঙ্গে তিনি সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, সেই সর্বসন্মত ভাষাকে ব্যবহার করা। অবশ্য, আমরা কেউই নিশ্চয় চাই না যে, কবি তাঁর এলাকার ও পরিজন-বন্ধ্রবান্ধবের মুথের কথা হুবহু নকল করুন। তবু, সেথান থেকেই

তাঁকে তাঁর কবিতার কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হবে। ভাস্করকে যেমন তাঁর কারুকার্বে ধাতু অন্থযায়ী গড়তে হয়, কবিকেও তেমন তাঁর স্থর সংগ্রহ করতে হবে শোনা শব্দমষ্টকৈ মন্থন করে। উইলিয়ম বাটলার ইয়েট্স্'এর স্বরচিত কবিতাপাঠের কোন অন্থষ্ঠানে উপন্থিত থাকার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরা নিশ্চয় মনে রেথেছেন এই অসামান্ত লোকটির বিশিষ্ট আইরিশ উচ্চারণভঙ্গী—এ-অভ্যাস একেবারেই স্থানীয় পরিবেশে সার্থক।

সব কবিতাই শ্রুতিমধুর হবে, এ-কথা ভাবা ভুল। কোন-কোন কবিতা গাইবার জন্ম, আবার কোন-কোন কবিতা পড়বার-বলবার জন্ম। এবং, বলার বা পড়ার বিষয় অনেক আছে, অলিগুঞ্জন বা শালবীথিতে কপোতকৃজন ছাড়া। ছন্দভঙ্গতা, এমন ফি কর্কশ ছন্দহীনতারও স্থান আছে। কিঞ্চিৎ দীর্ঘ কবিতায় বিভিন্ন ভাবতরঙ্গের মধ্যে মধ্য যতি টানতে হবে। পরিবর্তমান চিস্তার ছন্দ (যা কবিতার স্থরের কাঠামোর পক্ষ অবধারিত) বজায় রাখতে হবে। সেইজন্ম, থানিকটা বিস্তৃত আয়তনের কবিতা লিখতে হলে কবির থাকা চাই গতে অভ্রান্ত দখল।

কবিতার সামগ্রিক গুরুত্বই সব—কেবল অলংকার-শন্ধ সাজালেই কবিতা হয় না। কানে-শোনা দিয়ে বিচার করলে সব শন্ধই সমান। যেগুলোকে সাধারণতঃ অস্থন্দর বলা হয়, সেগুলো কেবল পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বেথাপ্পা (হয় তারা প্রাচীন ও পরিত্যক্ত, নয় তারা বিদেশী ও অপরিবর্ধিত)। নিজের ভাষায় স্থপ্রতিষ্ঠিত কোন শন্দই স্থন্দর বা বিশ্রী নয়। শন্দের স্থর শোনা যায় সংযোগের মুহূর্তে, আগে-পেছনের পড়শীর ভেতর তা কতটা সমীচীন, সেই অবিচ্ছিন্ন ধ্বনিসমুদ্রে তা কত নিবিড়ভাবে নিলীন, তার বিচার করে।

'র্যাঙ্ক ভার্স'এর ইতিহাস হুটি চিন্তাকর্ষক ও পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব দেখিয়ে দেয়— নাটকীয় গছ ও গছ-কবিতার ভেতর প্রকৃতিগত পার্থক্য, এবং, সেই সঙ্গে, উভয়েরই কথ্যভাষার ওপর একান্ত প্রভাব। জেরার্ড হপকিন্স্'এর কবিতায় এমন একটা বীরত্বপূর্ণ আত্মপ্রত্যয় আছে, যা স্বচ্ছন্দে আপনার-আমার কথা-বলার ধরনকে রুচিশিক্ষা দিতে বসবে। প্রায় চারশ' বছরের ব্যবধান অনায়াদে অতিক্রম করে শেক্সপীয়র'এর অনবন্ত পদ-চাতুরী আজও সবচেয়ে সাম্প্রতিক কথন-মানকে দমন করে নিজের দাবি জানাতে পারে। ধ্বনির উত্থান-পতন, শব্দের তরঙ্গ-উপতরঙ্গ একটানা সন্ধ্যাসংগীতের মত কানে এদে লাগে—বক্তা-শ্রোতা সকলের কাছেই সে এক ফ্র্ল্ড অভিজ্ঞতা।

কবিকে কি করতে হবে না-হবে তা নিয়ে বাঁধাধরা নিয়ম থাটে না। কবির যা কাব্যকর্তব্য তা তাঁর নিজস্ব মনন ও যুগের প্রয়োজনের ওপর নির্ভরশীল। কবিকে ব্যবহারিক 'বচনের' স্থরসন্তাবনাগুলো নিংড়ে নিয়ে নির্যাদ প্রস্তুত করতে হবে, শুধু এটুকুই বলা যায়। আর, ভাষা দাঁড়িয়ে নেই—চিন্তাপ্রকাশে, অন্তভূতিপ্রাচুর্যে, শিল্পপদ্ধতিতে ক্রমাগত পরিবর্তন-বিবর্তন চলেছে। কবিকে স্থর ধরতে হবে এই অবিশ্রাম গতিবেগ

ځې

সত্বেও। বর্তমানে কাব্যচলন্তিকায় কিছু নতুন তথ্যের প্রবেশ হয়ে পড়েছে একাস্ত আবশ্রুক, যে-কারণে নবীনই পাচ্ছেন সানন্দ অভ্যর্থনা, প্রবর্তক নন।

সব বিষয়ের মানসমূহ ভাঙৰে গড়বে, কিন্তু যতক্ষণ একটা ভাষা বেমালুম হারিয়ে না যাচ্ছে, তা তার বচন-ধর্ম ও শব্দ-প্রণালী প্রয়োগ করবেই। এমন কি, একটা সাধারণ ছন্দ-চেতনা থেকেও প্রকৃত কাব্য-উচ্চারণ সম্ভব হতে পারে, এটা কবিমানসের চিরকালীন আবিষ্ণার। কবিতা স্থরের দিক্ দিয়ে কতথানি উৎকর্ষ অর্জন করতে পারে, তা সঠিক অন্থমেয় নয়। কবিতার সমুথে রয়েছে স্থদ্রপ্রসারী, অনির্ণীত অথচ রোমাঞ্চময়, নিশ্চিত-জয়যুক্ত অভিযান, কারণ এ-পথে পথিক যাঁরা, তাঁরা আর যা-ই হন, সংস্কারের বশ নন।

[টি. এস্. এলিয়ট'এর 'দি মিউজিক অব পোয়েট্রি' ও 'ডিফিকাণ্ট পোয়েট্রি' অবলম্বনে ]

হুটি কবিতা

স্থুরজিৎকুমার দাশগুপ্ত-পঞ্চম বর্ষ, অর্থনীতি

প্রচ্ছন্ন কোরক

রজে বেঁধে রেথে প্রচ্ছন্ন কোরক নির্ধারিত দিক : কেউ-বা প্রেমিক কেউ প্রতারক । আবার অনেকে আসমুন্দ্র শোক নিয়ে বেঁচে থেকে সহসা সঠিক দেথেছে আলোক অকুণ্ঠ স্তবকে অর্ঘরচনায় । অথবা অধিক মহার্ঘ স্মারক কোনো প্রাতিস্বিক ;

আনে কল্পনায়

প্ৰজ্ঞার প্রভাবে কেউ হয়ত ভাবে অন্ধকারই ঠিক।

কারো কারো চোখ বাঁধানো সোনায়। সত্য সারাৎসার রয়ে যাবে দূরে আপেক্ষিকতায়। ( তবু অন্তঃপুরে কে শঙ্খ বাজায় সন্ধ্যাসমাগমে ! ) যদি কেউ ভ্ৰমে সর্প দেখতে পায় সামান্স রজ্জ্তে— প্রচ্ছন কোরক খেলছে সর্বভূতে নয়ত প্রতারক আর ধর্মস্থতে শৃত্য ব্যবধান ; শ্তা ব্যবধান কিঙ্গরে প্রভূতে।

#### প্রেম হতে, চুঃখ হতে, অনুকম্পা হতে

এ কোন গন্ধের ভারে পরিগ্নত সন্ধ্যা এলো ঘরে কিংবা বুঝি বিশ্মরণে দেখা দিলো বিশ্রুত বিজলী ( প্রেম কিংবা সর্বনাশ ! ) : আমি কায়মনোবাক্যে বলি থাকুক হৃদয় সথা একমাত্র সজাগ শিয়রে ঋতুর আহ্লাদে মত্ত সামাত্যের স্নিগ্ধ মুখশ্রীতে মুগ্ধ বালকের মত ধারাম্বানে বসন্তে বা শীতে ।

68

### ডোভারের উপকূলে

আহা ভয় অন্ধকারে পরিহার করো মন্দাকিনী পিপাসিত বালুতটে অনিরুদ্ধ অশেষ প্রবাহে। অলঙ্কারে বাজুবন্ধে কঙ্কণে যে-ধ্বনি আমি চিনি নিয়ত শস্কিত তারে সংসারের রুদ্র দাবদাহে পালিত ছায়ার শান্ত আশ্রেরে প্রতিশ্রুতি হতে তুমি কেন লুপ্ত হলে নৈঃসঙ্গের আপ্লুত সৈকতে।

আমি অবিশ্বাসে রিক্ত ? না এখনো নই। যথারীতি অভ্যাসের আরুগত্যে দিন কাটে ললাটলিখনে। ক্লান্তি অপথশ্রমত্র এরি মধ্যে অকস্মাৎ স্মৃতি লক্ষ মনোহর মেঘে জলে ওঠে সন্ধ্যার প্রান্ধণে বিপুল গন্ধের ভাবে পরিপ্নৃত রূপদী রজনী জানালায় দেখা দিলে শুনি অভীপ্সিত পদধ্বনি।

প্রিয় দিনগুলি যাবে হংসের মতন একে একে— নিয়মের রুঢ় মূর্তি ভীষণ জরার রূপে এসে দেখা দেবে। কিন্তু তুমি ? তুমি শুধু পদচিহ্ন দেখে কাকে আর খুঁজে নেবে বিশাল সৈকতে। অবশেষে পাখায় স্থলের ভার লঘু হতে হতে যাবো উড়ে প্রেম হতে ত্বঃখ হতে অন্থকম্পা হতে বহু দূরে।

ডোভারের উপকূলে

মূল কবিতা—ডোভার বীচ। এম. আর্নল্ড অন্নরচনা: **অমিয় বস্থ**—তৃতীয় বর্ষ, সাহিত্য

আজ নিশীথের সমৃদ্র স্থির। পূর্ণ জোয়ারের ক্ষণ, দূরে প্রণালীর 'পরে স্রস্পষ্ট চন্দ্রিমা। ফ্রান্সের তীরে আলো জ'লে নিবে গেল। এপারের শান্ত কুলে বহুদূর যুরে পাথুরে পাহাড় অনেক এথানে-ওথানে আছে অগভীর জলে

স্থন্দর রাত্রির হাওয়া, বাতায়নে এসো। যেখানে চাঁদের আলোয় প্লাবিত দেশের সাথে সমুদ্রের মিল, সেইখান থেকে আর্দ্র বাতাসের খাস, তাতে ক্রন্দন কাদের একসাথে আছড়িয়ে পড়ে রিনিঝিনি ঝিহুকেের দল, তরঙ্গের টান আবার চেউয়ের টানে হাহাকার ক'রে ভেসে—মজ্জমান। সারা উপকূল ধ'রে শব্দ ঝিহুকের, জাগে—আবার স্থদ্র, আবার জাগতে থাকে। সমুদ্রের ছন্দ কম্পমান মন্দাকান্তা তালে আনে চিরন্তন বিধাদের স্থর।

গ্রীদের সমুদ্রের ঢেউয়ে সোফোরিস, মান্নযের রতে, শুনলেন এই আর্তনাদ। জ্ঞান এলো উপলব্ধ আকরে বেদনার জলধিতে কর্দমাক্ত ভাঁটা আর স্রোতে। অশ্রান্ত অনন্ত সে স্থর দূরে আজ শুনি উত্তর-সাগরে।

প্রত্যায়র সমুন্দ্রগু ছিল পূর্ণ একদিন, বিশ্বের উপকূল সংবৃত উজ্জল কাঞ্চীপুটের মতো আশ্লেষ ক'রে। কিন্তু এখন শুনেছি তার দীর্ঘল শ্বাস, বেদনা অতুল শোকাহত ঢেউ শুধু ফিরে ফিরে যায় রাত্রির নিশ্বাস 'পরে। পৃথিবীর আদিগস্ত উপকূলে নগ্ন শিলারা হর্যহীন।

হায় প্রিয়া, পরস্পরের পাশে আমাদের সত্য হ'তে দাও— এ এক অন্ত জগৎ, বিচিত্র, স্থদর, এ যে স্বপ্নলীন, অভিনব। চোথ মেলে দেখো, এখানে যে কিছু নাহি পাও হর্ব, প্রেম, দিশা, শান্তি, কিম্বা দিগন্তের আলো, বেদনায় কিছু আশা। হেথা সংঘর্ষ-সংগ্রামে শ্রান্ত দ্বিধাময় অন্ধকারে আজ পরিক্ষীণ, বিভীষিকা কালো। ঘনীভূত তমসার রণে অচেতন যোদ্ধারা ভ্রান্ত।

# খেলার মাঠে কয়েকদিন

#### **দিব্যন্থ্যতি হাজরা**—পঞ্চম বর্ষ, ইংরাজী

"বানুসাহেব টিকেট, হুজুরসাহেব টিকেট, কিং এম্পারার টিকেট, গড অলমাইটি টিকেট" লিখলেন এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। নেহাৎ ভুল লেখেন নি, তখন কলকাতার রাস্তায় ঘাটে, অফিসে, কলেজে, কফিহাউসে এক কথা, এক মিনতি---দোহাই দাদা, যেমন করে হোক একটা টিকিট ম্যানেজ করে দিন না দাদা।

উপলক্ষ আর কিছুই নয়, কলকাতার ইডেন উন্থানে অন্থষ্ঠিত ভারত এবং অষ্ট্রেলিয়ার পঞ্চম ও শেষ ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ। কানপুরে ভারত জয়লাভ করার সঙ্গে সঞ্চ পঞ্চম টেষ্টের সমস্ত টিকিট চলে যায় কলকাতাবাসীর অতি পরিচিত স্থানে, লালবাজার পুলিশ অফিসের নাকের ডগায় অবস্থিত কালবাজারে। তারপর থেকেই আরম্ভ হয় কলকাতাবাসীর এই করুণ মিনতি—যেমন করে হোক, যত দামে হোক, একথানা টিকিট ম্যানেজ করে দিন না দাদা!

গুরুজনস্থানীয় কয়েকজন বেরসিক ভদ্রলোকের মুখ থেকে শোনা গেল—কি আছে মশায় এই থেলায় ? হাজার হাজার লোক দিনের পর দিন ঠায় মাঠে বসে বসে দেখবে কয়েকটা লোক মাঠে একটা বলের পেছনে ছুটোছুটি করছে, আর মাঝে মাঝে উচ্ছুসিত হয়ে হাততালি দেবে। যন্ত সব! আর তারই টিকিটের জন্ত এইরকম ভিক্ষে করে বেড়ানোর কোন মানে হয় ? আরে ছোং! বিরক্ত হয়ে তাঁরা মুখ ঘোরান। পরিষ্কার বুঝতে পারি টিকিট পাবার রুথা চেষ্টা করে এখন এঁরা "দ্রাক্ষা টক" স্থর ধরেছেন।

এই যখন বাজারের অবস্থা, তখন জনৈক বাল্যবন্ধুর রুপায় একখানা সি. এ. বি. কার্ড পেয়ে আনন্দ কম হয় নি, যদিও নগদ পঁচিশ টাকা খেদারৎ দিতে হয়েছিল। স্রেফ হাততালি ও আওয়াজ শুনে খেলার গতি আন্দাজ করতে আদা হাজার কয়েক টিকিট-বিহীন লোকের মাঝ দিয়ে যখন গেটের দিকে যাচ্ছি তখন বুঝি বা বুকের ছাতি কিছু বেড়েই গিয়েছিল।

মাঠে ঢুকে তো চক্ষ্স্থির—ইডেন গার্ডেনে এরকম ভিড় আগে কখনও দেখা গেছে বলে মনে পড়ে না। বাউগুারী লাইনের ভিতরে মাঠের মধ্যেও বেশ কয়েক হাজার দর্শক বদে গেছেন, এবং শ' হুয়েক পুলিশ কনষ্টেবল তাঁদের সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। চতুর্দিকে রংচং-করা বিজ্ঞাপন হাওয়ায় উড়ছে, এবং সেগুলির সঙ্গে পালা দিয়ে ঝক্মক্ করছে ভন্ত্রমহিলাদের রম্ভীন শাড়ী। বুঝতে পারলাম যে আজকাল আধুনিকা দাজতে গেলে ক্রিকেট-মাঠেও আসতে হয়—খেলার বিন্দুবিদর্গ না বুঝলেও। আধুনিকা হওয়ার অনেক জালা। আমাদের সি. এ. বি. রকের ভিতরে প্রথমেই চোথে পড়ল জ্ঞান-দিতে-

ψ

আসা বেরসিক গুরুজনদের কয়েকজনকে। তাঁরা বন্ধুবান্ধন, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বর্বে একদিনের জন্ত এসেছেন—বোধহয় দেখতে চান কি নিয়ে লোকে এত মাতামাতি করে ! তারপর দেখলাম ভারতবর্ষের কোন এক বিশেষ রাজ্যের বাসিন্দাদের—ইজে উদ্ভানের অবিচ্ছেন্ত অংশ তাঁরা। ট্রান্সিস্টার রেডিও, শক্তিশালী বাইনকুলার ও বিগ্লি খাবারের ঝুড়ি নিয়ে তাঁরা হাজির। সঙ্গে সংসারের প্রায় সকলেই এসেছেন—মায় পাচছ বছরের শিশুরা পর্যন্ত। সি. এ. বি.-র কাণ্ডকারখানা সঙ্গন্ধে ওয়াকিবহাল এক ভদ্রলোর বললেন যে এঁরা টিকিট না পেয়ে সকলেই হাজার টাকা দিয়ে সি. এ. বি.-র আজীবন সভা হয়ে গেছেন, এবং এসোসিয়েশনের সম্মানিত অতিথি হয়ে খেলা দেখছেন। তদ্রলোক সহজে থামতে চান না, বলে চললেন—"বুঝেছো ভায়া, শুরু এরাই নয়, এদের দল-পিছ ত্বজন করে চাকরও সি. এ. বি.-র মেম্বার হয়ে গেছে। তারা রোজ ছপুরে এসে এদে মধ্যে খুব কম লোকই ক্রিকেট সম্বন্ধে কিছু বোঝেন। অল্লক্ষণের মধ্যেই সেটা টের পেলাম।

প্রচণ্ড হৈ চৈ হাততালির মধ্যে খেলোয়াডরা ও আম্পায়ারম্বয় মাঠে প্রবেশ করলেন। খেলা আরম্ভ হ'ল। ভারতের ওপেনিং ব্যাটসম্যান কণ্টাকটর একটা বল গ্লান্স করলেন-রণজিৎ সিংজী আবিষ্কৃত এই শট্। বলটি তাঁর কাছে পৌঁছবার ঠিক আগে ব্যাট্স্ম্যান স্টাম্পের সামনে এসে দাঁড়ান, এবং এল-বি-ডব্ল্য অবধারিত মনে করে সকলে যধন উৎকন্ঠিত হয়ে তার্কিয়ে থাকেন, তখন দেখা যায় বলটি প্রচণ্ড বেগে লেগ বাউণ্ডারীর দিকে চলেছে। ঠিক এইরকম একটি শট় কণ্টাকৃটর করলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রখা—দাদা, এটা কী বোকোম হোলো? বুঝিয়ে বলি যে এটাকে গ্লান্স বলে। পরমূহর্তেই কিন্তু বুঝতে পারি বোঝানোটা কত অর্থহীন। কুন্দরাম একটা বল ছই শ্লিপের মধ্যে গলিয়ে দিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হাততালির মধ্যে শুনতে পেলাম প্রশ্নকর্তা গলা-অবধি-ঘোমটা-টানা তাঁর অন্দরমহলকে বোঝাচ্ছেন যে কুন্দরাম একটি বলকে অন্দাইডে স্বন্দরভাবে গ্লান্স করেছেন। ( এইখানে বলা যেতে পারে যে ভারতের প্রথম ইনিংসের থেলা যখন শেষ হয় তখন এই ভদ্রলোকই আমায় জিজ্ঞস করেছিলেন যে ভারতকে কোণঠাসা করেও অষ্ট্রেলিয়া ভারতের এগারোজন খেলোয়াড়ের মধ্যে দশজনকে আউট করেই ছেড়ে দিল কেন!) এই জাতীয় কথাবার্তা গুনে আমার মনে পড়ে গেল বহুকালের পুরোন এক বিদেশী ছায়াচিত্রের গল্প। এক আমেরিকান ভদ্রলোক ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট-ম্যাচের সময় লণ্ডনে আদেন। পৌছবার পরের দিন সকালে থবরের কাগজ খুলে তো তিনি থ। বলে কি লোকগুলো !---"England In Grave Danger. English Defence Crumbles Against Devastating Australian Attack" শিরোনামায় কাগজে খেলার খবর বেরিয়েছে। হৈ চৈ করে তো তিনি হোটেলের বহু লোককে তাঁর ঘরে জড়ো করলেন। এঁরা তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে

৩৮

ভন্রলোক যা পড়েছেন সেটা যুদ্ধের খবর নয়, থেলার খবর। ক্রিকেট যাঁরা বোঝেন না তাঁরা থেলা দেখতে গেলে প্রায়ই এই আমেরিকান ভন্রলোকের মত আশ্চর্য হন।

ক্রিকেটকে সাধারণত বলা হয়ে থাকে "a game of uncertainties"। ক'দিন (थला (परिश्व भारत र'ल किल्कि यहि "game of uncertainties" रुग्न, किल्कि नर्मकानद्व মনমেজাজ আরও "uncertain", অর্থাৎ কিনা একেবারেই অনিশ্চিত। এক মুহুর্তে যদি শোনা যায় কোন খেলোয়াড়ের প্রশংসায় দর্শকবুন্দ পঞ্চমুখ, পরের মুহূর্তেই তাঁর কোন সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতির জন্ত হয়তো সেই দর্শকেরাই তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধ করতে ছাড়বেন না। অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংসে ভারতের তরুণ থেলোয়াড় চান্দু বোর্দে একটি সোজা ক্যাচ ফেলে দিলেন। তার আগে তিনি ব্যাট করতে নেমে মাত্র ছয় রান করে আউট হয়ে যান। ব্যস, আর যান কোথা। যেদিকেই তিনি বল ধরতে যান নিকটবর্তী দর্শকের। তাঁকে অশ্রণ্য তাষায় গালাগালি করতে আরম্ভ করেন, এবং যাঁরা সেই স্থবিধায় বঞ্চিত তাঁরা ক্রমাগত হাততালির সাহায্যে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করেন। মাঠের অপরপ্রান্তে গুনলমি বোর্দে সেদিকে বল ধরতে আসছেন দেখে কয়েকজন তাঁকে ধরে মারার ব্যবস্থা করছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ পঙ্কজ রায় অবস্থা আঁচ করতে পেরে বোর্দেকে ফিরিয়ে দেন ও নিজে বলটি উদ্ধার করেন। এই সব দেখে মনে পড়ল--কয়েকমাস আগে এই বোর্দে যখন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের দুর্ধর্ষ হল এবং গিলক্রিস্টের বিরুদ্ধে দিল্লীতে এক ইনিংদে ৯৬ ও অপর ইনিংদে সেঞ্চুরী করেছিলেন, তথন তিনি ছিলেন সকলের হিরো, এবং তথন এই দর্শকেরাই তাঁকে বার বার অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আজ তিনি সকলের বিদ্রুপের পাত্র---মাত্র এক বছরের মধ্যে ক্রিকেট-দর্শকদের মধ্যে কি পরিবর্তনটাই না হতে পারে। তখন আশ্চর্য হয়েছিলাম এক বছরের পরিবর্তন দেখে, পরে আরও আশ্চর্য হলাম মাত্র চল্লিশ ঘণ্টার পরিবর্তন দেখে। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত যখন কোণঠাসা হয়ে লড়ছে তখন বোদে এলেন ব্যাট করতে। স্থন্দর মারের খেলা খেললেন তিনি, এবং পঞ্চাশ রান করে যখন আউট হয়ে গেলেন তখন হাততালিতে মুখর হয়ে উঠল ইডেন উত্তান। তার আগেই আবার তিনি অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে তিনটি উইকেট নিয়েছেন এবং একটি দর্শনীয় ক্যাচ ধরেছেন। তিনি এখন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ "অলরাউণ্ডার" কি না তাই নিয়ে আরম্ভ হ'ল তুমুল তর্কবিতর্ক।

ঠিক এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হ'ল গোপীনাথের বেলায়। প্রথম ইনিংসে চমৎকার ব্যাট করলেন তিনি, এবং দলের সকলের চেয়ে বেশী রান করলেন। তাঁর থেলা দেখে তথন দর্শকদের আনন্দ আর ধরে না। বিজয় হাজারের সঙ্গে তাঁর তুলনা আরম্ভ করলেন অনেকে, এবং তাঁকে অন্তান্ত টেপ্টে না থেলানর জন্ত বোর্ডের মুওপাত করলেন। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পর যথন সেই গোপীনাথ বিপক্ষের ব্যাট্স্ম্যানদের কয়েকটা বাউণ্ডারী রুখতে অসমর্থ হলেন, তথন আরম্ভ হ'ল বিদ্রপবর্ষণ—ব্যাটা গুপে থেলতে এসেছে! দৌড়োয় হাতির মত, বেরো মাঠ থেকে ইত্যাদি। তাঁর প্রথম ইনিংসের উন্চল্লি রান তথন তলিয়ে গেছে বিশ্বতির অতলে।

খেলার মাঠে প্রায়ই মনে হয় খেলা একঘেয়ে হয়ে গেছে--বিশেষতঃ যখন ব্যাট্ন্ম্যানেরা মারা বন্ধ করে কোনরকমে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে থেলে যান। এই সময় সাধারণত দর্শকেরা থেলা দেখা ছেড়ে নিজেদের মধ্যে থেলা বা অন্ত কিছু নিয়ে আলোচন করে সময় কাটান। ভারতের প্রথম ইনিংসে এইরকম অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। এক গোপীনাধ কিছটা মেরে খেলছিলেন, অন্তরা কোনরকমে মিনিট দশেক টিঁকে থেকে আউট হয় যাচ্চিলেন। দর্শকেরা আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত। মাঠে বোলাররা একটার পর একট মেডেন ওভার দিয়ে যাচ্ছেন, এবং এক-একটি ওভারের শেষে মুত্র হাততালিও পাচ্ছেন। জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক পাশে বসে ছিলেন, জিজ্ঞেদ করলেন—আচ্ছা বলুন তো, এই হাততালিটা কিসের জন্স, বোলার মেডেন ওভার দিয়েছেন বলে, না ব্যাটসম্যান আরণ একটি ওভার টিকে গেলেন বলে ? একটা জবাব খুঁজছি এমন সময় হঠাৎ "গেন, গেল রে, গুপীটা গেল" বলতে বলতে অন্ত পাশের ভদ্রলোক আমার কোটের উপর এক ভাঁড চা উল্টে দিলেন। ব্যাপার গুরুতর—গোপীনাথ আউট হয়েছেন। কিন্তু সেদিকে আমার মন ছিল না—ভাবছিলাম নতুন কোটটার কি দশা হ'ল, এবং পরের ক'দিন মাঠে কি প'রে আসব। আমতা আমতা করে বলেই ফেললাম—মশায়, এটা কি করলেন ? ভদ্রলোক এক ধমকে আমায় বসিয়ে দিলেন-কী হ'ল মানে ? দেখছেন না ইণ্ডিয়ায় একমাত্র হোপ গোপীনাথ আউট হয়ে গেছে। এখন কোলাপ্স থামাবে কে, আঁ? বলেই তাঁর পার্শ্বর্তী ভন্রলোকের সঙ্গে গোপীনাথের আউট হওয়ার সমালোচনায় মন্ত হ'ন। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য তিনি দোষ স্বীকার করেন—কিছু মনে করলেন না তো দাদা? খেলার মাঠে অমন একটু-আধটু হয়। বলেন তো আপনার কোটটা কাচিয়ে দিই। বলতে যাচ্ছিলাম যে তার কোন প্রয়োজন নেই, এমন সময় আশপাশ থেকে উত্তর আসতে আরম্ভ করল—মনে করলে পরে তো মারামারি করতে হয়। তা যখন সম্ভব নয় তথন মনে করেই বা কি লাভ ? আর-একজন ফোড়ন দিলেন—কাচাতে-টাচাতে দেবেন না দাদা, মেরে দেবে, ইত্যাদি। এর পর আারন্ত হয় দ্বিতীয় বক্তার সঙ্গে চা-বর্ষণকারীর বিতণ্ডা—প্রায় মারামারির যোগাড।

ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে খেলে ভারতীয় ব্যাট্শ্ম্যানরা আত্মপ্রদাদ লাভ করতে পারেন, কিন্তু দর্শকরন্দ মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেন না। বোর্দে, কেনী ইত্যাদি যখন বলের পর বল কোনরকমে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে টিঁকে আছেন, তখন এক ভদ্রলোকের ধৈর্যচ্যতি হ'ল। একেই তিনি দেরিতে এসে বসতে পান নি, তার উপর মাথায় ঘুরছে সোমবার অফি যেতে হবে। ভারতীয় ব্যাট্শ্ম্যানরা যদি এই রকম করে টিঁকে যান হয়তো তাঁর অষ্ট্রেলিয়ানদের ব্যাটিং ভাল করে দেথাই হবে না। ধৈর্যচ্যতি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

## খেলার মাঠে কয়েকদিন

তিনি বেশ জোরগলায় বিরক্তি প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে কয়েকজন দায় দিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেও ভত্তলোক থামেন না দেখে তাঁরা বেশ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। প্রথমে মৃত্ গুঞ্জনে তাঁদের বিরক্তি প্রকাশ পেল—কি ব্যাপার মশায়, কিছু খাওয়া-টাওয়া হয়েছে না কি? ভত্তলোক বোধ হয় গুনতে পান নি, কারণ তাঁর বক্তৃতা সমানে চলল। এর পর যুদ্ধঘোষণা—দেখুন মশায়, মাঝে মাঝে লেকচার দিলে কেউ আপত্তি করবে না, কিন্তু বেশী কপ্চাবেন না। ভত্রলোকও কম যান না, তেড়ে উঠলেন—কপ্চাবো না কেন? আপনাদেরই বা আপত্তি কিনেের ? ইস্থুলে পড়েন নি, সেখানে কপ্চাতে শেখেন নি? প্রথম ভত্তলোকের এবার চটবার পালা, তিনি তেলে-বেগুনে জ্বে জেল উঠলেন—আমরা তুরু ইস্থুলে পড়েছি, আপনি তো পাঠশালায়। ব্যস, আরম্ভ হয়ে গেল অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ।

অষ্ট্রেলিয়ানদের ব্যাটিং-এর সময় বুঝলাম ওঁদের অধিনায়ক বেনো কলকাতা ও মাদ্রাজের দর্শকদের সমঝদার কেন বলেছেন। যথনই ওঁদের ব্যাটিং-নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে, দর্শকেরা তাঁদের অকুঠ প্রশংসা এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে যথন ভারতীয়েরা ভাল বোলিং বা ফিল্ডিং করেছেন তাঁরাও হাততালি পেয়েছেন। ডুই ভদ্রলোক নরম্যান ও'নীলকে সেঞ্চুরী করার জন্তু মাল্যদান করতে এসে পুলিশের পাল্লায় পড়েন। তারপরই প্যাভিলিয়ান গেট দিয়ে সোজা হাজত।

দর্শকদের এই মনোভাব দেথে খুব তাল লাগল। আরও তাল লাগল হুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে সৌহাদ্য দেখে। ব্যাটুসম্যান, বোলার ও ফিল্ডারদের মধ্যে মাঠে যে প্রীতির সম্পর্ক গডে উঠেছিল তার অনেক নিদর্শন দর্শকেরা পেয়েছেন। ব্যতিক্রমও হয়েছে বটে, তবে খুব কম। কুড়ি-একুশ বছরের তরুণ জয়সীমা তাঁর জীবনের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে অপূর্ব ব্যাট করছিলেন। তিনি যখনই কোন ভাল শট করেছেন বা বাউগুারী মেরেছেন, তখন শুধু দর্শকদেরই নয় প্রত্যেক অষ্ট্রেলিয়ান ফিল্ডারের অভিনন্দন পেয়েছেন। মনে পড়ে একবার উইকেটকীপার গ্রাউট জয়নীমার বিরুদ্ধে এল-বি-ডব্ল্য'র জন্ত আপীল করেন। আম্পায়ার সঙ্গে সঙ্গে আপীলটি নাকচ করে দেন। জয়সীমা আপীল শুনে একটু আশ্চর্য হয়েছেন দেথে গ্রাউট একটু হেসে তাঁর পিঠ চাপড়ে দিলেন। ঘটনাটির শেষ এথানেই নয়। কিছুক্ষণ পরে জয়সীমা একটি বল স্বন্দরভাবে গ্রাউটের হাতের পাশ দিয়ে থার্ডম্যান বাউণ্ডারীর দিকে পাঠালেন। গ্রাউট আপ্রাণ চেষ্টা করেও বলটি থামাতে পারলেন না। বলটি বাউগুারী পেরিয়ে যাবার পর জয়নীমা আন্তে আন্তে এসে গ্রাউটের পিঠ চাপড়ে আবার ফিরে গেলেন। ভারতীয় থেলোয়াড় ও অষ্ট্রেলিয়ানদের এই থেলোয়াড়-হুলভ মনোভাবের তারিফ না করে পারা যায় না। মাঠে যথন কুকুর, বেড়াল বা চিলের উপদ্রব হয়েছে তাঁরা বিরক্ত হ'ন নি, বরং দর্শকদের আনন্দে যোগ দিয়েছেন। হার্ভের খালি হাতে চিলকে এবং পঙ্কজ রায়ের ব্যাট দিয়ে কুকুরকে গুলি করার প্রয়াস, হার্ভের কুকুরটিকে কাছে ডেকে আদর করার চেষ্টা, এবং বার্জ কর্তৃক বেড়ালটিকে তুলে, আদর

83

করে মাঠের বাইরে দিয়ে আসা প্রভৃতি ছোট ছোট ঘটনাগুলি দর্শকদের অনেকদিন মন থাকবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের পুলিশবাহিনীর বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না। বেড়ালটি যথন মাঠে চুকল তথন তাঁদের টিকিটিও দেখা যায় নি। থেলা বন্ধ করে যথন বার্জ বেড়ালটি তুলে নিয়ে গেলেন, তথন এক কনস্টেবল বাউণ্ডারী লাইনের ধারে তাঁর হাত থেকে সেটি নিল। তবে পুলিশ-পুঙ্গবদের স্বরূপ সত্যিই উদ্বাটিত হয় যেদিন মাঠে কুকুরটি ঢুকেছিল। আম্পায়ার কুকুরের দৌরাত্ম্যে থেলা বন্ধ করে দিয়ে পুলিশ ডাকলেন। মহাপ্রভুৱা সদলে ময়দানের দিক থেকে লাঠিসোঁটা নিয়ে তেড়ে এলেন। হুজন তো পৌছোবার আগেই পপাত ধরণীতলে। তারপর আরম্ভ হ'ল কুকুরকে তাড়া করা। লাঠির বহর দেখেই কুকুরের উন্তানবিহারের শথ মিটে গিয়েছিল। বেচারা ল্যাজ তুলে পশ্চিম গেটের দিকে ছুটল। বেরোতে যাবে এমন সময় সেদিক থেকে আরও একদল প্রলিশের আবির্ভাব। কুকুরটি অগত্যা আবার মাঠে ফিরে এল। থেলোয়াড়রা থেলা বন্ধ করে কেউ বা বনে, কেউ বা মাটিতে গুয়ে সারমেয় কর্তৃক কলকাতার পুলিশবাহিনীকে ঘোড়দৌড় কর্ষান উপভোগ করছিলেন। প্রায় আট-দশ মিনিট কুকুর ধরার রূথা চেষ্টা করে পুলিশবাহিনী "re-inforcements" তলব করলেন। প্যাতিলিয়ান গেট দিয়ে এবার এলেন একদল এন. সি. সি. ক্যাডেট্। কুকুরটি বোধ হয় হাঁপিয়ে পড়েছিল, তাই একদিনের পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ করা হয়েছে ভেবে সে সরে পড়ল। সেদিন রাত্রে কলকাতার কুকুরমহলে মহানগরীর লাল-পাগড়িদের সম্বন্ধে কি আলোচনা হয়েছে জানতে ইচ্ছে হয়।

যে পাঁচদিন কলকাতায় থেলা হয়েছে কোন দিন মাঠে লোকের কমতি ছিল না। মনে আছে একদিন এক ভন্তলোকের টিকিট থেকে সেদিনের তারিখটা গেটে হেঁড়া হয় নি। ভন্তলোক ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক তাঁকে হেঁকে ধরল—তিনি যদি টিকিটটা দেন তাহলে অন্তত আরও একজন থেলা দেখতে পারে। একজন তো তাঁকে দশ টাকা পর্যন্ত দিতে রাজী। শেষ পর্যন্ত ভন্তলোক বিরক্ত হয়ে সর্বজনসমক্ষে টিকিট থেকে সেই দিনের তারিখটা ছিঁড়ে দিলেন।

পরিশেষে আমাদের কফিহাউদের শভুদার অভিজ্ঞতার কথা না বললে লেখা অসমাপ্ত থেকে যাবে। প্রতি বছর ইডেন উত্থানে ফিরিওয়ালারা বাজারের দ্বিগুণ দামে জিনিসপত্র বিক্রি করে থাকে। ক্যান্টিন-মালিকেরাও মওকা পেয়ে বেশ কিছু কামিয়ে নেন। এই হেন পরিবেশের মধ্যে শভুদা জনসাধারণকে service দেওয়ার জন্ত একটা ক্যান্টিন খুলেছিলেন। তিনি ঠিক করেছিলেন যে সি. এ. বি.-কে দেয় ৫০০, টাকা তিনি পকেট থেকে দিয়ে যথাসন্তব সন্তা দামে সাধারণের কাছে খাবার বিক্রি করবেন। অন্তান্ত ক্যান্টিন-মালিকেরা তাঁকে নিরস্ত করার অনেক চেষ্টা করেছিলেন-হেয় তিনি ক্যান্টিন বন্ধ কঙ্গন, নয় স্বাই যে দাম নিচ্ছে সেই দাম নিন। তিনি তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেন নি। বলাই বাহুল্য খেলার ক'দিন তাঁর ক্যান্টিনে প্রচও তিড় হয়েছিল, কিন্তু সব চুকে

ŝŚ

যাবার পর তিনি দেখলেন যে পাঁচ দিনে যত লোক তাঁর ক্যান্টিনে খেয়েছে তার শতকরা প্রায় পঞ্চাশ জন ভিড়ের স্থযোগ নিয়ে দাম না দিয়ে চলে গেছে। অনেক হৃঃথ করে তিনি বললেন যে মধ্যবিত্ত বাঙালীর উপকার করার জন্ত তিনি এগিয়ে এসেছিলেন, এবং এই তার প্রতিদান।

পাঁচ দিনের খেলা এবং তার পূর্বে একুশ দিন ধরে টিকিটের জন্ত হয়রানি শেষ হয়েছে। এই ক'দিনে খেলার মাঠে অনেক কিছুই দেখেছি এবং শুনেছি। ভারতীয় দল ভারতবর্ধের মুখরক্ষা করেছেন, এবং ক্রীড়ারসিকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। দি. এ. বি.-ও নানাভাবে দর্শকদের আনন্দবর্ধনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁদের একটি বিশেষ প্রচেষ্টার কথা বলে শেষ করব। কলকাতার এক দৈনিক সংবাদপত্র এই দিকে প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সি. এ. বি.-র নিমন্ত্রিত দর্শকদের গ্যালারীর দিকে তাকালে দেখা যেত যে সেখানে আছেন বহু ব্যবসায়ী, চিকিৎসক। কাছেই বসেছিলেন বহু মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, এবং তাঁদের পাশেই দেখা গেছে সন্ত্রীক জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টারকে। সি. এ. বি.-কর্তুপক্ষ এই ক'দিন ইডেন গার্ডেনে যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, মার্কস্বাদীরা বহু চেষ্টা করেও গত একশ' বছরে তর্তটা এগোতে পারেন নি।

## দেওঘরে: সকাল

#### কাননবিহারী গোস্বামী--- ষষ্ঠ বর্ষ, বাংলা

এবং আশ্চর্য দেখো, এথানেও করবীর ডাল, তু-একটি পাম গাছ, কিছু হেনা ফোটে একাস্তেই ঘাদের বুকেতে মুক্তো ঝিলমিল—আর কিছু নেই; কি মিষ্টি নরম রোদে তরে গেছে ছুটির সকাল। নন্দন-পাহাড়ে স্থ্য একটু পরে জলোজলো লাল— 'নম: শিবায়' গান মন্দিরেতে, দ্রে তপোবন। গোলক-চাঁপার কুঞ্জ, কৈশোরের স্থতি উন্মন, গ্রামের রঙন নদী মনে পড়ে: ঢেউ উত্তাল।

আলো-আঁধারির ছবি ছায়াছায়া কাস্টার টাউন। টুকরো গানের কলি, গোধূলির কুস্থুম আলো চেতনায় ঘূম আনে। সকাল তো এর চেয়ে ভালো, বাসন্তিক খুশী মনে—দূরাগত যদিও ফান্তুন। এখানেও আসে দেখি আকাশেতে সোনালি আখিন, হাওয়ায় ছুটির রেশ: বাংলায় ফেলে আসা দিন॥

# ঘসা হু'আনি

### রপেন্দু মজুমদার—তৃতীয় বর্ষ, ইতিহাস

কথনও কি গিয়েছেন শ্র্যামবাজারের মোড়ে ? দেখেছেন কি, কেমন করে মধ্যবিত্ত মান্নয জন্তুর মত দিন কাটায় ?

উহু, জন্তু বললে ভুল হবে। জন্তুদেরও বুঝি ইচ্ছে-অনিচ্ছের একটা ক্ষীণ প্রশ্ন থেকে যায়। এ মাহুযগুলো যেন মৃত।

এককালে এরা জ্যান্ত ছিল। সে অনেকদিন আগেকার কথা। তথন হয়ত পাম গাছের ছায়ায় বসে সহপাঠিনীর সঙ্গে French Revolution এর গল্প করত। চোথে থাকত রঙিন স্বপ্ন; মনে থাকত মানবিকতার উগ্র অহুভূতি। Universityর ঘরে বসে বসে Roman slaveদের নির্যাতনের কথা গুনে গায়ের রক্ত গরম হয়ে উঠত। বিদ্রোহী মন নিস্পিদ্ করত।

আজ তারা কোথায়? কোথায় গেল সেই সব সজীব মন? মন বলে, তারা নেই। তারা আত্মহত্যা করেছে, ঐ ঝুলে-পড়া মেরুদণ্ড আর বসে-যাওয়া হ্যতিহীন চোথগুলোর মধ্যে। তাদের চিন্তা গেছে ভোঁতা হয়ে। তাদের কল্পনা গেছে উবে। আছে শুধু একটা হাড়ের কাঠামো। কলের পুতুলের মত যতদিন তার দম ততদিন চলবে। তারপর অগাধ শান্তি, অনন্ত অন্ধকার।

তাই বলছিলাম—সমাজের উচুতলার লোক—সমাজের ভিতে ঘুণ ধরেছে। এখন থেকে সাবধান হওয়া দরকার। এখনও হয়ত নীচের তলাটা চুনকাম করলে টিঁকতে পারে। তাই সময় থাকতে নীচের তলার খবর রাখা দরকার।

হর্, যত শব আজগুবি চিন্তা। মনটা কেমন যেন ধোঁয়াটে লাগছে। যতই ভাবি এই শব ছাইভন্ম আর ভাবব না। কি হবে ভেবে ? শৃত্ত হাড়ে আবার বিদ্রোহের আগুন। না, না, এ অসম্ভব।

## ঘসা হু'আনি

কিন্তু মন তৰু মানে কই ? মন বলছে—সে আগবে। আমি তার আগার শব্দ গুনেছি।

আবে, বাদ এদে গেছে যে। বড্ড ভিড়। তুর্, ভিড় কোথায় ? ওদের গায়ে কি মাংস আছে নাকি ? শুধু তো হাড় ! তাও অনাহারে গুকিয়ে গুকিয়ে ক্ষীণ হয়ে এদেছে। ছোট্ট ফুটবোর্ডেই দাত-আট জনের জায়গা দিব্যি মিলবে। ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে ঝুলে ঝুলে যাচ্ছ তো ! তাতেই খুশি থাক। কারণ আমরা নিজেরাই এমনি করে কোনরকমে জীবনধারণের ফুটবোর্ডে ভর করে বাকীটা জন্মমৃত্যুর মাঝথানে ঝুলিয়ে রেথে দিন কাটাচ্ছি।

ভাবতে ভাবতে চোথ পড়ল, রেললাইনের ধারে টালির ঘরগুলোর ওপর। তাদের মধ্যে একটা নতুন রং করা। রংটা সবুজ। উদ্দেশ্ত পরিষ্কার। পুরোনো জীর্ণ বাড়িটাকে বাইরের ভোল পাল্টিয়ে নতুন করে তোলা। কিন্তু সামনের কাচভাঙা শার্মিটা আর হেলে পড়া দরজাটা বিশ্বনিন্দুকের মত আসল কথাটা ফাঁস করে দিচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ল—আচ্ছা, টালির ঘরগুলোর মত পৃথিবীর সর অচল পুরোনোকে যদি তার বাইরের রূপ সরিয়ে আসল রূপ দেখা যেত তো কেমন হত।

"দেখুন তো স্থার, ছু'আনিটা ঘদা কি না।" চমকে উঠি। প্রথমে যেন ঠাহর করতে পারি নি। ব্যাপারটা কি ? তারপর তাকিয়ে দেখি আমার সামনে ঝুলছে একটা আধ-ময়লাটে সার্ট-পরা, শির-ওঠা কালো হাত। হাতে একটা ছু'আনি। ছু'আনিটা একটু নেড়েচেড়ে দেখতেই হল। সত্যিই চলবে, না, অজস্র হাতে ঘদে ঘদে অচল হয়ে গেছে। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে 'চলনসই' আর 'অচলনসই'-এর ফারাকটুকুও এতই ক্ষীণ হয়ে এসেছে যে ঠিকমত ধরতে গেলে সব ideaই পুরোনো, all human conceptions are outdated.

নিশ্চয়ই ভাবছেন, হয় শীঘ্রই বিবাগী হচ্ছি, কিংবা frustrated ; নইলে a born pessimist । উহু ভুল করছেন। আমি এর কোনটাই নই।

আবার একপ্রস্থ চমকাবার পালা। আরে মশাই, মাঝে মাঝে একটু-আধটু এদিক-ওদিক আবোলতাবোল যে ভাবব তারও জো নেই।

"ত্ব'আনিটা না চললে ফিরিয়ে দিন, নেমে যাই," বলেই ব্যস্ত হয়ে দামী vanity bagটা তুলে নিয়ে উঠে পড়ে একটি স্থবেশা তরুণী। স্থন্দরী, হ্যা তা হলেও হতে পারে; আবার নাও হতে পারে।

আবার দব গুলিয়ে গেল। জগৎটা যেন একটা আস্ত complex sentence. কোথায় যে কোন clauseটা কি ভাবে গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে তা মালুম করা কঠিন-ব্যাপার। (মনে আছে তো, School Finalএর complex sentence এর analysis; যেন জিলিপির প্যাচ। মনে করলে এখনও গায়ে জর আসে। চোথের সামনে দেথি

٩

ইংরেজির মাষ্টার মশাই বেত হাতে theatreএর concert বাজিয়ে চলেছেন।) এক্যা ভাবলুম, হয়ত সত্যিই পয়সা নেই। অথচ গন্তব্যে তাকে পৌছতেই হবে।

হঠাৎ যেন বাজ পড়ল। তীক্ষ্ণ, কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে তরুণী, "আপনি পয়া দিলেন কেন ? আপনাকে কে অধিকার দিয়েছে আমার personal affair'এ interfere করতে ?"

বাপ্ রে, ভয়ে প্রথমে ছু' পা পিছিয়ে এদেছিলাম। তারপর ভাবলাম আজকালকা মেয়েদের বাইরের স্নিগ্নতা এতই ক্ষীণজীবী যে, এক মুহূর্তে তা হিংস্র পণ্ডর মত বীজ্য হয়ে উঠতে পারে।

আর একদফা ধমক, "কই উত্তর দিচ্ছেন না যে !"

আমি আরও ঘাবড়িয়ে গিয়ে বলি, "Street courtesy"—বলতে বলতে চো তুলে যা দেখলুম, সত্যি বলছি ভাই, তার্কিক বলে বন্ধুমহলে বেশ খ্যাতি আছে, কি এ-হেন হিংস্র রক্ত চক্ষুর সামনে একেবারে চুপ্সে বোবা বনে গেলুম। তারপর, আবা নীরবতা; মনে মনে চিস্তার জট; সামনে পেছনে যাত্রীর হুড়োহুড়ি।

এমনি করে কত অংসথ্য খণ্ড খণ্ড ঘটনা জীবনের হাজার ঘটনার ভিড়ে হারিঃ যায়। কিন্তু ত্ব'একটা অকিঞ্চিৎকর ঘটনা যেন শেষ হয়েও শেষ হতে চায় না।

সেদিন বিকেলে কফি হাউদে বনে আছি। হঠাৎ ষেন মনে হল সামনের টেবিল্যে একাকিনীটি অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছেন।

একটু বাদেই একটা হালফ্যাশনডুরস্ত মেয়ে এসে ব্যস্তভাবে বলে, "কি রে ইন্ এথেনে বদে কি করছিদ; আর আমরা দব তেতলায় বসে আছি তোর জন্য। নে ওঠ।" কিন্তু ইলু কোন জবাব দেয় না। মেয়েটা তথন অধৈর্য হয়ে, একটা বাঁকোনি দিয়ে বলে, "কি রে, উত্তর দিচ্ছিদ না যে বড় ?" উত্তরে বহুদুর থেকে ভেদে আদে দীর্ঘনিঃধাদ ভরা ছোট একটা "হঁ"।

হ'জনেই উঠে এগিয়ে আদে আমার দিকে। আমার একটু ভয় লাগে। উঠ দাঁড়াই। ততক্ষণে ইলা দেদিনকার vanity ব্যাগটা খুলে একটা চক্চকে হু'আনি এগিয় দিয়ে বলে, "আপনার হু'আনিটা।"

আমি একটু বিরক্ত হয়ে বলি, "আপনারটা তো আনিনি।"

ইলা আরও একটু ঘেঁসে এসে হাসতে হাসতে বলে, "রাগ করলেন তো; যাৰ্ আমরা reciprocity achieve করলুম।"

কথাটায় আহত হই। জবাব দিই, "কি রকম, আপনাকে তো আমি অপমান করিনি।"

"Excuse me," আর একটু হেদে বলে, "বদা যাক্, কি বলেন ? বেয়ারা, জি কফি।"

#### ঘসা হ'আনি

"মাপ করবেন," বাধা দিয়ে বলি, "আমি তো কফি খাই না।"

"কফি না থান, অন্ত কিছু।" ঘাড় ছলিয়ে আপ্যায়নের স্থরে বলে।

গন্ডীর মুথে একটা জুতসই জবাব ছুঁড়ে দিই, "আপনি বুঝি খাইয়ে সেই পয়সাটার শোধ তুলতে চান।"

"না, না তা বলছি না," ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলে, "তবু তো বসা যেত।"

"না," শান্ত কণ্ঠে জবাব দিই, "আমার তো আর সময় নেই।"

ইলা তাড়াতাড়ি একটা কার্ড দিয়ে বলে, "এতে আমার ঠিকানা আছে, যাবেন।"

আমি যথাসন্তব শিষ্টাচার বজায় রেথে একটু ঘাড় নাড়িয়ে দরজায় এগিয়ে যাই।

ইলা দৌড়ে এসে আর একবার বলে, "বলুন, যাবেন তো ?"

আমি আশ্চর্য হই। হঠাৎ মনে হয় সেদিনের বাদের ইলা আর আজকের কফি হাউদের ইলু যেন সম্পূর্ণ হু'টো মেয়ে—একজন রাগে দর্পে হিংস্র; আর একজন স্নিগ্ধ ব্যবহারে কোমল।

এমনি নানান কথা ভাৰতে ভাৰতে বেরিয়ে আসি ; আর ওরা চড়ে বসে একটা কালো রঙের 'Cadillac'এ।

হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে আক্ষেপ করি—'হায়রে কবে কেটে গেছে 'Revolution'-এর কাল।' নাঃ, উচুতলার লোকগুলো আজকাল বড্ড হুঁশিয়ার। তারা আঠেরো শতকের French aristocracy'র মত বোকা নয়। বরং ভীষণ সেয়ানা।

অনেকদিন পর, একদিন মনে হল—বিকেলটা যেন অসহা। সময়ের যোড়াটা যেন থোঁড়া হ'য়ে গেছে। চারদিকে যেন বড্ড গুমট। গেলুম ইলার বাড়ী। বালিগঞ্জে জাহাজ প্যাটার্নের বিরাট বাড়ী। দারোয়ানকে বললাম, "এটা কি Ila Basuর বাড়ী?" দারোয়ান সেলাম ঠুকে নিঃশব্দে ভেতরে যেতে নির্দেশ দিল। 'Drawing Room'এ বসলাম। একটু বাদেই দেবীর দর্শন মিলল।

ঘরে ঢুকেই ইলা উচ্ছুসিত হয়ে উঠল, "আরে বিমলবারু যে। আমি তো কল্পনাও করতে পারিনি।" তারপর ব্যস্তভাবে হাঁক ছাড়ে, "হিরালাল, lemon squash নিয়ে এদ।" বলে ইজিচেয়ারটা দেখিয়ে বলে, "বস্থন বস্থন ; তারপর বলুন খবর কি ? ওং সেই কবে আদতে বলেছিলাম, আর এতদিন পরে সময় হ'ল। আমি তো ভেবেছিলুম আপনি ভূলেই গেছেন।" এক নিঃশ্বাসে সমস্তটা বলে গেল।

এমনি উৎকট অভ্যর্থনার মধ্যে দিয়ে সেদিনকার সন্ধ্যেটা কেটে গেল। ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরলাম mass revolution না হলেও হয়ত অদূর ভবিয়তে দশটা পাঁচটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব। ধনপতি শণ্ডরের একমাত্র কন্থার জামাতা। ভাবতেই যেন দেহে কেমন শিহরণ জাগে। যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপেরই কোন কারসাজি।

তারপর আবার সেই বাস—ভিড়—অফিস—ক্লান্তি—ঘুমানো—দারিদ্র্য।

একদিন সকালবেলা বেরোবার জন্ত তোড়জোড় করছি। একটা ভোঁতা রেড দিয়ে যতই দাড়ি কামাবার চেষ্টা করছি ততই দাড়িগুলো আস্ত থেকে যাচ্ছে।

ওদিকে চৌকির ওপর বসে ছোট ভাইটা। শীত করছে বলে হেঁড়া লেপ গায়ে দিয়ে ঠক্ঠক্ করে কাঁপছে। এদের শীতই করুক আর মরেই যাক্ ফি-বছর পাশ করতেই হনে। আর তবেই না Employment Exchange-এর সিংহত্বয়ারে হানা দেওয়ার passport পাবে।

এমন সময় পিয়ন একটা থাম ফেলে দিয়ে গেল। নীল থামের ওপর বেশ লাঃ মেয়েলি হরফে আমার নাম লেখা। মনটা আশঙ্কায় কাঁপতে লাগল। পোষ্টকার্ড ছাড় তো কেউ আমাকে চিঠি লেথে না। মধ্যবিত্তরা আবার সামাত্ত চিঠির জন্ত দামী খাম কিনবে। থামটাকে তাই মনে হল যেন কোন মায়াপুরীর রাজকন্তার হংসদৃত। চিঠি খুল বিশ্বয় আরও বেড়ে গেল।

#### বিমলবাবু,

আপনি আর কফি হাউসে যান না কেন ? সামনের শনিবারদিন Metro-সামনে আপনার জন্ত অপেক্ষা করব। আশা করি নিরাশ হব না।

#### ইতি

আপনার ইলু

চিঠির পরিষর ছোট। কিন্তু prospect বড়। মনটা আগামী স্থথের স্বপ্নে সাময়িকভানে খুশীতে ভরে উঠল। আদর ক'রে ছোট ভাইটাকে বললুম, "তপু, এবার মাসকাবারে তোকে একটা র্যাপার কিনে দেব।" পাঠরত তপু একটু বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল। মন মনে ভাবল দাদা তো এমন মিষ্টিস্থরে কোনদিন কথা বলে না। সেদিন তপু প্রথম আবিষ্কার করল যে দাদার গলাটা ভারি মিষ্টি।

তারপর যথারীতি শনিবার এল। আর আড়াইটে বাজতে না বাজতেই Metro ব সামনে গিয়ে হাজির হলুম। ভাবলুম দেখিনা ভাগ্যটা ফেরে কিনা। আরে, পৃথিবীতে বেশীর ভাগ বড় বড় লোকই তো সাধারণ স্তর থেকে ভাগ্যের জোরে ওপরে উঠে বসেছে।

এমনি ছাইপাঁশ নানারকম ভাবতে ভাবতে আড়াইটে বাজল। যড়ির কাঁটা হ'টো আমায় সচেতন করে দিল। আর মনটাও সঙ্গে সঙ্গে আরও চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। হাজার হাজার মোটর যাওয়া-আসা করছে। আর বুকের ভেতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। এমন সময় সবুজ রঙের গাড়ী থেকে নামল ইলার সেই বান্ধবীটি। মনটা আশঙ্কায় হলে উঠল।

তবুও ক্বত্রিমতা এড়াতে পারি না। এক ঝলক হাসির বিনিময়ের পরই মেয়েটি বলে চলে, "বিমলবার্, কিছু মনে করবেন না; Mr. Chowdhury U. S. A. যাচ্ছেন কিনা; B. E. কলেজ থেকে তাঁকে আজ farewell দিচ্ছে। ইলাকে দেখানে ……" আর কিছুই গুনতে পাই নি। কানের মধ্যেটা যেন ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। সামনের রাস্তাটাকে মনে হল যেন ধোঁয়ায় ভর্তি। আশপাশের লোকগুলো ঝাপসা হয়ে এল। মেয়েটির বাকী কথাগুলো বাতাসে মিলিয়ে গেল। গুরু কতকগুলো বিচ্ছিন্ন শব্দ আমার চারদিকে বার বার বেজে উঠতে লাগল।

"Mr. Chowdhury; U. S. A.; farewell; ইला।"

পরের মুহূর্তেই মনে হল সামনে রয়েছে মধ্যবিত্ত জীবনের ধু ধু মকন্তৃমি। আার তার মাঝে রুপণ মেঘের ত্ব'চার ফোঁটা উত্তপ্ত জলের মত ধনী মালিকের ত্ব'চার ফোঁটা করুণা।

হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালাম, দেখলাম মেয়েটি তখনও দাঁড়িয়ে। এগিয়ে গিয়ে বললাম, "গুনছেন, ইলা দেবীকে বলে দেবেন সেদিন বুঝতে পারি নি তাঁর হু'আনিটা সত্যিই ভীষণ ঘদা।" বলেই রাস্তায় নেমে পড়লাম।

চলতে চলতে ভয় করছিল, কি জানি পথটাও কৃত্রিম নয় তো। হয়ত দেথব এই পায়ে চলার পথটা ভোজবাজির মত আকাশের দিকে উঠে গেছে। আর আমরা সেই পথের দিকে হাত বাড়িয়ে শৃত্যে ঝুলে রয়েছি।

83

# রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাঙলা কবিতা

অশান্তকৃষ্ণ দেব-প্রথম বর্ষ, সাহিত্য

কবিতা মানবমনের চিরন্তন আনন্দ-সঙ্গীত।

হৃদয়ের গভীর গহনের প্রদীপ্ত অন্নভৃতি রূপ পায় ভাষায় আর সেই ব্যঞ্জনাময় কাব্যস্থ্যমা তৃপ্ত করে রসিক জনের পিপাসা। কবিতার প্রভাব সব কালেই সমান কিন্তু প্রকাশ-বৈচিত্র্য ও প্রযুক্তি সম্পূর্ণরূপে যুগ-কেন্দ্রিক। বাঙ্লা কাব্যে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে এই যুগ-কেন্দ্রিকতার লক্ষণ স্পষ্টত দেখা দিল।

রবীন্দ্রনাথের স্বষ্ট পথে কয়েকজন কবি—কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি—অগ্রসর হইলেন সত্য কিন্তু বৈচিত্র্যের আভাস থাকিলেও তাঁহাদের কবিতা অলস রুত্রিমতা ও পৌনপুনিকতার সীমায় আবদ্ধ রহিল। অপরদিকে যুদ্ধোত্তর হতাশা, অর্থনৈতিক জীবনে ভাঙন এবং রুশ-বিপ্লব ও বিদেশী রাজশক্তির অত্যাচারের মধ্যে বাস্তবের পটভূমিকায় এক তরুণ কবিগোষ্ঠার অভ্যুদয় হইল। রবীন্দ্রকাব্যে সমাজ-জীবনের যে বাস্তব প্রতিফলন ছিল না, ইহাদের কবিতায় তাহারই অন্ধপ্রবেশ ঘটিল। তবে, এ কথা অনস্বীকার্য, বিপরীতধর্মী কাব্যোদ্দেশ্ত হইলেও এই ন্তন যুগের কবিতায় রবীন্দ্র-প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে কিছু পরিমাণে নিহিত ছিল। বলা যায়, রবীন্দ্র-ধারার ভিত্তিভূমিতে আধুনিক কবিগণে বাঙ্লা কবিতায় নব দিগন্তের সন্ধান আনিয়া দিলেন।

সে-কালের সংস্কার-শাসিত পাঠক ও উচ্কপালে সমালোচক ইহাদের হুনজরে দেখেন নাই, কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই নতুন যুগের কবিদের স্বীকৃতির সন্মান দিয়াছেনঃ

'সম্প্রতি বাঙ্লা সাহিত্যে নব্য রীতির কাব্য দেখা দিয়েছে, এটাকে অনধিকার প্রবেশ বলে রুথে দাঁড়াবার কোন আইন নেই। যেমনি প্রাণের রাজ্যে তেমনি সাহিত্য-কলা-দৃষ্টিতে টিঁকে থাকার দারাই তার অধিকার সপ্রমাণ হয়—পুরাতন ও নৃতন শাস্ত্রবাক্য দারা নয়।…এই কাব্যও যে তেমন চলবে না কারুর মৃথের কথায় তার স্থির সিদ্ধান্ত হবে না।…অন্তঃপুরচারিণী কবিতা অন্দর থেকে সদরে এলেই সে হবে স্বধর্মচ্যুত, সাহিত্যের ঐতিহাসিক নজির দেখলে বোঝা যায়, এ কথা আজ যারা বলছেন হয়ত তাঁরা কাল বলবেন না।'…

উত্তর-যুগের কবিতার পথিরুৎ রবীন্দ্র-অন্তর্বর্তী ও -পরবর্তী যুগের কবি দেহাত্মবাদী মোহিতলাল, বিদ্রোহী মজরুল, হুঃথবাদে-বিশ্বাসী যতীন্দ্র সেনগুপ্ত ও ছন্দযাহুকর সত্যেন্দ্রনাথ। বিদ্রোহী আধুনিকতার উদ্বোধন হইল নজরুল ইসলামের অগ্নিক্ষরা লেথনীতে। সোচ্চার কণ্ঠে তিনি মানবতার জয়গান গাহিলেন ; ঋজু, কঠিন ভাষায় যুবসমাজকে আহ্বান জানাইলেন স্বাধীনতার রক্ত-রাঙা পিচ্ছিল পথে :

> 'কারার ঐ লৌহ-কপাট ভেঙে ফেল কররে লোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ-বেদী।'

দিতীয়ত, মোহিতলালের কবিতায় আমরা পাইলাম নবতর রূপের যৌবন-বন্দনা ; সৌন্দর্যময় উপমায় কল্পনা ও বাস্তবের সংমিশ্রণে দেহকেন্দ্রিক ভোগপিপাসার স্থম্পষ্ট স্বীকৃতি :

> 'তপন যখন অন্তমগন ভূবন ভ্রমণ শেষে আমি তপনের স্বপন দেখি গো পথিক বধুর বেশে।'

এরই পাশাপাশি সত্যেন্দ্রনাথের সহজ পারল্য—( ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক যুগে স্বদেশের গৌরব-কাহিনী ও বাঙালীর সাধারণ পরিবেশের স্থ-ছংথের ব্যঞ্জনা )—

'চামেলী তুই বল

কোথা থেকে নিয়ে এলি রপের পরিমল।'

এবং যতীন্দ্রনাথের শ্লেষতীক্ষ বিজ্ঞপ সেকালের পাঠক-চিত্তে নৃতন ভাবজগতের আস্বাদ আনিয়া দিল।

পরবর্তী কালে এই বৈচিত্র্যের স্থর 'কল্লোল যুগে'র (১৯২৪-১৯৩০) কবিদের মাধ্যমে আধুনিকতার উদ্বোধন স্থচনা করিল। বিদেশী লরেন্সীয় চিন্তাধারা, হুইটম্যানের জীবন-দর্শন এবং ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিকতা কল্লোল যুগের কবিদের – প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বস্থ, জীবনানন্দ দাশ, অচিস্ত্য দেনগুপ্ত —বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। উল্লেখের কথা, একই সময়ের কবি হইলেও তাঁহাদের কবিতায় বিভিন্ন স্থর ধ্বনিত হইয়াছিল। সমাজ-চেতনার লক্ষণ থাকিলেও তাঁহাদের কবিতা মূলত রোমান্টিক। এই সময়কার রোমান্টিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ অগ্রগণ্য। নির্জন নিঃসঙ্গ প্রকৃতি-চিত্রের সহিত ঐতিহ্বমুখী ইতিহাস-চেতনা তাঁহার কবিতার ভোগোলিক পরিধি বিস্তৃত করিয়াছে। 'হাজার বছর স্তথ্ন থেলা করে'-র ইন্দ্রিয়গ্রু আশ্চর্য চিত্ররপময়তা সত্যই উপভোগ্য—

> 'হাজার বছর শুধু থেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো : চারিদিকে পিরামিড—কাফনের ড্রাণ ; বালির উপরে জ্যোৎঙ্গা—থেজুর-ছায়ারা ইতস্তত বিচুর্ণ থামের মতো : এশিরিয়—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, য়ান । শরীরে মমির ড্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন ; 'মনে আছে ?' স্থধালো সে—স্থধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন ।'

আবার, 'বন্দীর বন্দনা'র কবি বুদ্ধদেব বস্থর প্রথম দিকের কবিতায় যৌন ভাবাহ্ন-ভূতি ও বন্দী প্রেমের তীব্র কাতরোক্তি পরিলক্ষিত হইলেও 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থ ও ৩ৎ-পরবর্তী যুগের কবিতায় স্নিগ্ধ প্রেম ও সঙ্গীতময় কবিমাননের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে অজিত দত্তের রোমান্টিকতা হৃদয়াহূভূতি ও সহৃদয়তার আশ্চর্য স্পর্শে স্বন্দর ও প্রাণধর্মী :

> 'মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মত চঞ্চল, উদ্দাম মালতী, সেধানে আমি আমার স্বাক্ষর রাখিলাম আমি সেই বায়ুস্রোতে খদে পড়া পালকের মত আকাশের শৃত্ত নীলে মোর কাব্য লিথি অবিরত দে আকাশ তোমার অন্তর মালতী, তোমার মনে রাথিয়াছি আমার স্বাক্ষর।'

কিন্তু সকল দিক দিয়া বিচার করিলে বলা চলে এই সময়কার শ্রেষ্ঠ করি প্রেমন্দ্র মিত্র। তাঁহার প্রথম পর্যায়ের কবিতা---সৌন্দর্য-মাধুর্য ও সমাজ-চেতনার সমন্বয়ে কবি-মানসের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। 'প্রথমা'র কবি কেবলমাত্র নিসর্গ-চিত্রের মধ্যেই হৃদয়কে আবদ্ধ রাখিলেন না, জনতার সহিত নামিয়া আদিলেন পথের ধ্লায়। তাই দৈনন্দিন জীবনের সংঘাতে অতিষ্ঠ জনতার দরদী কবি নিপ্পেষিত, অবহেলিত, অত্যাচারিত মাহুষের সপক্ষে ঘোষণা করিলেন আপন অভিব্যক্তি--

> 'অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম, আমি যে তাদের চিনি ; হুই তুরঙ্গ তাহাদের রথে, উদ্ধত উদ্ধাম, —শোন তার শিঞ্জিনী।'

কিন্তু 'প্রথমা'-উত্তর যুগের বিশ্ব ও জাতীয় জীবনের বিরাট পট-পরিবর্তন কবি অহুধাবন করিতে পারেন নাই—তাই পুরাতন মতবাদকেই তিনি আঁকড়াইয়া ধরিলেন। 'সাগর-থেকে ফেরা'য়ও এই জীবন-পলাতক কবিমানসের লক্ষণ। বস্তুত প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিমানস আজ প্রত্যক্ষ গণসংগ্রাম হইতে দূরে—অতীন্দ্রিয় কল্পনাবিলাসের ধৃসরতায় আচ্ছনন

'পরিচয়' পত্রিকার মাধ্যমে দিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বাঙ্লাকাব্যে আবির্ভুত হইলেন বিষ্ণু দে, সমর সেন, স্থশীন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কবি। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর এক শ্রেণীর যুরোপীয় কবিতার অন্ধ অন্তকরণকে ইহারা তথাকথিত 'আধুনিকতা'র ট্রেড মার্ক দিয়া তুর্বোধ্য শন্ধ-সমারোহে সাম্যবাদ ও গণ-ঐক্যের ব্যাখ্যা শুরু করিলেন। কিন্তু এই ভঙ্গীসর্বন্ধ কবির দল জনতার কথা আওড়াইয়াছেন মাত্র নিরাপদ ব্যবধান হইতেই, প্রকৃতপক্ষে গণ-

৫২

মানদের সহিত এক হইবার সাহস, সততা ও আদর্শনিষ্ঠা তাঁহাদের ছিল না। বিষ্ণু দে-র বিদগ্ধ মনের কাব্য-প্রমাণ, সমর সেনের অস্বস্তিকর প্রলাপ ও স্থগীন্দ্র দত্তের যুক্তিহীন নৈরাখ্য কাব্যপাঠকের নিকট আধুনিক কবিতাকে হুর্বোধ্য করিয়া তুলিল—

> 'জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া \* নির্বিচারে নির্বিবাদে সওয়া,

> > শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্ভাব' —স্থীন্দ দত্ত

তবে 'পরিচয়'-গোষ্ঠীর বিষ্ণু দে মননের ক্রম-পরিণতিতে আজ সহজবোধ্য ও অগ্রগ্রামী কবিরপে স্বীকৃত। 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ', 'আলেখ্য' কাব্যে প্রথম যুগের সংশয়বাদিতা হইতে সাধারণ জীবনধারায় তাঁহার বিশ্বাদের ইঙ্গিত বর্তমান। হৃদয়ের গভীর গহনে আজ তাই কবির অন্বেষণ :

> 'হৃদয়ে তোমাকে পেয়েছি স্রোতস্বিনী তুমি থেকে থেকে উদ্ধার মত ছোটো ; কখনও জোন্নারে আকণ্ঠ বেয়ে ওঠো তোমার সে রূপ অহল্যার মত চিনি।'

কিন্তু সমর সেন ও স্থধীন্দ্র দত্ত আজও তাঁহাদের ধূসর তাবালুতা ও রুচিশীল (?) বৈদধ্যের সীমা অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

'পরিচয়'-গোষ্ঠীর নৈরাশ্তবাদিতার পাশাপাশি এই সময় বাঙ্লা কাব্যে নতুন আশাবাদের সাড়া পাওয়া গেল।

বিংশ শতকের চতুর্থ দশকে তারুণ্য ও বিশ্ব-ব্যাপক চেতনা লইয়া আবিভূতি হইলেন কবি স্থকান্ত ভট্টাচার্য। স্থকান্তের 'ঘুম নেই', 'ছাড়পত্র' সামাজ্যবাদী শাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোটি কোটি সাধারণ মাহুযের বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত।

পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ কবির অহুক্ত বেদনা ব্যক্ত হইল ব্যর্থ দিনযাপনের ইতিহাসে :

> 'আমার বসন্ত কাটে থাতের সারিতে প্রতীক্ষায় আমার বিনিদ্র রাত্রে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়; আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে আমার বিশ্বয় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল হুই হাতে।'

এবং আশাবাদী মন দেখিল আগামীর উজ্জল স্বপ্ন :

'রক্তে আনো লাল

রাত্রির গভীর হ'তে, ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগে কম্যনিঙ্মের প্রভাব সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হইন। বিশ্ব যুদ্ধের রক্তক্ষয়ী বীভৎসতা ও মানবতার নিষ্ঠুর অপমানে অতি আধুনিক যুগ-সচেতন মান্ধ-বাদী কবিগণ রোমান্টিসিজ্ম ও ধনতান্ত্রিক (capitalistic) সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রত্যক বিল্রোহ ঘোষণা করিলেন এবং কাব্যকে জীবন-সংগ্রামের আত্যন্তিক অঙ্গে রপান্তরিত করিলেন। অতিপ্রকট আন্তরিকতা ও উগ্র প্রচারমূলকতার চাপে তাঁহাদের কাব্যোদেশ্ মাঝে মাঝে থেই হারাইয়াছে সত্য, কিন্তু বস্তুত এই কাব্যরুতিই এ যুগের সমাজবাদী বান্তবতার প্রকৃত রূপায়ণ। শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত সমাজের নৈরাজ্যিক অবক্ষয়ী চিত্র-ই নয়, তাঁহাদের কবিতা আগামী কালের প্রত্যুষ প্রতীক্ষার স্থম্পষ্ট ইঙ্গিত :

> 'এখুনি ৱক্তে রক্তে শোনা যাবে জলদ্গন্তীর মহাকালের হাঁক ঃ

কে জাগে

ভালবাসার গা থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে

সগর্বে বলে উঠব : আমরা ॥'

—স্থভাষ মুখোপাধ্যায়

১৯৪৮ সাল হইতে ( স্বাধীনতা লাভের পর) বাঙ্লা কবিতার নৃতন ঋতুবদলের পালা শুরু হইয়াছে; সাম্প্রতিক যুগের কবিদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বাঙ্লা কবিতা আদ্ধ নৃতন পথের সন্ধানী। তবে রবীন্দ্রোত্তর ও আধুনিক কবিতা নানা ভাব ও প্রকাশ-বৈচিত্রো বিভিন্ন পথে পরিচালিত। এ যুগের কবিদের মধ্যে হরপ্রসাদ মিত্র, দিনেশ দাস, বিষলচন্দ্র ঘোষ, শুদ্ধসন্থ বস্থ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, অমিয় চক্রবর্তী, সরোজ দত্ত, মনীশ ঘটক, গোবিন্দ মুথোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তীর কথাও ম্বরণযোগ্য। এঁদের কেউ জীবনান্নগ রোমান্টিক, কেউ জনতার সংগ্রাম-পথের সহযাত্রী, কেউ বা ছর্বোধ্য কল্পনা-বিলাসী।

সাম্প্রতিক কবিদের রচনায় চিন্তাশীলতা ও প্রতিভার লক্ষণ পাওয়া গিয়াছে—নতুন পলিমাটির গঠনে নতুন মানব-সমাজ গড়িবার কথা তাঁহাদের রচনায় মুখ্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এ আশা আজ আর তাই নিরর্থক নয় যে, নব যুগের তরুণ কবিদের বলিষ্ঠ আশাবাদ ও প্রত্যয়নিষ্ঠ দৃঢ়তায় তাবী কালের কবিতা সত্য-সফল-স্থন্দর জীবনের জয়গানে মুখর হইয়া উঠিবে।

**@**8

# ফ্রয়েড ও নবমূল্যবোধ : মাক্স বাদীর দৃষ্টিতে

#### পল্লৰ (সনগুপ্ত- পঞ্চম বৰ্ষ, বাংলা

রুশোর মতে, মান্নয জন্মায় স্বাধীন হয়ে, কিন্তু তারপর কোনো-না-কোনো ভাবে সে হয় বন্দী। মান্নয সম্পর্কে ফ্রয়েডের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা ঐ রকমের। তিনি বলেছিলেন, সভ্য মান্নযের হাজার রকম বন্ধনই তার মানসিক প্রবৃত্তিগুলোকে অবদমিত করে রাথে; আর সেই অবদমনের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই জটিলতার স্বষ্ট হয় তার মনোজগতে।

লোকাচার, ধর্মাচার, সামাজিক, পারিবারিক কিংবা রাষ্ট্রীয় আচরণবিধি ও অন্থশাসনগুলো মাহুষের প্রাথমিক বাসনাগুলোকে বন্দী করে রাখার ফলে তার ব্যক্তিত্ব থাকে পরাধীন হয়ে। ফলে, ব্যক্তিত্বের যে প্রকাশটা ব্যবহারিক জীবনে রূপায়িত হয়, দেটাও আসলে থণ্ডিত বা অসম্পূর্ণ। মনের প্রাথমিক চাওয়াগুলোর এই অচরিতার্থতাই মাহুষকে ভাল বা মন্দ করে। এ অবদমনই কথনো পরিণত হয় শিল্পীর শিল্পে, কথনো কবির কাব্যে কিংবা যোদ্ধার বীরত্বে—আবার কথনো চরিতার্থতা থোঁজে অধোগমনের পথে গিয়ে। অর্থাৎ, মাহুষের ইতিহাসের মহত্তম এবং ঘ্বণ্যতম—ছ'রকম কাহিনীরই উৎস এক।

এর কারণ হিসেবে আচার্য ফ্রয়েড বলেছেন যে, অস্ফুট, বন্দী কামনা-বাসনাগুলোর সঙ্গে শিক্ষা, সংস্কার এবং প্রতিবেশের একটা চিরন্তন বিরোধ থাকে এবং তারই পরিণতি হিসেবে মান্থযের চরিত্র স্থ বা কু, মহৎ বা জঘগুরূপে অভিব্যক্ত হয়।

এখানে একটা কথা অবশ্চই স্মরণীয়। মনের 'প্রাথমিক কামনা-বাসনা' বলতে ফ্রেড যা বলতে চেয়েছেন, তার মূলে প্রচ্ছন্ন থাকে রতি-প্রেরণা (sex urge)। এর যুক্তি হিসেবে তিনি বলেছেন যে, সাহিত্যে এবং শিল্পে আদিরসই পরিণত হয়েছে অনাদিকালের রসে হয়ত অনন্তকালেরও! তারপর, যে-কোনো ধর্মেই আরাধ্য এবং আরাধকের মধ্যে 'কান্তাভাবের' সম্পর্কটাই প্রয়ুরতম। অর্থাৎ সমন্ত রকম সাধনারই শিকড় হিসেবে আছে ঐ প্রাথমিক রতি-প্রেরণা।

ঠিক এইখান থেকেই ফ্রয়েডীয় মনোদর্শনের মৃল্যায়ন শুরু। আচার্য ফ্রয়েডের এই বৈগ্নবিক সিদ্ধান্তে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তথাকথিত নীতিবাগীশ বুর্জোয়া কর্তৃপক্ষ। মান্থযের হাজার হাজার বছরের ইতিহাদের মহৎ ঐতিহ্য, যুক্তির আলোতে এইভাবে অনাবরণ হয়ে পড়ায় তাঁকে আথ্যা দেওয়া হলো—সভ্যতার শত্রু, মানবজাতির পক্ষে পাপস্বরূপ !

কিন্তু সত্যিই কি তাই ?…না। মান্থবের ইতিহাসের বিরুদ্ধে এই ধরনের জেহাদ ঘোষণা ফ্রয়েডের আগে করেছেন রাসকিন, রুশো, কার্লাইল। তাঁদের চিন্তাধারা বুর্জোয়া দর্শনের একটা বিরাট অংশকে প্রভাবিত করে রেখেছে। আর প্রত্নতপক্ষে এইসব বুর্জোয়া মনীধীদের চিন্তাধারাই অন্থবর্তিত হয়েছে ফ্রয়েডীয় মনোদর্শনে। স্থতরাং, বুর্জোয়া কর্তৃপক্ষ তাঁর ওপর খড়্গহন্ত হলেও, আসলে তিনি বুর্জোয়া তাত্ত্বিকতারই পোষকড করেছিলেন।

ফয়েডের আগে বুর্জোয়া চিন্তানায়কদের দর্শনের মৌল বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রতিভাদ্ত হয়েছিল, ব্যক্তিস্থাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি। শিল্পবিপ্লবের ফলে যে রেনাসাঁস শুরু হয়, তার প্রথম তৃটো কথাই ছিল মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের অন্ধসংস্কারগুলির প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং মাহুযের আত্মগত স্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। এতদিন সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবহায় ভূস্বামী থেকে ভূমিহীন চাষী পর্যন্ত প্রত্যেকেই একটা নির্দিষ্ট স্থত্রে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। শিল্পবিপ্লবের ফলে সেই স্থতো গেল ছিঁড়ে! আপাতভাবে এথানে স্বাই স্ব-তন্ত্র, কারুর ওপর কারুর জোর নেই—উৎপাদক বা উৎপন্ন বেচতে বা কিনতে স্বাই নিন্দের মজির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা তো তা নয়। সমষ্টিপ্রিবণ সমাজ, দামন্ততন্ত্রের নঙ্গেই ভেন্ধে পড়লো ঠিকই, কিন্তু ধনতন্ত্রের কাঠামোয় এসে একক ব্যক্তিষ্ণ ণোষণের হাত থেকে রেহাই পেল না। এইথান থেকে স্থেষ্ট হল মাহুযের মনে জটিল এক দ্বন্দ্বের। একদিকে, তার মনে ব্যক্তিস্থাতন্ত্র্যের চেতনা এসেছে, অন্তদিকে তার ওপর শোষণ কমেনি, বরং বেড়েছে। এর ফলে তার অবদমিত সত্তা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে, আর সেইটারই পরিণতি হয়েছে মানসিক জটিলতায়।

ঐ যুগের সাহিত্যেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে দেখানো যায় ডক্টর ফন্টাসের চরিত্র, হ্যামলেটের চরিত্র, ম্যাকবেথ, ক্রুশো বা স্থাটানের চরিত্র। এঁদের সকলেই সেই জটিল আত্মকন্দ্রিকতার ভাবরূপ। বান্তব পৃথিবীর পারিপার্থিক বন্ধনের বিরুদ্ধে এঁরা সবাই একা হয়ে লড়াই করেছেন। সমষ্টিগত প্রতিবেশের বিরুদ্ধে এই স্নাতন্ত্র্যের বিদ্রোহের মধ্যেই বুর্জোয়া-সংস্কৃতির প্রাণসত্তা বিকশিত।

এই বিকাশ, আচার্য ফ্রয়েড বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির ওই বিরোধের কোনো প্রকৃত সমাধান তিনি নির্দিষ্ট করতে পারেননি। তাই তাঁর দর্শনের সার্থকতা বন্দী হল 'পলায়নবাদ'-এর কবলে।

কথাটা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। বাস্তব পৃথিবীর অন্থশাসনকে মানতে গিয়ে মান্থয বাধ্য হল 'ইউটোপিয়া'য় বিচরণ করে মানসিক তৃপ্তি লাভ করবার চেষ্টা করতে। সেই প্রয়াদের নাম দিয়েছেন ফ্রয়েড—'ইড্' (Id i.e. pleasure principle)। এর সঙ্গে বিরোধ বাধে—'ইগো' (Ego i.e. reality principle)-র। অর্থাৎ অবদমিত মানসিক বৃত্তিগুলো যখন কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে সার্থকতায় উড়তে চায়, তখনই তার সঙ্গে দন্দ বাধে বস্তুজগতের সচেতন মান্থয-সত্তার। রুশো প্রমুখ মনীযীরা এই সংঘাতকে উপলন্ধি করে, তার থেকে রেহাই পাবার জন্তে কল্পনার শোক-তাপ, শাসন-শোষণহীন সমাজের ছবি এঁকেছেন। কিন্তু সেই সমাজকে বাস্তবায়িত করবার কোনো সার্থক পহা তাঁরা নির্দেশ করতে পারেননি। এইটাই 'পলায়নবাদ'। রুশো-রাদকিন প্রমুখদের চিন্তাধারার ঐ অসঙ্গতিটুকু পরবর্তীকালে দেখিয়ে দিয়ে-ছিলেন মার্স্মা মান্নযের সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রতিবেশকে পরস্পরবিরোধী বলে ভুল করার ফলে, তাঁরা ভাব-জীবন এবং বান্তব-জীবনের বিরোধের কোনো সমাধান করতে পারেননি। ঠিক এই ভ্রান্তি ফ্রয়েডীয় দর্শনেও হয়েছে।

অবশ্য ফ্রয়েড, কশো, রাসকিনের মত 'হুথী সমাজ' গড়তে হবে, ভির্মাত্র এটুকু বলেই ছেড়ে দেননি—পলায়নী-মনোবৃত্তিসম্পন্ন হলেও, তাঁর মনোদর্শনে সে ব্যাপারে একটা দিকনির্দেশের প্রয়াস আছে ৷.....'Against the dreaded outer world, one can defend oneself only by turning away in some direction; if the difficulty is to be solved, it is to be solved single handed...... Another method of guarding against pain, is by using 'libido-displacements' that our mental equipment allows of, by which it gains so greatly in flexibility."'

—অর্থাৎ, এর সারকথা হলে। এই যে, বাস্তবজ্ঞগৎ দুরে সরিয়ে দিয়ে যদি একক সাধনায় তপ্তি পাওয়া যায়, তা হলেই হুঃখ এবং বেদনা বলে আর কিছু থাকবে না।

এইটাই ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার অপূর্ণতা। তা নইলে, বিশ শতকে মার্ক্সবাদ ছাড়া, ফ্রয়েডীয় মনোদর্শনের মত স্বষ্ট এবং সার্বিক আর কোনো মতবাদের স্বষ্টি হয়নি। ফ্রয়েড তাঁর মনোসমীক্ষণ পদ্ধতিতে প্রমাণ করেছেন যে আমাদের নিত্যদিনকার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন নয়, তারা এক একটা নির্দিষ্ট নিয়মের অন্তগামী। তিনি প্রমাণ করেছেন, স্বপ্ন জিনিসটা অলোকিক কিছু নয়, মনেরই নিভ্ত অংশের প্রতিফলন সেটা। স্বচেয়ে বড় কথা, ফ্রয়েড প্রমাণ করেছেন—মারুষের মন অনড় বা জড় নয়। তার একটা বিপুল গতিশীলতা আছে; অর্থাৎ জীবনের চলার ধর্মকে ফ্রয়েড বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কিন্তু আঁচার্য ফ্রয়েডের দর্শনের সীমারেথা ঐ পর্যন্তই। জীবন ও ইতিহাসের চলার ধর্মকে তিনি স্থপ্রতিষ্ঠভাবে প্রমাণ করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই চলার সার্থকতা বিশ্লেষণ করতে তাঁর দর্শন অসফল। ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সংস্কৃতির বেদনা তিনি উপলব্ধি করেছেন ঠিকই, সেই সমাজের পর শোষণহীন স্থণী পৃথিবীকে দেখতে চেয়েছেন, তাও ঠিক, কিন্তু তার জন্তে যে পন্থা নির্দেশ করেছেন, সেটা অ-বান্তব, পলায়নপর। তাই বিপুল সন্তাবনার স্বাক্ষর থাকা সত্ত্বেও ফ্রয়েডীয় দর্শন পরিণতি লাভ করেনি; বুর্জোয়া সংস্কৃতির অবক্ষয় থেকে সরতে গিয়ে, আরও বেশি করে সেই ফাঁদে ধরা দিয়েছে।

Ċ٩

<sup>&</sup>gt; Sigmund Freud : Civilisation & discontent

# বিংশ শতাব্দীর অপেরা

## **স্তহাস চৌধুরী**-পঞ্চম বর্ষ, ইংরাজী

এক মনোরম শীতের সন্ধ্যা। কোন এক দেশের বৈঠকথানায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গ্ল্যাভিস্কে ঘিরে বসেছে গল্প শোনার অসীম আগ্রহে। শিশুদের এমন ছর্নিবার কৌতৃহল মেটানোর জন্তে প্রায়ই এমন মজলিশ গড়ে তুলতে হয় গ্ল্যাভিস্কে। বৈঠকথানার এক ধারে এক তরুণ পিয়ানো বাজিয়ে চলেছে। গ্ল্যাভিসের গল্প শোনার আগ্রহ তারও কোন অংশে কম নয়। এই তরুণটির নাম নর্মান চ্যাফিং, একজন উদীয়মান স্থ্রস্রস্টা। মাঝে মাঝে পিয়ানোতে উচ্ছল স্থরের তরঙ্গ তুলছে ও আবার কথনও কোন অসতর্ক মুহূর্তে থেমে যাচ্ছে বাজাতে বাজাতে।

"ঘটনাটা আমার পিতামহী জুলিয়েটের জীবনে ঘটেছিল" দৃঢ়তার সঙ্গে কাহিনী শুরু করে গ্ল্যাডিস্। বড় ভাই গে ও ছোট বোন সোপীকে নিয়ে বেশ আনন্দেই দিন কাটাচ্ছিলেন জুলিয়েট সাফোক্ শহরে। একদিন বাড়ীর অদূরে কিসের এক শন্ধে জুলিয়েট ও গে ছুটে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

সাফোক শহরের বড় বড় কারথানার চিমনি ও হাঁ-করা উন্থনগুলোর যত রুল ও ময়লা পরিষ্কার করানো হ'ত মাতৃত্বেহ-বঞ্চিত দরিদ্র অসহায় শিশুদের দিয়ে। আকাশ-হোঁয়া চিমনিগুলোর ওপরে ওঠার যাতনার বিরুদ্ধে যুগ যুগ ধরে অনেক অভিযোগ, কত দীর্ঘখাস নিফ্চল হয়েছে। এমনি ছুংখের ছায়া একদিন শিশু স্তাম স্ণ্যারোর জীবনেও ঘনিয়ে এলো, সে এসে পড়ল চিমনি-ঝাড়ুদারদের মালিক অত্যাচারী ববের সান্নিধ্যে-সন্তান পালনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হ'ল স্তামের বাবা। বব ও তার ছেলের যৌথ প্রচেষ্টা আরম্ভ হ'ল স্তামের ওপর নিদারুল উৎপীড়ন করার। জোর করে তাকে তুলে দেওয়া হ'ল গগনচুম্বী চিমনির ওপরে। পৃথিবী অন্ধকার করা ধোঁয়া আর দাউ দাউ করা আগুনের হল্বা দেখে স্থানের ছোট্ট হৃদয় আঁৎকে উঠল ভয়ে, ব্যাকুল হয়ে উঠল বুকফাটা চীৎকার করে বাঁচবার জন্তো। গে'র সহযোগিতায় জুলিয়েট যথন স্তামকে চিমনি থেকে নাবিয়ে আনলেন, তথন সে ভয়ে কাঁপছে থরথর করে, আকুল আবেদন জানিয়ে বলছে আর যেন তাকে ঐ বিভীষিকার মুথে ঠেলে দেওয়া না হয়।

গল্প শেষ হ'ল গ্র্যাডিসের। শিশুরা ভয়ে আমনন্দ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। আর তারপর ? তারপর নর্মান চ্যাফিং তাঁর অপেরা স্ঠষ্টি করলেন এই গল্পের ভিত্তিতে।

বিংশ শতাব্দীর অপেরার এক জনপ্রিয় কাহিনী এটা। এর রচনা করেছেন বিখ্যাত ইংরেজ অপেরা-স্রষ্টা বেনজামিন্ ব্রিটেন ( Benjamin Britten )। আধুনিক অপেরার স্কান্টতে এমন কাহিনী অনেক আছে। এ ছাড়াও 'ট্রয়লাস ও ক্রেসিডা' (Troilus and Cressida), 'এ টেল অফ টু সিটিজ্' (A Tale of Two Cities) প্রভৃতি বহু পরিচিত গল্প স্থরের বৈচিত্র্যে অভিনবভাবে দর্শকের কাছে উপস্থিত করার প্রয়াসও দেখা যায়।

আধুনিক অপেরার উৎস সদ্ধান করতে হ'লে ক্রিন্তফ ্টইলিবাল্ড গ্লুক (Christoph Willibald Gluck)-এর যুগে আমাদের ফিরে যেতে হবে। এঁর বিধ্যাত অপেরা, 'অর্ফেও এড্ ইউরিডিসি' (Orfeo ed Euridice) আধুনিক অপেরার পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রসিদ্ধ। কোবে (KOBBÉ)-র ভাষায় "it is the great-great grandfather of modern opera". কিন্তু বিংশ শতাব্দীর অপেরা গ্রুক্-এর কাছেই ঋণী নয়, এর ক্রমবির্তন ঘটেছে স্বদূর মিরাকেল্ প্লেশ্ (Miracle Plays), মিষ্টিরি প্লেশ্ (Mystery Plays) ও মাধ্দের (Masque) যুগ থেকে, আঁর আধুনিকতার রণ নিয়েছে মন্তেভের্দি (Monteverdi), হেনরি পার্দেল (Henry Purcell) ও জন গে (John Gay)-র 'দি বেগার'ন্ অপেরা'র (The Beggar's Opera) অমোঘ প্রভাবে। গ্রুক্-এর 'অর্ফেও এড্ ইউরিডিসি'-র সঙ্গে তাই মন্তেভের্দি-র 'লা ফাভোলা ভ'র্ফিও' (La Favola D'Orfeo)-র নামও জড়িয়ে আছে।

অধ্যাপক ওয়েস্টরাপ (Westrup) তাঁর 'The Heritage of Music' (Vol. III) নামক বিধ্যাত গ্রন্থে এই অপেরাকে যুগস্প্টকারী বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন যে এটা নৃতন যুগের স্হচনা করেছে 'not because it broke new ground, but because in it imagination took control of theory'. বিংশ শতাব্দীর অপেরা'র ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে মোৎদার্ট (Mozart), বেঠোফেন (Beethoven), ভাগ্নার (Wagner), কাতালিনি (Catalani), পুচিনি (Puceini) বোয়ালদিয়্ (Boieldieu), তলিব্ (Delibes), মুদর্গস্থি (Mousorgsky), ওয়ালেদ্ (Wallace), মেটানা (Smetana) প্রভৃতি জগৎপ্রসিদ্ধ অপেরা-অষ্টাদের নাম যে চিরদিনই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

অষ্টাদশ শতাব্দী ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের মত বিংশ শতাব্দীর অপেরার স্বষ্টি শুধুমাত্র কয়েকটি বিশেষ দেশেই সীমাবদ্ধ নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এখন এর প্রভূত চর্চা চলেছে।

আধুনিক কালে জর্মানীতে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন যে অপেরা-স্রষ্টা, তাঁর নাম স্ট্রাউন্ (Richard Strauss—১৮৬৪-১৯৪৯)। পরে এঁর খ্যাতি পৃথিবীর নানাদেশের সঙ্গীতমহলে ছড়িয়ে পড়ে। স্ট্রাউন্-এর বিখ্যাত অপেরা অস্কার ওয়াইল্ড (Oscar Wilde)-এর 'স্তালোমী'। ইংরেজী থেকে জর্মান ভাষায় অন্তবাদ করেছিলেন হেড্ভিক্ লাখ্যান্ (Hedwig Lachmann)। 'স্তালোমী'-র ভাবের

ওপরে ভিত্তি করা এই কাহিনীতে স্ট্রাউদ স্থর হৃষ্টি করেছিলেন। 'শ্র্যালোমী' প্রথম ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বার্লিন শহরে মঞ্চম্থ হবার দঙ্গে সঙ্গে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিনে। স্থরের বৈচিত্র্যে, কণ্ঠম্বরের মাধুর্যে এবং বিশেষ করে প্রারস্তের সঙ্গীত-মূর্ছনায় দর্শকরা অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। তাই আর্ল অফ হেয়ারউড় (Earl of Harewood) সম্পাদিত কোবের 'কমপ্লিট অপেরা বৃকে' বলা হয়েছে: "When all is said and done, Salome' has unusual qualities, not least its unquestioned vitality. What could be more evocative and suggestive of what is to come than the opening music, which so unerringly sets the scene ?" (পৃ: ৯১৫)। স্থাউদ পরিচালিত 'স্থালোমী' অপেরার বিভিন্ন চরিত্র:

"হেরড এণ্টিপাস	•••	•••	টেনর ( Tenor )
হেরোডিয়স		•••	মেজোসোপরেনো
( হেরডের স্ত্রী )			( Mezzo-Soprano )
ন্থালোমী	•••	•••	সোপরেনো
( হেরডের কন্যা )			(Soprano)
জোকেনাস্	•••	•••	বেরিটোন্ ( Baritone )
পাঁচজন জু	• • • •	•••	চারটি টেনর ও একটি বেস্
			(four Tenors, one Bass)"

ষ্ট্রাউদ্ রচিত অন্তান্থ অপেরার মধ্যে 'ইলেক্ট্রা' (Electra) 'ডের রোজেনকাফালিএর' ( Der Rosenkavalier---গোলাপের নাইট ), 'ডি ফ্রাউ ওনে শাটেন্' (Die Frau ohne Schatten---ছায়াবিহীন নারী ), 'ডি শোয়াইগজামে ফ্রাউ' ( Die Schweigsame Frau--শান্ত নারী ) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেথযোগ্য। এ ছাড়াও 'ফ্রিডেনশ্টাগ' ( Fridenstag--শান্তির দিন ) এবং 'কাপ্রিচিও' ( Capriccio ) নামে আরো ছটি অপেরা আছে। 'স্তালোমী' ছাড়া 'ইলেক্ট্রা' সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় অপেরা। ষ্ট্রাউস্-এর অপেরাতে বেঠোফেন-এর থেকে মোৎসার্ট ও 'দি বেগার'ল্ অপেরা'র প্রভাব অধিক পরিমাণে অন্নভূত হয়। বিংশ শতাব্দীতে ষ্ট্রাউন্-এর নাম তাই খুবই ম্বনীয় হয়ে আছে। ষ্টাউন্-এর পরে বিংশ শতাব্দীতে ষ্টাউন্-এর নাম তাই খুবই ম্বনীয় হয়ে আছে। ষ্টাউন্-এর পরে বিংশ শতাব্দীতে য্রাউন্-এর নাম করা যায়, তিনি হলেন পাউল্ হিণ্ডেমিথ্ ( Paul Hindemith--জন্ম : ১৮৯৫ খুঃ )। এখনও জর্মানীতে অবাধগতিতে এঁর নৃতন নৃতন অপেরা স্থষ্টি হচ্ছে। হিণ্ডেমিথ্-এর রুতিত্ব হ'ল এই যে তিনি নিজেই তাঁর অপেরার কাহিনী রচনা করেন। সাতটি দুশ্রে বিণ্ডল্ব জ্বাধ্য ডের মালর্' ( Mathis Der Maler--অঙ্কনশিল্পী মাথিস ) আজ অপেরা-পিপাস্থদের কাছে খুবই পরিচিত। জর্মানীর রুষক-যুদ্ধের ( Peasants' War ) পরিপ্রেক্ষিতে এক শিল্পীজীবনের ঘন্থম্থর কাহিনী এই অপেরার মূল বিষয়। এক ইংরেজ সমালোচকের ভাষায়:

ტი

#### বিংশ শতাব্দীর অপেরা

"Intense seriousness of purpose does not by itself secure artistic results, but integrity shines through 'Mathis', and the opera is perhaps the strongest in composer's conviction in his theme and its expression." দা'লব্যের্ (d' Albert), প্ফিৎস্তের্ (Pfitzner), ব্যেক (Berg) প্রভৃতি অন্তান্ত আধুনিক জর্মান অপেরা-স্রষ্টাদের নামও উল্লেথযোগ্য।

এর পরে আমরা এসে উপস্থিত হ'লাম অপেরার জন্মস্থান সেই ইটালী দেশে, কাতালানি ( Catalani ) আর দোনিজেত্তি ( Donizetti )-র জন্মভূমিতে। প্রাক্-বিংশ শতান্ধী যুগের অপেরা স্রষ্ঠাদের জনপ্রিয়তার সঙ্গে ইটালীতে যে স্থরস্রষ্ঠা সমানভাবে পালা দিয়ে চলেছেন, যাঁর নাম বিভিন্ন মহলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হচ্ছে তিনি হ'লেন, ইতালো মন্তেমেজ্জি (Italo Montemezzi -- ১৮৭৫-১৯৫২)। এঁর যুগস্ঠিকারী অপেরা 'লা'মোর দেই তে বে' (L'amore Dei Tre Re-তিন রাজার প্রেম)। ইটালীর প্রথিতমশা নাট্যকার ত্যাম বেরেল্লি ( Sam Berrelli )-র প্রসিদ্ধ বিয়োগান্ত নাটকের ওপর ভিত্তি করেই মন্তেমেজ্জি তাঁর অপেরা স্বষ্টি করেন। সমালোচকের ভাষায়: "This opera is the most successful product of modern Italian genius"। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই অপেরা ইটালীর থেকেও পথিবীর অন্তান্ত দেশে অনেক বেশী জনপ্রিয়। আমেরিকাতে বিংশ শতাব্দীর খুব কম অপেরাই সন্তবতঃ এত আলোড়ন এনেছে। ইটালীর প্রতি তিন রাজার পন্ডীর প্রেম ও ইটালীজয়ী আর্চিব্যাল্ডার প্রতি তীব্র ঘ্নণা কি ক'রে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এক বিয়োগান্ত পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে তারই মর্মস্পর্শী কাহিনী রূপায়িত হয়েছে এই অপেরা'র মধ্যে। এই বিয়োগান্ত কাহিনীতে স্থরের মূর্ছনা স্বষ্টি ও বিভিন্ন বাত্তযন্ত্রের ব্যবহারের অপূর্ব কৌশল প্রয়োগের জন্তে মন্তেমেজ্জি আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রদ্ধার পাত্র। তাই এই অপেরা'র আলোচনা করতে গিয়ে একজন সমালোচক তাঁর আবেগ সংবরণ না করতে পেরে বলেছেন—"It is a succession of musical phrases that clothe the words.....it is a mediaeval tapestry, the colours of which have not faded, but still glow with their original depth and opulence." 41 পরে বর্তমান ইটালীর হু'জন অপেরা-স্রষ্টার নাম একসঙ্গে উল্লেখ করা যায়: এর্মামুও উওল্ফ্-ফেরারি ( Ermanuo Wolf-Ferrari—১৮৭৬-১৯৪৮ ) এবং ফেরুচ্চিও বুদোনি (Ferruccio Busoni-->৮৬৬-১৯২৪)। এর্মান্থও উওল্ফ্-ফেরারি-র বিখ্যাত অপেরা 'দি স্কুল ফর ফাদারস্' (I quattro Rusteghi)। নারীর কর্মস্থান গৃহে না বহির্জগতে, এই নিয়ে সংরক্ষণশীল ও আধুনিক মনোভাবসম্পন হুই দলের তীব্র দন্দই আলোচ্য অপেরার বিষয়বন্তু। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে স্র্যাডলার ওয়েলস্-এ মঞ্চস্থ হবার সময় 'The Times' এর সঙ্গীত সম্পর্কে নিয়লিখিত মন্তব্য করেন : "It is technically

modern yet picks up the Opera buffa tradition of the eighteenth century with the utmost grace and learning; it has a vein of lyrical melody and excels in ensemble." ফেরুচ্চিও বুদোনি-র স্বলিখিত ও স্বস্থন সংযোজিত অপেরা 'ডক্টর ফাউস্ট' (Doktor Faust) খুব প্রসিদ্ধ হয়। বুদোনি (Busoni) সারাজীবন ধরে গ্যেটে-র (Goethe) রচনাবলী অধ্যয়ন করেছিলেন। তাই শেষ জীবনে গ্যেটে (Goethe)-র ঝণ স্বীকারের প্রতীক হিসেবে তিনি এই অপেরা স্প্র্যি করেন। এই অপেরায় বুদোনি (Busoni) তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থ্রস্থ্র

জাউদোনাই (Zaudonai) ও পিজেত্তি (Pizzetti) নামক হুজন অপেরা-স্রষ্ঠা যথাক্রমে 'ফ্রান্সেস্কা দা রিমিনি' (Francesca Da Rimini) ও 'ডেবোরা এ জাএল' (Debora E Jœle) নামে তাঁদের বিখ্যাত অপেরা রচনা করেছিলেন।

ফরাসীদেশের আধুনিক অপেরা-স্রষ্টাদের মধ্যে গুস্তাভ শাপ তিয়্যে (Gustave Charpentier—জন্ম ১৮৬০) ও ক্লোদ তুবুসি (Claude Debussy—১৮৬২-১৯১৮)-র নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। শাপ তিয়্যে-র বিখ্যাত অপেরা 'লুই' (Louis) ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রথম বার্লিন শহরে অন্নষ্ঠিত হয়। এই অপেরার মধ্যে স্থরের মূর্ছনা কখনও কখনও মূল কাহিনীকে ঢেকে দিয়েছে বলে কোন কোন সমালোচক অভিযোগ করেছেন। শাপ তিয়্যে-র অপেরার কাহিনী তাঁর নিজের রচিত বলেই সন্তবতঃ সন্ধীতের স্থান আনেক জায়গায় প্রকট হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই অপেরা নিঃসন্দেহে প্রষ্ঠার মৌলিকতার পরিচয় দেয়।

ভব্দি-র দঙ্গীতের মধ্যে মোৎদার্ট-এর প্রভাবকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর বিথ্যাত অপেরা 'পেলেআ এ মেলিসঁদ্' (Pelléas et Mélisande)-এ মোৎদার্ট-এর রীতি ও আদ্বিকের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পল্ ডুকাস্ (Paul Dukas), হেনরি র্যাবো (Henry Rabaud), মরিদ্ র্যাভেল্ (Maurice Ravel), মিলো (Milhaud) প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে মরিদ র্যাভেল ও মিলো অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। এঁদের অপেরা যথাক্রমে 'ল্যোর এস্পান্তোল্' (L'heure Espagnole—স্প্যানীয় সময়) ও 'ল্য পোর্ভ মাতেলো' (Le Pauvre Matelot— দরিদ্র নাবিক)।

মুদর্গ স্থি-র দেশের অধুনা জনপ্রিয়তম অপেরা-স্রষ্ঠা হ'লেন ষ্ট্রাভিন্স্কি (Igor Stravinsky--জন্ম : ১৮৮২ ) ও প্রোকোফিভ (Sergei Prokofiev---১৮৯১-১৯৫৩)। ষ্ট্রাভিন্স্কি-র বিখ্যাত অপেরা 'ইডিপাস্ রেক্স' (Oedipus Rex) প্রথম রাশিয়াতে মঞ্চস্থ হয়নি। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনা সহরে অন্নষ্ঠিত হবার পর দিক্বিদিকে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই অপেরার আবেদন খুবই আবেগমুখর। মাত্র একঘন্টাকাল

#### বিংশ শতাব্দীর অপেরা

এই অপেরা মঞ্চস্থ হয় এবং এই অল্প সময়ের মধ্যেই এর আবেদন অন্তরের গভীরে গিয়ে প্রবেশ করে। সঙ্গীতের মাধ্যমেই এর প্রতিটি চরিত্রের রূপ প্রকাশিত হয়। অপেরার শেষে 'গ্রোরিয়া' (Gloria) নামে সমবেত সঙ্গীত (Chorus) এই অপেরার মূল আকর্ষণীয় বিষয়।

প্রোকোফিভ-এর 'দি লাভ ফর দি থি জরেঞ্জেন্' ( The Love for the Three Oranges ) অপেরার এক বিশেষ আঙ্গিকের পথপ্রদর্শক। মুদর্গন্ধি ও বোরোডিন্ (Borodin)-এর অপেরার হুটি বিভিন্ন রীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে এই অপেরাতে। তবে বোরোডিন-এর প্রভাবই প্রোকোফিভ-এর অপেরাতে প্রকট হয়ে উঠেছে বিশেষ ভাবে।

বেনজামিন ব্রিটেন ( Benjamin Britten, জন্ম : ১৯১৩ )---একটি নাম আজ ইংলণ্ড তথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গীতপিপাস্থদের আলোচনার মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। 'পিটার গ্রাইমন' (Peter Grimes), 'দি রেপ অফ লক্রেনিয়া' (The Rape of Lucretia), 'বিলি বাড' (Billy Bud) আর আমাদের সেই প্রিয় 'লেট আস মেকু এন অপেরা' (Let Us Make an Opera) প্রভৃতির স্রষ্ঠা সম্পর্কে নৃতন ক'রে বলতে যাওয়ার সাহস আমার নেই। 'এ প্যাদেজ ট ইণ্ডিয়া' (A Passage to India) ও 'এনপেক্টন অফ দি নভেল' (Aspects of the Novel)-এর রচয়িতা ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাহিত্যিক ই. এম. ফরস্টার (E. M. Forster) ব্রিটেনের অপেরা'র জন্তে অনেক কাহিনী রচনা করে দিয়েছেন। 'পিটার গ্রাইমস' নামে ব্রিটেনের বিশ্বজয়ী অপেরার স্বষ্টির পেছনে ক্র্যাব ( Crabbe )-এর ওপর লেখা ই. এম. ফরস্টার-এর রচনাই প্রধান অন্থপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। বিখ্যাত কবি ক্র্যাব যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ব্রিটেন পরবর্তী জীবনে সেথানেই নিজের আবাসস্থল গড়ে তুলেছিলেন। ক্র্যাব-এর কাহিনীর চরিত্রের সঙ্গে ব্রিটেন অবশ্য তাঁর অপেরায় পিটার গ্রাইমদের চরিত্রের পার্থক্য করেছেন, যার চরিত্রের দুঢ়তা ও আত্মাভিমানের চূড়ান্ত রূপ তাকে ক্রমশ ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে। ই. এম. ফরস্টার ছাড়া এরিক্ ক্রোজিয়ার ( Eric Crozier )-এর কাহিনীর সাহায্যেও ব্রিটেন তাঁর অনেক জনপ্রিয় অপেরা মঞ্চস্থ করতে সক্ষম হয়েছেন। তন্ উইলিয়ামস্ (Vaughan Williams)-এর 'দি পয়দনড কিন' (The Poisoned Kiss) ও 'দি পিলগ্রিমন্ প্রোগেস্' ( The Pilgrim's Progress ) আজ আর পরিচয়ের অপেক্ষা রাথে না।

ইংলণ্ডে অপেরার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাদে বিংশ শতাব্দীর দান অপরিমেয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অপেরার চর্চা দবে আরম্ভ হয় ইংলণ্ডে, এবং বিংশ শতাব্দীতে অপেরা এক অভিনব রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়। এর আগে বিভিন্ন দেশের অপেরা ওদেশে মঞ্চস্থ হয়েছে মাত্র। আধুনিক যুগের এই ছই মহারথীর প্রচেষ্টায় ইংলণ্ড আজ পৃথিবীর কোন দেশ থেকে অপেরা স্বষ্টতে পিছিয়ে পড়ে নেই।

বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব-অপেরা-পরিক্রমা করলে একথা আজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে

অপেরা-হৃষ্টির দিকে বহু প্রতিভাবান স্থরস্রষ্টা আত্মনিয়োগ করছেন। আমেরিকান অপেরা-স্রষ্টা টমসন্ (Thomson), হাঙ্গেরীর কোডালী (Kodaly), স্পেনের মাহত্ত্বি ফাইআ (Manuel De Falla) প্রভৃতির নামও এই সমস্ত অপেরা-হৃষ্টি-প্রয়াসী স্থরশিল্পীদের সাথে শ্রদ্ধার সঙ্গে অস্তর্ভু তৃহবে।

সঙ্গীত, কণ্ঠগঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পের সংমিশ্রণ ঘটে বলে অপেরা আদ্ধ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পস্থাষ্ট ব'লে পরিগণিত হচ্ছে। বিদেশের 'অপেরা হাউদে' অপেরা মঞ্চস্থ হওয়ার সময়ে অগণিত জনতার উন্মত্ত আচরণ অপেরার জনপ্রিয়তার মানদণ্ড নয়, এর অনির্বচনীয় আবেদনের স্বীকৃতি রয়েছে উদীয়মান অপেরা-স্রষ্টার সংধ্যা-রুদ্ধির মধ্যে।

অপেরা স্বাষ্টর দিকে ভারতবর্ষও আজ অনগ্রসর নয়। দিনের পর দিন আমাদের সঙ্গীত-পরিচালকেরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা (experiments) করছেন—ভারতীয় ও পাশ্চাত্য রীতির সংমিশ্রণে কি করে অপেরা স্বষ্টি করা যায়। জনৈক সংগীতস্রষ্ঠা আমাদের 'মনসামঙ্গল' উপাখ্যানের ওপর ভিত্তি করে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে অপেরা স্বষ্ট করেছেন—এমনি ভাবে বহু প্রয়াস চলেছে বিভিন্ন সঙ্গীত মহলে।

আধুনিক যুগে অপেরার ভবিস্তৎ কি এবং কি ভাবে বিভিন্ন সামাজিক অবহার মধ্যে দিয়ে, নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অপেরা আজ অভিনব ভাবে রূপায়িত হচ্ছে সে ইতিহাস আলোচনা অনেক দীর্ঘ সময় ও বেশী স্থান সাপেক্ষ। সে আলোচনার স্হচনা হিসেবে এই রচনার অবতারণা।

#### গ্ৰন্থপঞ্জী :—-

(3) 'KOBBES' Complete Opera Book-Edited and Revised by the Earl of Harewood. 1954.

(?) A Short history of Opera-Donald Grout. Oxford University Press.

(v) Modern Opera Stories-Gladys Davidson. 1956.

(8) The Heritage of Music Vol. III-Professor Westrup. Oxford University Press.
# ন্থবিশত

## অধ্যাপক জ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

কালের কুয়াশায় কাছের মাহুষও ঝাপসা হয়ে যায়। কিন্তু আমার স্মৃতির পাতায় আজও অয়ান হয়ে আছেন গুবিশত। আজও কানে বাজে তাঁর ভক্তিবিনম্র কণ্ঠস্বর :—

মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে।

মুগ্ধবোধং ব্যাকরণং পরোপক্নতয়ে ময়া।

কাটোয়া মহাভারতী বিষ্ঠালয়ে সেকেণ্ড ক্লানে ভর্তির দিনটি বেশ মনে পড়ে। বৈশাথের প্রথম। তুপুরে রীতিমতো গরম। টিফিনের পর সংস্কৃতের পিরিয়ড। পিছনের বেঞ্চিতে একলাটি বসে আছি। হেডপণ্ডিতমশাই ধীরে ধীরে ক্লাসে চুকলেন। নধর দেহ, তুলত্বলে ভূঁড়ি, গোঁফদাড়ি-কামানো মন্থণ মুথ, গায়ে সাদা চাদর, পায়ে বিষ্ঠাসাগরী চটি, হাতে তালপাতার পাথা। টেবিলের ওপর পাথাখানি রেথে রেজিন্টার থ্লে নাম ডাকতে লাগলেন—'রামেন্দ্র', 'ক্ষ্দিরাম', 'সত্যনারায়ণ', 'তুর্গাপ্রসাদ', 'শস্তুনাথ' ইত্যাদি, ইত্যাদি। শেষ নামটির আগে একটু থেমে আপন মনেই বললেন—এ যে দেখছি নতুন আমদানি।

নাম ডাকা মাত্র উঠে দাঁড়ালাম। পণ্ডিতমশাই মুখ তুলে চাইলেন। ছোট ছোট চোখ হটিতে যেমন তীক্ষ দৃষ্টি তেমনি কৌতুকের দীপ্তি। সংকেত করলেন কাছে যেতে। আমি এগিয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে পণ্ডিতমশাই টেবিলের ওপর পা তুলে আরাম ক'রে বসেছেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কোন্ ইস্থল থেকে আসা হয়েছে ?

----আজ্র ভবানীপুর সাউথ স্থবার্বান থেকে।

---ও, কলকাতার ছেলে ! সংস্কৃত অ্যাডিস্থানাল আছে ?

—আজে হাঁা।

—কিছু পুঁজি আছে তো ?

পুঁজি কি বুঝতে না পেরে নিরুত্তর রইলাম। র্লাগ নিস্তর। ছেলেরা কেউ গন্ধীরভাবে, কেউ স্মিতমুখে, কেউ বা সহাহুভূতিপূর্ণ নয়নে আমাকে লক্ষ্য করতে লাগল।

পণ্ডিতমশাই বললেন—বলি ব্যাকরণের জ্ঞান আছে তো? ওথানে কি বই পড়ানো হ'ত ?

—ইউনিভার্সিটি স্থানস্ক্রিট গ্রামার।

- ও তো কাঁঠালের আমসত্ব। ব্যাকরণ কৌমুদী পড় না ? সংস্কৃত স্তত্র মুখস্থ নেই ? - কৌমুদী বাড়িতে পড়ি। স্তত্র মনে রাথবার চেষ্টা করি।

---বেশ বেশ, তুমি পারবে। আমি পাণিনি মানিনে, ব্যাকরণ বলতে মুগ্ধবোধই

বুঝি। ভারি স্থন্দর সব স্থত্র। যেমন বাঁধুনি তেমনি মিষ্টতা। পাণিনি আর বোপদে (মুগ্ধবোধের বৃত্তির মঙ্গলাচরণ আবৃত্তি ক'রে শ্রদ্ধেয় ব্যাকরণকারের উদ্দেশে করজোঢ়ে প্রণাম জানালেন পণ্ডিতমশাই)—পাশাপাশি রাথলেই তফাত বুঝতে পারবে। আমার ছেলেরা অনেকটা শিখেছে, তুমিও শিথে নিও। আচ্ছা, তোমার গার্জেন কে?

—হেডমাস্টারমশাই আমার দাদা।

--আবে তুমি হেডমাস্টাবমশায়ের ভাই ! তা এতক্ষণ বলনি কেন ?

পণ্ডিতমশাই সন্নেহে আমার মাথায় হাত রাখলেন। তাঁর করস্পর্শে আমার জ ভেঙে গেল। তাঁর নাকী স্তরে কথাগুলো আমার কানে মধুবর্ষণ করতে লাগল।

বিকেলে অজয়ের তীরে বেড়াতে গেলাম। বেশ জায়গাটি। শহরের কোলাফ নেই। অন্তগামী স্থর্যে কিরণ পড়েছে শীর্ণকায় অজয়ের জলে। পরপারে বেগুনগোল গ্রাম যেন শান্তির ছবি। একপাশে ফার্ফ্ট ও সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেদের আড্ডা জমেছে। তাদের দলে গিয়ে বসলাম। আমার নস্তির কোটো থেকে এক টিপ নিয়ে ফাঁচ ফাঁচ ক'রে হেঁচে জলভরা চোথে শড় জিজ্ঞাসা করলে—কি ভাই, তাবিশত-কে কেমন দেখলে ?

—গুবিশত কে ?

—হেডপণ্ডিতমশাই।

—তাঁর নাম তো ভূমানন্দ ব্যাকরণতীর্থ।

— এ গুরুগন্ডীর নাম আমরা বর্জন করেছি। আমাদের মধ্যে তাবিশত নামটিই এখন চলছে।

---কি রকম ?

ফার্স্ট ক্লাসের সরোজাক্ষ বললে—এর একটু ইতিহাস আছে। পণ্ডিতমশাই রিজি পড়ার ওপর বিশেষ জোর দেন। সেদিন পড়াচ্ছিলেন 'বানরমকরকথা'। '…জ্ঞ কদাচিৎ তস্ত তরোরধস্তাৎ করালমুখো নাম মকরং সমুদ্র সলিলান্নিক্রম্য স্থকোমল বাল্কা সনাথে তীরোপান্তে তাবিশত।' 'তাবিশত' কথাটি এমন অপূর্ব ভল্গিতে ভূঁড়ি হুলিয়ে উচ্চারণ করলেন পণ্ডিতমশাই যে ক্লাসন্থদ্ধ ছেলে হেসে উঠল। পণ্ডিতমশাই কিন্তু একটুণ্ড অপ্রস্তুত হলেন না। বললেন—"হাসলে চলবে না। 'তাবিশত' কথাটি আণ্ডারলাইন কর আর ওপরে লিখে রাখ জি. এন. ( গ্র্যামাটিকাল নোট)।" যেমন স্থানমাহাত্ম্য আছে তেমনি ক্ষণমাহাত্ম্যও আছে। কথাটা ছেলেদের মনে লেগে গেল, সকলের মৃথে মৃথে ফিরতে লাগল, আর দেখতে দেখতে পণ্ডিতমশাই রূপান্তরিত হয়ে গেলেন তাবিশত-তে। পূলোর ছুটির আগে নিশ্চয়ই গল্পটা তোমাদের পড়ানো হবে। তথন বুঝবে ব্যাপারখানা কি।

—পণ্ডিতমশাই মাহুষটি কিন্তু ভালো।

—হ্যা, ভিতরটা সত্যিই ভালো তবে বড় বদরাগী।

সন্ধ্যা ঘনায়। বেগুনথোলার বনে শেয়াল ডাকে। জোনাকি জলে ইস্থুলের

#### ন্থবিশত

মাঠে। গানের স্থর ভেনে আদে এস ডি ও.-র বাংলা থেকে—'দিনের শেষে ঘুমের দেশে'।

র্গদে একটি ভালো ছেলে ছিল। তাকে হারাতে গের্লে সংস্কৃতে ভালো নম্বর দরকার। তাই পণ্ডিতমশায়ের নির্দেশমতো ছেলেদের কাছ থেকে মুগ্ধবোধ যোগাড় ক'রে কী থী গী ঘী টী ঠী ডী টী তী থী ইত্যাদি মুথস্থ করতে লাগলাম। র্লাদে যথনই কেউ ব্যাকরণ কৌমুদীর স্থত্র বলত তথনই পণ্ডিতমশাই মৃগ্ধবোধের অহ্বরপ স্থ্রটি ব্রিয়ে দিতেন। আমি সযত্নে সেগুলো লিথে নিতাম। এইভাবে কয়েক মাদের মধ্যে মৃগ্ধবোধের কিছু কিছু প্রয়োজনীয় স্তর কতকটা সড়গড় হয়ে গেল। আমার অধ্যবসায়ে মগ্ধবোধের কিছু কিছু প্রয়োজনীয় স্তর কতকটা সড়গড় হয়ে গেল। আমার অধ্যবসায়ে মগ্ধষ্ঠ হয়ে পণ্ডিতমশাই দাদার কাছে স্থ্যাতি করতে লাগলেন। উৎসাহ বেড়ে গেল। কথায় কথায় পণ্ডিতমশায়ের হেলে ছলে মাথা নেড়ে বলা শ্লোক গুনে গুন্ধে স্থ্যতে মৃলধনও জমতে থাকল।

বহু প্রতীক্ষিত দিন। 'বানরমকরকথা' পড়ানো হবে। উন্মুখ হয়ে আছি পণ্ডিত-মশায়ের মুখ থেকে 'অবিশত' কথাটি শুনবার জন্তা। কী নাটকীয় অঙ্গবিত্তাস! হাসির রোল উঠল ক্লাসে। হেডমাস্টারমশাই বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলেন—উকি মেরে মূচকে হেসে চলে গেলেন। হাসি চাপতে গিয়ে আমার মুখ একদম লাল। হেডমাস্টার-মশায়ের আকন্মিক আবির্ভাবে একটু লজ্জিত হয়েছিলেন পণ্ডিতমশাই। কিন্তু তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আত্মনেপদ কেন হ'ল ?

আমি কোন রকমে বললাম—নের্বিশঃ।

—এই তো চাই স্যাঁর।

যাকে তাকে স্থার বলা পণ্ডিতমশায়ের অভ্যাস। তবুও তাঁর অন্নাসিক অভিনন্দনে আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম। তাঁর হুবিশত-রূপ মুহূর্তে চিরন্তন আসন গ্রহণ করলে আমার অন্তরের মণিকোঠায়। অহু ছেলেদের দিকে তাকিয়ে হুবিশত বললেন—তোরা তো হেসেই খুন। এদিকে বাইরের ছেলে এদে যে পড়া বলছে, লঙ্জা করে না? যত সব বেহায়া। অজয়ের জলে হাড় ক'থানা দিলেও তোদের মাহুষ করতে পারব না। দেবভাষা শেখা সহজ নয়। তার জন্তু সংযম চাই।

প্রায় এক বছর পরে। গুবিশত থাকেন ইস্কুলের হস্টেলে। শনিবারে বাড়ি যান। বাড়ি বর্ধমান-কাটোয়া লাইনে তু-তিনটি স্টেশন পরেই। সোমবারে দশটার ট্রেনে ফেরেন। সাড়ে দশটা থেকে পরপর তু-ঘন্টা আমাদের কম্পালসারী ও অ্যাডিস্তানাল সংস্কৃতের পিরিয়ড। ম্যাক্লিয়ড কোম্পানির গাড়ি প্রায়ই লেট হ'ত। তার ওপর গুবিশত হেঁটে আসতেন স্টেশন থেকে। সেটা সাইকেল-রিক্শার যুগ নয়। শহরে একথানি ঘোড়ার গাড়ি। স্টেশনের ভাড়া আট আনা। শেয়ারের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই গুবিশত-র

কোন দিন দেরি হলেও হেডমাস্টারমশাই কিছু বলতেন না। সেদিন সোমবার। সাড়ে দশটা থেকে আমরা ক্লাসে ব'সে গল্প করছি। এগারটার সময় ঘর্মাক্ত দেহে হাঁপাতে হাঁপাতে হুবিশত এলেন। চেয়ারে ব'সে বিশ্রাম করতে করতে সেকেণ্ড পিরিয়ডের ঘন্টা বেজে গেল। হুবিশত 'বীরবরকথা' পড়াতে শুরু করলেন। উপাখ্যান বেশ জমে উঠেছে এমন সময় এক অঘটন ঘটল। কোন কারণে তুর্গাপ্রসাদের পড়ায় মন ছিল না। অনেকন্দ ধ'রে উশখুশ করছিল। হঠাং বলে উঠল—স্থার, সংস্কৃত অ্যাডিস্থানাল তো কিছু হচ্ছে না। ফার্স্ট পিরিয়ডটা প্রায়ই নষ্ট হয়। ভয় হচ্ছে অ্যাডিস্থানালে আমরা ভালো করতে পারব না।

রসভন্দ হওয়ায় তাবিশত-র বিরক্তি খুবই স্বাভাবিক। কঠিন কঠে বললেন—কেন পারবিনে ? জ্যাডিস্তানালের হাত-পা আছে না ন্যাজ আছে ? কম্পালসারীর ভিতর দিয়েই জ্যাডিস্তানালের কাজ হবে। এতকাল এইভাবে হয়ে এল. এখন তোকে আর নববিধান দিতে হবে না। এমন চমৎকার উপাথ্যানটা আরম্ভ করেছি। কোধায় তন্ময় হয়ে শুনবি, কৌতূহলী হয়ে পাঁচটা জিজ্ঞানা করবি, না যত উদ্ভট প্রসঙ্গ। ছেলে-মান্নযের জ্যাঠামি ভালো নয় হুর্গা।

আমাদের কয়েকজনের দিকে চোথ ফিরিয়ে হুর্গার দিকে অন্থ্লিনির্দেশ ক'রে আবার বললেন—দেথ তো হুর্গার কাণ্ডটা ! পড়ানোটা মাটি হয়ে গেল, মেজাজটা বিগড়ে গেল। ভারি ম্পর্ধা হয়েছে হুর্গার।

তেজী ছেলে হুর্গা। দাঁড়িয়ে বললে—আমি কোন অন্থায় কথা বলিনি। ট্রানশ্লেসান কারেকসান কিছুই হয় না ; শব্দরূপ ধাতুরূপ লেখানো একদম বন্ধ। এসব না হলে আম্রা অ্যাডিস্থানালে ফেল ক'রে যাব।

— বলিস কি ! তুই আমার চেয়ে বেশী পণ্ডিত ! চুপ ক'রে থাক। তর্ক করলে হাড় ভেঙে দেব। অকালপক কোথাকার।

—যা-তা বলবেন না স্থার।

গুবিশত একেবারে অগ্নিশর্মা। লাফিয়ে উঠে হুর্গার কান হুটো চেপে ধরলেন। হুর্গা শক্তিশালী—একটানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে। গদগদ করতে করতে গুবিশত বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। লাইব্রেরি থেকে নিয়ে এলেন ওয়েবস্টারের ডিক্শনারি আর তাই দিয়ে দমাদম পিটতে লাগলেন হুর্গাকে। ভয়ে আমরা দব চুপ—বুক টিপটিপ শুরু হয়েছে। হুর্গার পরিত্রাহী চিৎকারে দেকেণ্ড ক্লাদ থেকে হেডমাস্টারমশাই ছুটে এলেন। 'একি করছেন পণ্ডিতমশাই! ছেলেটা যে মরে যাবে।'—ব'লে হাত ধ'রে দরিয়ে নিয়ে গেলেন গুবিশতকে। বার্ধক্যে রক্তের জোর কমে গেলে মাহুযেের স্বভাব শান্ত হয়। সে ধারণা চুর্ণ হয়ে গেল এক নিমেষে। বুদ্ধের এমন প্রচণ্ড ক্রোধ আগে কখনও দেখিনি। গুবিশত হুর্বাদার শান্ধবিহীন সংস্করণ।

#### ন্থবিশত

গায়ের ব্যথা মরতে সপ্তাহথানেক সময় লাগল তুর্গার। শিক্ষকের অমান্থযিক আচরণ ভোলবার পাত্র নয় সে। ভয়ানক জেদী ছেলে। শাসাতে লাগল গুবিশত-কে দেখে নেবে। গুবিশত-র নিষ্ঠরতার বার্তা পৌছে গেল ঘরে ঘরে। অভিভাবকরা বিচলিত হলেন-অনেকে ভূমানন্দ ব্যাকরণতীর্থের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন হেডমাস্টারমশায়ের কাছে। হেডমাস্টারমশাই মাটির মাহুয-গুণগ্রাহী। পণ্ডিতমশাই বারো বছর টোলে পড়েছেন-ব্যাকরণে ঘুণ। ছেলেরা সংস্কৃতে ভালো ফল দেখায় ম্যাট্রিক-প্রতিবছর ছ-তিন জন লেটার পায়। এসব বিবেচনা ক'রে তাঁকে গোপনে ডেকে বললেন-ভূমানন্দ-বারু, খুনে পণ্ডিত ব'লে শহরে আপনার বদনাম রটেছে। একটু সংযত হয়ে চলুন। আপনি প্রাচীন, শিক্ষক হিসাবেও আপনার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা। আমি চাইনে আপনার কোন ক্ষতি হয়।

গরমের ছুটির আগে আর কোন ঘটনা হয়নি। ভবিশত তুর্গাকে ক্লানে কোন প্রশ্ন করতেন না। তুর্গাও পিছনের বেঞ্চিতে মাথা হেঁট ক'রে বদে থাকত নির্বিকার ভাবে। কিন্তু বন্ধের পর ইস্কুল থোলার প্রথম সপ্তাহেই আর এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতি। অকারণে হেসেছিল ব'লে ফোর্থ ক্লাসের ম্রারি মণ্ডলকে ক'যে ঘা কতক দিয়েই সন্তুষ্ট হলেন না ভবিশত, অর্ধচন্দ্র দিয়ে ক্লাস থেকে তাড়াতে তাড়াতে বললেন—আমার ক্লাসে ঢুকলে আর তোর রক্ষা নেই।

ত্তবিশত-র গলাবাজি শুনে হুগা ছুটে গেল ব্যাপারটা কি দেখবার জন্ত। প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে। একটা হুযোগ পেলে হয়। মুরারি গরীবের ছেলে। পরদিন তার বিধবা মা এসে তাবিশত-র পা জড়িয়ে ধরলে। তেলে বেগুনে জলে উঠে তাবিশত বললেন— এইটুকু ছেলের এত সাহস! লঘুগুরু জ্ঞান নেই! আমার সঙ্গে ইয়ারকি! অমন ছেলের মুথে আগুন। পা ছাড়, যত সব ছোটলোকের কাও।

সরোজাক্ষ বলেছিল গুবিশত-র মেজাজ চটা। শুধু তাই নয়, তাঁর মুখও আলগা।

টিফিনের সময় দেখেছিলাম হুর্গা বেলতলায় কতকগুলো ছেলের সঙ্গে গন্তীরভাবে পরামর্শ করছে। ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে গুনলাম সেক্রেটারির কাছে দরখান্ত যাবে তবিশতকে বরখান্ত করবার জন্ত। সন্ধ্যার আগে হুর্গার দল দরখান্ত নিয়ে হাজির। আমাকে সই করতে হবে। সমস্তায় পড়ি। একে স্থানীয় ছাত্র নই তার ওপর দাদা হেডমান্টার। গোলমালে মাথা গলানো উচিত নয়। কিন্তু করি কি! সমন্ত ক্লাসের ছেলেরা যখন সই দেবে তখন আমিই বা পাশ কাটাই কেমন ক'রে! নাছোড়বান্দা হুর্গার দল দন্তখত নিয়ে চলে গেল। ত্যায়-অন্তায় বোধের টানাটানিতে বেস্থরো হয়ে উঠল আমার মন।

সপ্তাহ যেতে না যেতে ত্তবিশত-র ভাবান্তর দেখে অবাক্। কপালে চিন্তার রেথা, মুখে কালিমা। না আছে হাসিখুশি ভাব, না আছে দেহচালনায় ভাবব্যঞ্জনা। আড়ষ্ট

হয়ে চেয়ারে বদে কমলাপতিকে ইঙ্গিত করলেন রিডিং পড়তে। ইদানীং নিয়ম হয়েছিল প্রথমে ছেলেরা একে একে রিডিং প'ড়ে যাবে সমস্ত গল্পটা, তারপর তিনি আরম্ভ করবেন ব্যাখ্যা-ব্যাকরণের পালা। কমলাপতির ক্রমিক সংখ্যা এক, আমার ছই, রাখালের তিন। কমলাপতি এক প্যারাগ্রাফ পড়ার পর আমাকে বাদ দিয়ে রাখালকে পড়তে ইশারা করলেন গুবিশত। নিয়মের এই ব্যতিক্রম অর্থপূর্ণ। হুর্গাকে একঘরে করেছিলেন আগেই, আজ থেকে আমাকেও করলেন। দরখাস্তে সই দেওয়ার জন্তুই কি এই শান্তি ? তাই বা কেন ? সে অপরাধ সকলেরই। শুধু আমার ওপর বিরূপ হওয়া তো উচিত নয়।

ব্যাপারটা শীন্ত্রই বোঝা গেল। ইস্কুলের সেক্রেটারি তুবিশত-কে ডেকে খুব অপমান করেছেন এবং ভয় দেখিয়েছেন এভাবে চললে বেশী দিন তাঁর চাকরি থাকবে না। তাছাড়া পঞ্চমবাহিনী কাজ করেছে। তুবিশত-র ছোটথাটো ছর্বলতা ছিল। শীতকালে কপি-কমলালেরু প্রভৃতি ভক্তি-অর্ঘ পেলে সংস্কৃতে পাস করিয়ে দিতেন। তাই কতকগুলো ছেলে ছিল তাঁর হাতধরা। এরা তাঁর কাছে লাগিয়েছে আমিই আন্দোলনের নেতা আর তাঁর মনে ধারণাটা বন্ধমূল হয়ে গিয়েছে। তুবিশত ব'লে বেড়াতে লাগলেন—কলকাতার ছেলেটার যে পেটে পেটে এমন শয়তানী বৃদ্ধি তা কল্পনাণ্ড করতে পারিনি। ভিজ্বেরোল আর কাকে বলে! হেডমান্টারমশাই নিরীহ ভন্তলোক। তাঁর মায়ের পেটের তাই হয়ে তুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছিদ! আরে তুই রিংলিডার হয়ে যে তাঁর ইাতদান এই। কথায় বলে বেনো জল ঢোকাতে নেই। বাইরে থেকে পান্ধি ছেলেটা এদে ইস্কুলের আবহাওয়া কল্মিত ক'রে তুলেছে। বুড়ো বয়সে আরও কত লাঞ্ছনা কপালে আছে কে জানে!

বিনা দোষে বয়কট পুরোদমেই চলে। ক্লাদে বোবার মতো বদে থাকি। সময়ে সময়ে চোথের জলে বইয়ের পাতা ভিজে যায়। তুবিশত দেখেও দেখেন না। অকারণ সন্দেহের বশে প্রাণময় পণ্ডিত পাষাণহৃদয় হয়ে উঠেছেন। প্রতিশোধের পদধ্বনি ক্রমে আরও স্পষ্ট হয়। হাফইয়ারলি পরীক্ষায় সংস্কৃত কম্পালসারী ও অ্যাডিস্তানালে শতকরা ৭০-এর ওপর নম্বর ওঠে না। বুঝতে পারি তুবিশত-র কারসাজি। উঠেপ'ড়ে লাগি যাতে টেস্ট পরীক্ষায় সংস্কৃতের উত্তর সর্বাঙ্গস্থন্দর হয়। কিন্তু টেস্ট পরীক্ষার ফলেও তেমন উন্নতি দেখা যায় না—নম্বর শতকরা ৭৫ ছাড়ায় না। ইস্কৃলের শিক্ষকরা বলাবলি করেন সংস্কৃতে নম্বর আরও তুলতে না পারলে আমার বৃত্তি পাবার আশা কম। অত্যন্ত বেদনা বোধ করি। উপায় কি! জ্গের মতো তুবিশত-র বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করার সাহস বা ইচ্ছা কোনটাই আমার নেই। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অভিলম্বিত ফললাভের আশায় দিন কাটে। চাকরি-জীবনে উপরওয়ালা বিরূপ হলে পদে পদে বিপদ। ছাত্র-জীবনে শিক্ষক-পরীক্ষক বিমুখ হলেও বিলক্ষণ বিড়ম্বনা।

90

. \*

টেন্ট পরীক্ষার পর তথিশত-র সঙ্গে শেষ যোগস্থত্র ছিন্ন হ'ল। যতদিন কাটোয়ায় ছিলাম তাঁকে এড়িয়ে চলতাম। হস্টেলের মাঠে ভুলেও বেড়াতে যেতাম না। মার্চ মাসে বর্ধমান কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়ে সরাসরি কলকাতায় চলে এলাম। জুন মাসে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হ'ল। L ও l পেয়েছি দেথে কী আনন্দ ! এক মাস পরে স্কলারশিপ পাওয়ার খবর। অতীতের হুঃথের কথা সব ভুলে গেলাম। অভিনন্দনপত্র আসতে লাগল। এক-দিন চমকে উঠলাম তাবিশত-র পত্র পেয়ে। সে পত্র যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি মূল্যবান। যতদ্র মনে পড়ে তাঁর ভাষাই ব্যবহার করছি:—

অশেষ কল্যাণনিলয়েষু,

---, তুমি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সংস্কৃত কম্পালসারী ও অ্যাডিস্থানালে শতকরা ৮৮ নম্বর পাইয়া রত্তি পাইয়াছ। ইহাতে আমি অপরিসীম আনন্দ লাভ করিয়াছি। শ্রীভগবানের নিকট তোমার উজ্জলতর ভবিয়ৎ কামনা করি। তোমাকে অভিনন্দন জানানোই এ পত্রের একমাত্র উদ্দেশ্ত নহে। ইহার অপর একটি গুরুতর কারণ আছে। আমি তোমার কাছে অপরাধী। অকারণ সন্দেহের বশবর্তী হইয়া তোমাকে পড়াগুনায় যথোচিত সাহায্য করি নাই। হাফ-ইয়ারলি ও টেন্ট পরীক্ষায় কম্পালসারী ও অ্যাডিস্থানাল-এ ১০ নম্বর করিয়া ২০ নম্বর হাতে রাথিয়াছিলাম। হয়তো ইহাতে ফল গুভই হইয়াছে, হয়তো এজন্ত তুমি সংস্কৃতে অধিক যত্ন লইয়াছিলে। সে যাহাই হউক, তোমার সাফল্যের ক্রতিত্ব কণামাত্রও আমি দাবি করিতে পারি না।

মধ্যে ছর্গা সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিল। জীবনের কোন আশা ছিল না। সংবাদ পাইয়া তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। করুণাময় তাহাকে সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়াছেন। স্বস্থ হইবার পর হস্টেলে আসিয়া সে আমার কাছে অকপটে সকল অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। তাহার কথায় প্রকাশ অন্তরালে থাকিয়া আমার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন অ্যাসিস্টেণ্ট হেডমান্টার রজনীবাবৃ। তৃমি ছাত্রদের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়াই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলে, অন্ত কিছু কর নাই।

মুনিঋষিৱাও ভুল করেন—আমি তো সামাগ্য শিক্ষক মাত্র। শিক্ষক পিতামাতার স্তায় মহাগুরু। সেই জ্ঞানে আমার অপরাধ মার্জনা করিও। হয়তো তোমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না। বয়স হইয়াছে। কখন পরপারের ডাক আসে কে জানে !

অধিক লেখা নিশ্রহাজন। তুমি উত্তরোত্তর পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ কর।

ইতি

নিত্যহিতাকাক্ষী ভূমানন্দ শৰ্মা

বাম্পাকুল চোথে বারবার পড়লাম পণ্ডিতমশায়ের পত্রথানি। শ্রদ্ধেয় স্থপণ্ডিত স্বীয় মহিমায় আবার স্তপ্রতিষ্ঠিত হলেন আমার অন্তরে। তিনি ভারমুক্ত হয়ে আমার মাধা নত ক'রে দিলেন অপরাধের বোঝায়। ভাবলাম একবার কাটোয়ায় গিয়ে পণ্ডিতমশায়ের পা ছুঁয়ে ক্ষমা চেয়ে মুক্তির ব্যবস্থা ক'রে আদি। কয়েক দিনের মধ্যেই রওনা হলাম। কাটোয়ায় নেমে প্র্যাটফর্মে প্রথমেই দেখা সত্যনারায়ণের ছোট ভাই শিবনারায়ণের সঙ্গে। সে মলিন মুথে বললে—আজ ইস্থল বন্ধ। ভবিশত মারা গিয়েছেন।

শ্র্রাবণের মেঘমেছর দিনটি মুহূর্তে ব্যথাবিধুর হয়ে গেল। কেশব ভারতীর দেশে দেই আমার শেষ যাওয়া।

সমালোচনা

সাহিত্যের গতি ও প্রেকৃতি—নারায়ণ চৌধুরী; প্রকাশক: শান্তি লাইব্রেরী কলিকাতা; পৃষ্ঠা ১২০; মূল্য—ত'২৫।

বর্তমান সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি নির্ণয়ের কান্ধটি অত্যস্ত হ্রহ। এর কারণ সমাজ জ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং ক্রান্তিকালের বিচিত্র অভিজ্ঞতা স্রষ্টার মনে বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বষ্টি করছে। সেজন্ত সমকালীন সাহিত্যের গতি যেমন বহুমুখী প্রকৃতিও তেমনি জটিল। এ ছাড়া কালের বিচারে যে সাহিত্য উত্তীর্ণ হবার অবকাশ পান্ননি সে সাহিত্য সম্পর্কে চূড়াস্ত কোন মত প্রকাশ করতে গেলে ভ্রান্তিরও সন্তাবনা থাকে।

স্থপরিচিত সমালোচক নারায়ণ চৌধুরী আলোচ্য গ্রন্থে আধুনিক বিচিত্রধর্মী সাহিত্যের গতিনির্ণয় ও প্রকৃতিবিচারের প্রয়াস পেয়েছেন। বর্তমান সাহিত্যের প্রকৃতি-বিচারে তাঁর বিশ্লেষণ সকল ক্ষেত্রে অভ্রান্ত কিনা তা প্রশ্নাধীন হলেও স্বচ্ছ ভাষা ও বলিষ্ঠ যুক্তির মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যকে উপস্থিত করেছেন পাঠকের সামনে। গ্রন্থটি আয়তনে ক্ষুত্র হলেও বর্তমান পল্লবগ্রাহিতার যুগে স্বতন্ত্র চিন্তার প্রকাশে মৃল্যসমূদ্ধ। তাঁর মতামতের সঙ্গে পাঠকমাত্রই একমত হবেন এমন আশা করা যায় না, তথাপি সে সমস্ত মতকে একেবারে মূল্যহীন বলে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না।

সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে আলোচনায় লেখক আপেক্ষিক গুরুত্ব অর্পণ করেছেন সাধুভাষার উপর। এ-মত নিশ্চয়ই তাঁর প্রত্যয়নির্ভর নয়, হলে তিনি নিজে 'অভ্যাসবশে'ও কথ্যরীতির আশ্রায় গ্রন্থ রচনা করতেন না। বর্তমান সাহিত্যরচনায় ভাষা ব্যবহারের শৈথিল্যের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ সময়োপযোগী। এ মন্তব্য প্রমাণনির্ভর হলে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হত। সাম্প্রতিক কবিতায় পালাবদলের স্থর স্পষ্টভাবে শুনতে পেলেও ভাব ও আন্ধিকের মধ্যে যে সামঞ্জস্তহীনতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তা আধুনিক কবিদের প্রণিধানযোগ্য। সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যের আপাতসমুদ্ধির অন্তরালে যে ছুর্বলতা আত্মপ্রকাশ করেছে তার কারণ লেখকের মতে প্রথমতঃ, বিভার সঙ্গে স্প্রের্থজে হত। বর্তমান বিশ্বের প্রগতিশীল কথাসাহিত্যের আপাতসমুদ্ধির অন্তরালে যে ছুর্বলতা আত্মপ্রকাশ করেছে তার কারণ লেখকের মতে প্রথমতঃ, বিভার সঙ্গে স্প্রের্থজে হত। বর্তমান বিশ্বের প্রগতিশীল কথাসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত মন্তব্যের যোজ্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। এ শ্রেণীর সাহিত্যের অন্তর্নিহিত দৈত্যের কারণ নির্ণয়ে লেখক আধুনিক কথাশিল্পীদের একটি বিশেষ প্রবণতাকে আক্রমণ করেছেন—যার নাম দিয়েছেন তিনি দেহবাদ। আধুনিক কথাসাহিত্যিক মাত্রেরই প্রতি এরপ এলোপাথাড়ি আক্রমণ কতটা যুক্তিসঙ্গত তা নিশ্চয়ই বিবেচ্য। অবশ্ত সমকালীন বহু কথাশিল্পীর রচনা পর্যবেক্ষণনির্ভর, সাংবাদিরতাধর্যী—লেখকের এ মন্তব্য তর্কাতীত। কিন্তু বর্তমান কথাশিল্পীরা রচিশীল

পাঠকের পছন্দ-অপছন্দকে অগ্রাহ্য করে সাহিত্যকে vulgarise করে চলেছেন—এরপ মতামত নির্বিাদে মেনে নেওয়া যায় না। আমাদের ত মনে হয় কথাশিল্লীর যেমন স্বাধীনতা আছে রুচিশীল পাঠকের পছন্দকে অগ্রাহ্য করবার, তেমনি রুচিশীল পাঠকেরও স্বাধীনতা আছে স্থুলতাধর্মী লেখকের লেখাকে ধিকৃত করবার। কিন্তু কার্যলেরে দেখা যায়, যে-সমস্ত পাঠককে লোকে সাহিত্যাভিজ্ঞ ও রুচিশীল বলে মনে করে, তাঁরাও অনেক সময় এ ধরনের ভারসাম্যহীন স্ঠেকর্মকে প্রশংসাবাণী দিয়ে উৎসাহিত করেন। দোষ দেব কাকে, স্থলতাধর্মী লেখককে, না রুচিশীল (!) পাঠককে ?

সাহিত্যকর্মে নিষ্ঠার অভাব ও জনপ্রিয়তার মোহ বর্তমান সাহিত্যের মানকে নিম্নগামী করছে—লেখকের এই মত স্নচিন্তিত। এ মন্তব্য শুধু বাঙালী কথাসাহিত্যিকদের সম্পর্কে সত্য নয়, বর্তমান বিশ্বের অন্তান্ত দেশের কথাশিল্পীদের বেলায়ও সমভাবে প্রযোজা। এ শ্রেণীর সাহিত্যকে মনোহারী পণ্যবস্তুতে পরিণত করবার জন্ত যেন একটা প্রবল প্রতিযোগিতা গুরু হয়েছে বিশ্বব্যাপী। কিন্তু জ্ঞানগর্ভ সাহিত্যকর্মে আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে নিষ্ঠার অভাব ঘটেছে এমন মন্তব্য বোধ হয় সমীচীন নয়। সাম্রতিক কালে এ পর্যায়ের সাহিত্য যে আকস্মিক উন্নতি লাভ করেছে বা করছে, তা যে-কোন দেশের সাহিত্যের পক্ষে পরম গৌরবের বস্তু বলে বিবেচিত হবার যোগ্য। সাহিত্যের এ দিকটার প্রতি দৃষ্টি আরুষ্ট হলে লেথকের মনে বর্তমান সাহিত্য সম্পর্কে এতটা হতাশার সৃষ্টি হত না নিশ্ডয়ই।

কোন কোন দেশে রাজনীতিক সমষ্টিবাদের আধিপত্য সাহিত্যশিল্পীর ব্যক্তিমাতয়ে বাধা দিতে উন্তত হয়েছে দেখে লেখক আমাদের শিল্পীদেরও সতর্ক হতে বলেছেন। আমাদের দেশের শিল্পীরা এখনও বোধ হয় এমন অবস্থার সম্মুখীন হননি। তর্ সাবধানের মার নেই। হজনধর্মিতার লক্ষণনির্ণয়ে লেখক কতগুলি জ্ঞানগর্ভ বইয়ের নাম করেছেন যাদের আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু মাহুষের মনকে উর্ধ্বায়িত করে। হজনধর্ম সম্পর্কে প্রচলিত মতবিরোধী হলেও কথাটি ভেবে দেখবার মত। জীবনচিন্তায় মহৎ আদর্শে অহধ্যান না থাকলে শিল্পহৃষ্টিও মহৎ হয়ে ওঠে না—লেখকের এ মতের ভিতর অভিনব কোন চিন্তার স্বাক্ষর বোধকেরা তদহুপাতে বদলাননি'—এ ধরনের মতায়ত বোধ হয় তথ্যনির্ভর নয়। আমাদের তে মনে হয় যুগবিবর্তনের তাৎপর্যকে কোন কোন হুষ্টিধর্মী লেখক ইদানীংকালে যেরপ শিল্পরপ দিতে পেরেছেন পূর্বযুগে তা ছিল অকল্পনীয়। আসনে হজনধর্মী সাহিত্যের উৎকর্ষ সম্পর্কে কতগুলি বদ্ধমূল সংস্কারের প্রভাবে লেখক যেন এ যুগের সমন্ত হুষ্টিপ্রয়াসকেই শন্দেহের চোথে দেখেছেন। বস্তুতপক্ষে কি পাশ্চাত্য দেশে কি এ দেশে প্রচণ্ড প্রতিভাবান অল্পংখ্যক লেথকের যুগ অন্তর্হিত হয়ে স্বল্পক্তিমান বহু লেথকের যুগ আরম্ভ হয়েছে। স্থাপত্য শিল্প যেমন পিরামিড বা তাজমহলের যুগ আল

#### সমালোচনা

বিগত, তেমনি সাহিত্যেও শেক্স্পীয়র বা রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার আবির্ভাব-সম্ভাবনা স্থদুবপরাহত। সমাজক্রান্তির অবশ্বস্থাবী ফলশ্রুতি জীবন সম্পর্কে শিল্পীমানসে নিত্যনতুন মূল্যবোধের হৃষ্টি। সে মূল্যবোধ আজ প্রতিফলিত হচ্ছে সমকালীন সাহিত্যে—কোথাও সার্থকভাবে কোথাও অসার্থক প্রয়াসে। সেদিকে দৃষ্টি রেথে আধুনিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ে অগ্রসর হলে লেথকের প্রচেষ্টা অধিকতর সফল হত। তথাপি একথা বলা চলে আলোচ্য গ্রস্থে লেথকের সবল চিন্তা পাঠকের মনকে সাহিত্যের সনাতন কল্যাণময় আদর্শের প্রতি উন্মুথ করে তুলবে।

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

লাবণ্যের এনাটনি--ডক্টর শিবতোষ মুখোপাধ্যায় ; আই. এ. পি. ; ৩<sup>.</sup>০০।

বিজ্ঞানের ডুরহ তত্ত্বকে সহজ সরস করে বলবার কাজে এদেশে-ওদেশে অনেকেই আত্মনিয়োগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রস্থন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বস্থ, জগদানন্দ রায় প্রমুথের নাম স্বতঃই মনে পড়ে; বিলেতে এইচ. জি. ওয়েলস্, জেমস্ জীন্স্ প্রমুথের নাম এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য।

সম্প্রতি বাংলায় এই ধরনের কয়েকটি বই বেরিয়েছে। আমাদের কলেজের প্রাণি-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শিবতোষ মুথোপাধ্যায়ের লেখা 'লাবণ্যের এনাটমি' হাতে পেয়ে মনে হল, আমরা এক্ষেত্রে আর পিছিয়ে নেই।

ডক্টর মুখোপাধ্যায় যে-বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন, তা ছরহ বিজ্ঞানতত্ব। শারীরতত্ব, অঙ্গসংস্থান, লাবণ্যের মৃল, যৌবনের শারীরিক বিশ্লেষণ, সৌন্দর্যরহস্তের স্বরূপ-সন্ধান প্রভৃতি নামে এই তত্ত্বটিকে ভূষিত করা যায়। প্রাণিজগতের বিপুল বিচিত্র রহস্তের নির্মোহ বিজ্ঞান-সত্যকে এখানে সহজ ও সরস করে পরিবেশন করা হয়েছে। বৈষ্ণব কবি বলেছেন, 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়।' প্রাণিবিত্তাবিশারদের কাছে তা আসলে মেদ-চর্বির খেলা মাত্র, করোটি ও অস্থির কৌশলী মজ্জা মাত্র।

লাবণ্যের এনাটমি? কথাটা শুনে চমকিত হতে হয়। লেখক বলেছেন, 'এই এনাটমি বার করতে গেলে দরকার হবে বুদ্ধির ছুরি, বিবেচনার ফরসেপস ও উপলব্ধির ক্ল্যাম্প।' সেই সঙ্গে লেখকের আছে একটি সহৃদয় পরিহাসরসিক মন। এই মনের আলোয় শারীরবিত্তার ত্বরহ তম্ব রসকথায় পরিণত হয়েছে। এথানেই লেখকের বাহাছরি। লাবণ্যটা আসলে কি ? কতটুকু প্রোটিন, কতটুকু-ফ্যাট, কতটুকু লাইপয়েড ? এ-সব জেনে গেলে ভয় হয় আর তেমন করে চোথে নেশা ধরবে না। কিন্তু লেখকের কৃতিত্ব এখানে যে, অপ্রিয় সত্যি কথা ( বিজ্ঞান-সত্য ) এমনভাবে রসিয়ে রসিয়ে বলেছেন যে, আমরা স্ব-রূপ-দর্শনে বিচলিত হবার অবকাশ পাই না।

'স্বপ্ন না মায়া না মতিভ্ৰম', 'লাবণ্যের এনাটমি', 'বর বড় না কনে বড়', 'অলকে

ዓ৫

কুস্থম না দিণ্ড'—এই চারটি নিটোল রচনার মধ্য দিয়ে লেখক আমাদের স্ব-রপ দর্শন করিয়েছেন। পরিহাসে, অন্তরঙ্গ স্থরে, সথাসস্মিত ভঙ্গিতে তিনি আসর জমিয়েছেন। আর সোনায় সোহাগা হ'ল—এই রসপূর্ণ লেথার সঙ্গে শিল্পী কালীকিঙ্কর ঘোষ দন্তিদায়ের রেথাচিত্র।

এক কথায় বইটি থাসা হয়েছে। সৌন্দর্যাভিমানী ও রূপগরবিনী মাত্রেরই এটি পড়া উচিত।

ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

#### পরীক্ষার ফলাফল

```
১৯৫৯ সালের আই. এ. ও আই. এস্-সি, পরীক্ষায় কলেজ থেকে যাঁরা বিশ্ববিভালয়ের প্রথম দশজনের
মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁদের নাম নীচে দেওয়া হল :
                     আই. এ.--উজ্জলকান্তি রায় ( ৪র্থ )
                                দেবত্রত ভান্থড়ী ( ৭ম )
                                ন্বেশকুমার অরোরা ( ৯ম )
                 আই. এস্-সি.—দেবকুমার দাশগুপ্ত (১ম)
                                দেবপ্রসাদ মজুমদার ( ২য় )
                                স্থকুমার জানা ( ধ্ব )
                                প্রভুদয়াল আগরওয়ালা ( ৬৯)
                                বিশ্বজিৎ চৌধুরী ( গম )
                                কমলেশ সরকার (৮ম)
      ১৯৫৯ সালের বি. এ. ও বি. এস-দি. পরীক্ষায় কলেজ থেকে যাঁরা প্রথমশ্রেণীর সম্মান পেয়েছেন,
তাঁদের নাম নীচে দেওয়া হল :
                  বি. এ.—ইতিহান : দিলীপকুমার বস্থ ( ১ম )।
                         অর্থনীতি: প্রতীপকুমার চট্টোপাধ্যায় (১ম); আনন্দরপ রায় (২য়); দীপক
                                   রুদ্র ( ৩য় ); দীপক মুখোপাধ্যায় ( ৪র্থ )।
                         গণিত : প্রণবকুমার লাহিড়ী ( ১ম ) ; ইলা মুখোপাধ্যায় (২য়) ; মঞ্জ সেনগুপ্ত (৪র্থ)।
                         রাশিবিজ্ঞান: অনীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ( ১ম ); অরিজিৎ চৌধুরী ( ২য় )।
                         ইংরাজী: গায়ত্রী চক্রবর্তী (১ম); স্থরজিৎ সেন (২য়)।
                 বি. এস্-দি.—পদার্থবিভা: প্রশান্তকুমার রুদ্র ( ১ম ); অতীশচন্দ্র সিংহ ( ২য় ); রধীন্দ্রনাথ
                                  দে ( ৩য় ); বালকৃষ্ণ গারোডিয়া ( ৫ম ); মথুরেশ পোদ্দার ( ৬ষ্ঠ );
                                  প্রণবকুমার ভট্টাচার্য ( ৭ম )।
                        গণিত: পিনাকীশংকর রায় (১ম); অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় (২য়); জয়ন্তকুমার
                                  বাগ্চি ( ৩য়); পুণ্যত্তত দত্ত গুপ্ত ( ৪র্থ )।
                        উন্তিদ্বিতা: শিবদাস ঘোষ ( ১ম )।
                        রাশিবিজ্ঞান : দেবব্রত কারফর্মা ( ১ম )।
                        শারীরবৃত্ত: তপনকুমার ভট্টাচার্য (১ম); জগন্ময় মিত্র (২য়); মাধুরী থাঁ (৩য়);
                                  অমল ভট্টাচার্য ( ৪র্থ ), সমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ( ৫ম )।
                        ভূতত্ত্ব: শুভজ্যোতি দাস ( ১ম )।
     ১৯৫৯ সালের এম্. এ. ও এম. এস্-সি. পরীক্ষায় কলেজ থেকে যাঁরা প্রথম শ্রেণীতে প্রথম বা ছিতীয় স্থান
অধিকার করেছেন, তাঁদের নাম নীচে দেওয়া হল। এবিষয়ে অসম্পূর্ণতাজনিত ভ্রুটি থাকা অসম্ভব নয়।
                 এম্. এ---অর্থনীতি: পরাগেশর ভট্টাচার্য ( ১ম ); অশোকসঞ্জয় গুহ ( ২য় )।
```

ইংরাজী : তীর্থকের বহু ( ২য় )। রাশিবিজ্ঞান : বিভাসরঞ্জন দে ( ১ম )।

এম্. এস্-দি.---শারীরবৃত্ত: অজয়কুমার রায় ( ১ম ); দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ২য়)। ভূতত্ত্ব: ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় ( ১ম ); স্থগত সেনগুপ্ত ( ২য় )।

গত জামুআরি মাসে বিশ্ববিত্তালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কলেজ থেকে যাঁরা বিভিন্ন পদক পেয়েছেন, উাদের নাম নীচে দেওয়া হল:

এম. এ.--ইংরাজী : শান্তা বহু ( ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় স্বর্ণপদক )।

বাংলা : সাবিত্রী ভট্টাচার্য ( যন্ত্রনাথ মহালক্ষ্মী রোপ্যপদক )।

দর্শন : জয়ন্তনাথ ঘোষ ( ডক্টর প্রসন্নকুমার রায় স্বর্ণ স্মৃতিপদক )।

অর্থনীতি : কল্যাণকুমার মিত্র ( বংকুবিহারী বন্দোপাধ্যায় স্বর্ণপদক )।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাস : প্রতাপাদিত্য পাল (ধীরেন্দ্রনাধ মুখোপাধ্যায় অর্ণপদক )।

ইতিহাস : অমিতা মজুমদার ( বিখবিভালয় রোপ্যপদক)। রাশিবিজ্ঞান : জয়ন্তকুমার ঘোষ ( বিখবিভালয় ব্বর্ণপদক)।

এমৃ. এস্-সি.---উদ্ভিদ্বিদ্যা: স্তামাপদ সাহা ( বিশ্ববিদ্যালয় রোপ্যপদক )।

ভূতত্ব: সমীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বিশ্ববিভালয় স্বর্ণপদক); নারায়ণদাস মিত্র (বিশ্ববিভালয় রোপ্যপদক)।

শারীরবৃত্ত : স্থনীলকুমার দন্ত ( বিশ্ববিষ্ঠালয় রোপ্যপদক )।

বি. এ.--ইতিহান : দিলীপকুমার বহু ( ঠাকুরদান কর স্বর্ণপদক )।

অর্থনীতি : প্রতীপকুমার চট্টোপাধ্যায় ( এন্. এন্. যোষ স্বর্ণপদক) ; আনন্দরণ রায় ( কুইন্লান্ রৌপ্য স্মৃতিপদক)।

দর্শন : হৃদয়রঞ্জন মোদক (প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্বর্ণপদক); অমিতাভ খান্তগীয় (প্যারীটাঁদ মিত্র রোপ্যপদক)।

গণিত: প্রণবক্ষার লাহিড়ী (বঞ্চিমবিহারী সেন কর্ণপদক, দর্বেখর ও পৃণ্ঠন্দ্র অ্বপিদক, প্রভাবতী দেবী রোপ্যপদক); ইলা মুঝোপাধ্যায় (পদ্মাবর্তী অ্বপিদক, শান্তমণি রোপ্যপদক)।

রাশিবিজ্ঞান : অনীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ( দয়ালচাঁদ সেন রোপাপদক )।

বাংলা: পম্পা ঘোষ ( হুজাতা দেবী ফর্ণনেমি রোপ্যপদক, ক্ষীরোদ্বাহুন্দরী রেপ্যি-পদক, সারদাহন্দরী গুপ্তা রোপ্যপদক)।

সংস্কৃত: মিলন সেন ( বিভাসাগর রোপ্যপদক)।

ইংরাজী : শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ( অবিনাশচন্দ্র স্বর্ণপদক, দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রেপ্যিপদক) ; গায়ত্রী চক্রবর্তী ( মানেকজী রুস্তমজী স্বর্ণপদক, ডব্লিউ সি. ঘোষ রোপ্যপদক, প্রিয়নাথ ঘোষ ও গগনতারা দাসী রোপ্যপদক)।

বি. এশ্-সি.—ভূতত্ব : শুভজ্যোতি দাস ( হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত রোপ্যপদক )। উদ্ভিদ্বিতা : শিবদাস ঘোষ ( জি. পি. মজুমদার রেপ্যিপদক )।

পদার্থবিভা: প্রশান্তকুমার রুদ্র ( গঙ্গাপ্রসাদ ফর্ণপদক, ত্রিপুণ্ডেখর মিত্র ফর্ণপদক); অতীশচন্দ্র সিংহ ( মোহিনীমোহন রায় ফর্ণনেমি রোপ্য যুতিপদক)। গণিত: পিনাকীশংকর রায় ( হেরশেল ফর্ণপদক, সরোজ মুখোপাধ্যায় ফর্ণ স্থৃতি-পদক, মন্মথনাধ ভট্টাচর্য ফর্ণপদক, পার্থকুমার মিত্র ফ্র্ণনেমি রোপ্যপদক, দেবেন্দ্র গঞ্জাপাধ্যায় রোপাপদক)।

রাশিবিজ্ঞান : দেবত্রত কারফর্মা ( শুভেন্দুশেখর বহু ষ্ণপদক )। শাঁরীরবৃত্ত : মাধুরী থাঁ ( বাসন্তী দাস ষর্ণনেমি রোপ্যপদক )।

গত ২০শে জাকুআরি তারিথে "প্রতিষ্ঠাতৃ-দিবস" সভায় যাঁরা পদক এবং প্রাইজ পেয়েছেন, তাঁদের নাম নীচে দেওয়া হল :

আই. এ. ও আই. এস্-সি. -- দেবকুমার দাশগুপ্ত (বিজ্ঞান); শ্রীউজ্জলকান্তি রায় (কলা)

(১৯৫৯) — শিন্ধিয়া হুর্ণপদক ও গোয়ালিয়র প্রাইজ (সামগ্রিক কৃতিত্বের জন্ত)। কৃষ্ণা সেমগুপ্ত—চারুচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি প্রাইজ (সাম্মানিক ইংরাজী ওয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রাকৃত্বাতক পরীক্ষার ইংরাজীতে সর্বাধিক কৃতিত্বের জন্তু)।

> দেবীপ্রসাদ সরকার—অরুণ সরকার স্মৃতিপদক (প্রাক্সাতক পরীক্ষায় বাংলায় সর্বাধিক কুতিত্বের জন্স)।

> চিত্তরত পালিত—হরিশচন্দ্র কবিরত্ব প্রাইজ (প্রাক্সাতক পরীক্ষায় সংস্কৃতে সর্বাধিক কুতিত্বের জন্স)।

> কমলেশ সরকার—চন্দ্রনাথ মৈত্র পদক (আই. এস্-সি পরীক্ষায় ভূতত্ত্বে সর্বাধিক কৃতিত্বের জন্ম)।

> প্রভুদয়াল আগরওয়ালা—কলেজ প্রাইজ ( <য় বর্ষের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রাকমাতক পরীক্ষায় ভুজ্ঞানে সর্বাধিক কুতিত্বের জন্ম )।

> সৌম্যেন্দ্রনাথ দত্ত---রায় বাহাচুর দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রাইজ (৩য় বর্ষের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আই. এ. পরীক্ষায় ইতিহাসে সর্বাধিক কৃতিত্বের জন্ম)।

বি. এ. ও বি. এস্ সি.—অরুণা ভট্টাচার্য—কানিংহাম স্মৃতি প্রাইজ ( সাম্মানিক রসায়নে ( ১৯৫৯ ) সর্বাধিক কুতিত্বের জন্স )।

> অমিয়কান্তি ধর—কলেজ প্রাইজ ( ৫ম বর্ধের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সাম্মানিক রসায়নে সর্বাধিক কুতিত্বের জন্ত )।

শিবদাস ঘোষ—জে. সি. নাগ স্মৃতিপদক (সাম্মানিক উদ্ভিদ বিভায় সর্বাধিক কৃতিত্বের জন্ত )।

প্রতীপকুমার চট্টোপাধ্যার—জে. সি. সিংহ অর্থনীতি প্রাইজ ( সাম্মানিক অর্থনীতিতে সর্বাধিক কুতিডের জন্ত )।

এমৃ. এ. ও এমৃ. এস্-সি — অমিতা মজুমদার – চন্দ্রনারায়ণ ধর্ণপদক ( ইতিহাসে সর্বাধিক ( ১৯৫৮ ) কৃতিত্বের জন্থ )।

> সত্যপ্রিয় মোলিক— কানিংহাম শ্বৃতি প্রাইজ ( রসায়নে সর্বাধিক কৃতিত্বের জন্ত )।

কলেজের বার্ধিক পরীক্ষা—হুজিত চট্টোপাধ্যায় (বিজ্ঞান); মলয় ঘোষ (কলা)– (১৯৫৯) আগুতোষ মুখোপাধ্যায় আইজ (১ম বর্ধে সামগ্রিক কৃতিত্বের জন্ত)। প্রণবকুমার রায় চৌধুরী—কৃঞ্জবিহারী বসাক পদক (৩য় বর্ষে রসায়ন প্র্যাক্টিকালে সর্বাধিক কৃতিত্বের জন্তা)। ইন্দ্রনাথ গুহু—নিস্তারিণী দাসী আইজ (২য় বর্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ্যা প্র্যাক্টিকাল খাতার জন্তা।

### বিত্তর্ক-পরিষদ

গত কয়েক বছরের মধ্যে এবার বিতর্ক-পরিষদের অন্থষ্ঠানগুলি কিছুটা বৈশিষ্ট্য দাবী করতে পারে—সংখ্যা-গরিষ্ঠতায়, তথা বৈচিত্র্যসাধনে।

বিতর্ক-পরিষদের প্রথম অন্ধুষ্ঠান প্রতিষ্ঠাতৃসপ্তাহ উপলক্ষ্যে ঐতিহুগত প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে প্রদর্শনী বিতর্ক : আলোচ্য বিষয় ছিল সনাতন জীবনযাত্রার অন্থসংস্থাপনে নৃতন চিন্তাধারার ব্যর্থতা। প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য, মাননীয় বিচারক শ্রীঅজিতনাথ রায়, শ্রীহৃষ্যংশু দাশগুপ্ত ও শ্রীক্ষন দত্ত বিতর্কে যোগদান করে হৃতজ্ঞ করেছেন। পরবর্তী অন্ধুষ্ঠানে ছাত্রদের সঙ্গে এক আকর্ষণীয় বিতর্কে ছাত্র-দত্ত বিতর্কে যোগদান করে হৃতজ্ঞ করেছেন। পরবর্তী অন্ধুষ্ঠানে ছাত্রদের সঙ্গে এক আকর্ষণীয় বিতর্কে ছাত্র-ব্যক্তিত্বের বিকাশে শিক্ষকের হস্তক্ষেপ যে প্রতিবন্ধক মাত্র, তাই ছিল অধ্যাপকবৃন্দের প্রতিপাছ প্রস্তাণ 'বর্তমান শতক ও মানবিক মূল্য'-এর উপর এক উচ্চপ্রেণীর বিতর্কে যোগদান করেন শ্রীপুরুষোন্ডম লাল, শ্রীএন বিখনাথন, শ্রীহৃষ্যংশু দাশগুস্ত, শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, শ্রীদেবকুমার দাস, ও শ্রীঅহীন চৌধুরী। শ্রীবিধ্যয়ে বহু, শ্রীকমল দন্ত প্রভৃতি প্রবন্ধার যোগদানে সমুদ্ধ পরবর্তী বিতর্কের আলোচ্য বিষয় ছিল 'বাঙ্গলাদেশের উন্নাদিক পান্ধিত্যাভিমান', বিতর্ক যে সময়ের রূথা অপব্যয় সে কথা তর্ক করে প্রমাণ করতে এসেছিলেন যান্বপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রহন্দ। অস্তাস্ত বছরের মতো এবারও আমাদের কলেন্জের সঞ্চে বৃটিশ কাউলিলের বহু প্রত্যোন্দি বিতর্কটি সাঞ্চল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর ছিল কলেন্ডের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একাধিক যরোয়া বিতর্কের অন্নন্টান : তাতে নতুন বন্ডাদের উৎনাহ ও উৎকর্ষ আর শ্রোতাদের উপভোগে হুইই হয়।

তবে বিতর্ক-পরিষদের পক্ষ থেকে আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রধান আকর্ষণ ছিল জাতীয় লোকসভার অনুকরণে অনুষ্ঠিত মক্ পার্লামেন্ট। আনুষ্ঠানিক যাথার্থ্যের দিক থেকে সামরিক বেশ পরিহিত মার্শাল থেকে সময়নির্দেশক আলোটি পর্যন্ত বাদ পড়েনি, আর সেই সঙ্গে ছিল লোকসভার অধিবেশনের প্রকৃত আবহাওয়া: তীক্ষ ব্যঙ্গের সঙ্গে রসাল বাক্চাতুর্য, শানিত যুক্তির সঙ্গে উত্তেজিত আবেগ সেদিনের বিতর্ককে এক উচ্চমান দান করেছিল। কেরল প্রদেশের কেন্দ্রীয় হল্ডক্ষেপের আলোচনাই ছিল সভার মুখ্য বিষয়। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গ্রীএন্ বিখনাথন; মন্ত্রীসভার অন্তান্থ সদন্ত হিসাবে ছিলেন গ্রীহণ্যণে দ্রাণান্তর্বা ( ব্যর্য্য), ডাঃ মোহিত লাহিড়ী ( প্রতিরক্ষা ও স্বান্থ্য), গ্রীসনৎ ভট্টাচার্য ( শিক্ষা), গ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ( অর্থ বাণিজ্য), গ্রীহিরণ্যয় কার্লেকর ( খান্থ) ও গ্রীত্তানল মুখোপাধ্যায় ( আইন )। আমাদের গর্বের বিষয় যে বিরোধীদলের হুই নেতা হিসাবে আমরা পেয়েছিলাম গ্রীসাধন গুপ্ত ও গ্রীসিদ্ধার্থ রায়কে,—প্রথমজন ছিলেন কমিউনিন্ট পার্টির নেতা, এবং দ্বিতীয়জন খতন্ত্র সদন্ত। বিরোধীদলগুলের মধ্যে কমিউনিন্ট পার্টির প্রতিনিধিহ করেন গ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ও গ্রীদেবকুমার দাস, প্রজা সোন্তালিন্ট পার্টির গ্র প্রতন্দ্র মধ্যে বিয়েন্বি ক্রেনা পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলীর প্রান্তনকুমার দাস, প্রজা সোন্্রালিন্ট পার্টির ও স্বতন্ত্র পার্টির প্রতিনিধিহ করেন গ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ও গ্রীদেবকুমার দাস, প্রজা সোন্্রালিন্ট পার্টির ও স্বতন্ত্র পার্টির প্রতিনিধিহ্ব করেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলীর প্রান্তন স্পীকার গ্রীশেলকুমার মুখেপোধ্যায় সভার অধ্যক্ষ হিসাবে উপস্থিত থেকে বাধিত করেছিলেন। ব্যাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রস্তাব উপস্থাপেরে মধ্য দিয়ে সভার কাজ হুর্ফ হয়, ও বিতর্ক্ষটিলার

পর আদে প্রশ্বঘটিকাঃ বিরোধী সদস্তদের তীব্র প্রশ্বাণ ও মন্ত্রীদের চতুর উত্তরে পরম উপভোগ্যতায় সভা শেষহয়।

অস্তান্ত বছরের মতো এবারও বিভিন্ন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা করেছে : তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য শ্রীআশিস গুপ্ত ও শ্রীমতী কেয়া মুখোপাধ্যায়ের নাম।

কুশলী শাংগঠনিক বন্ধুদের সাহায্য ব্যতীত যে উপরিউক্ত কর্মতালিকা সম্পাদকের মানস-আকাশকুহুমই থেকে যেত তা' বলা বাহুল্য। তাদের প্রত্যেকের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অসীম, এবং আগ্রহসত্বেও তাদের উল্লেখ এখানে অসম্ভব। তবু তাদের মধ্যে আমার পূর্বহুরী গ্রীহিরগ্নয় কার্লেকর, এবং বিশিষ্ট বন্ধু গ্রীমতী নীপা ভট্টাচার্য ও গ্রীরজত বড়ুয়ার নাম উল্লেখ করে হুর্বিনয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত যোধ করছি।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ ভবতোষ দন্ত প্রথম হুটি বিতর্কে সভাপতিত্ব করে বিতর্ক-পরিষদকে অসামান্ত গোঁরব দান করেছেন ; সর্বোপরি বিভাগীয় অধ্যক্ষ ডাঃ শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের অমূল্য উপদেশ ছিল আমার কর্মপথের প্রধান পাথেয় : তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই।

পরিশেষে ছটি অস্থবিধা বিশেষ বোধ করেছি বলে কর্তৃপক্ষের কাছে নিবেদন করি : সপ্তাহে একদিন ( বাঞ্ছনীয়ত শনিবার ) উত্তরমধ্যাহে বিতর্কের জন্ত নির্দিষ্ট সময় রাথা আবস্তক এবং একটি যোগ্য সভাকক্ষের প্রয়োজন। নমস্বার্যান্তে,

সঞ্জিৎ বস্থ

সম্পাদক--বিতর্ক-পরিষদ

#### ছাত্রীসংবাদ

কলেজ ইউনিয়নে মেয়েদের প্রতিনিধি হিসাবে গার্ল্ কমন রূমের দায়িত্বও নিতে হয়েছিল। প্রথমেই ধন্তবাদ জ্ঞানাব মাননীয় অধ্যক্ষ উক্টর সনৎকুমার বহু মহাশয়কে—তাঁর সাহায্য ও অনুপ্রেরণা আমার কাজকে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছে। এ বছর কমনরুমে কিছু কিছু নতুন থেলার সরঞ্জাম এসেছে —মেয়েদের উৎসাহে স্থানের হলতা সড়েও টেবিল টেনিস থেলার ব্যবহা হয়েছে। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকাদি দ্বারা আমাদের সাহায্য করার ব্যাপারে কিন্তু ছাত্র কমনরুমের সম্পাদক তাঁর কথা রাথতে পারেন নি। যদিও দৈনিক সংবাদপত্রটি নিয়মিত কমনরুমে এসে পৌছেছে—ছ তিম সপ্তাহের প্রোন, হেঁড়া "দেশ" বা "Sport and Pastime" ছাড়া আর কোনো পত্র-পত্রিকার বাহুল্য কখনও দেখি নি।

"পথিকৃৎ" প্রাচীরপত্রিকাটির সম্পাদিকা হিসেবে এখন পর্যন্ত হুটি সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরেছি ; আরও হু একটি সংখ্যা প্রকাশের ইচ্ছে আছে। এজন্ত নবীন লেখক লেখিকাদের সাহায্য একান্ত আবশ্তক।

এ বছরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই যে এবারের বার্ষিক নাট্যাযুষ্ঠানে মেয়েরা এই প্রথম একটি নাটিকা মঞ্চত্ব করেছে। তাঁদের "নটীর পূজা" নাটিকা অনেক বিরূপ সমালোচনা সম্বেও মোটামুটি প্রশংসা অর্ধনে সমর্থ হয়েছে। তবে থুবই হুংখের সঙ্গে এটা লক্ষ্য করেছি যে মেয়েদের এই প্রথম প্রচেষ্টাকে অমুপ্রেরণা দিতে কলেজের থুব অল্লসংখ্যক ছাত্রছাত্রী এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের ভোলা উচিত নয় সে সকলের সাহায্য ও সহামুভূতি ছাড়া কোন প্রচেষ্টাই সফল হয় না। আশা করি ভবিষ্যতে এর পুনরারতি ঘটবে না।

এবার ধন্তবাদ জানাচ্ছি মাননীয় অধ্যাপক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, শ্রীভবতোষ দত্ত ( বাংলা ), অধ্যাপিকা শ্রীমতী স্থমিত্রা তালুকদার ও বিশেষ করে অধ্যাপিকা শ্রীমতী কাজল বহুকে। এঁদের অন্থপ্রেরণা ছাড়া হয়ত অনেক ছঃসাহসিক কাজে হাত দেওয়া আমার পক্ষে সন্তব হত না। আমার সমস্ত সহপাঠী ও তৃতীয় বর্ষের বোনেদের কাছ থেকে যে সাহাঁয্য পেয়েছি তা ভোলবার নয়। সবশেষে জ্ঞানিয়ে রাখি—অর্থনীতি ও রাজনীতি সেমিনার কবে তার নতুন ভবনে উঠে যাবে তার জন্ত আমরা সবাই দিন গুনছি—সেই হুদিনের নিশ্চয়ই আর দেরি নেই যেদিন অর্থনীতি ও রাজনীতির ছাত্রেরা আমাদের প্রতি অন্তিশাণ বর্ষণে ক্ষান্ত হবেন আর আমরাও স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে পারব।

নীপা ভট্টাচাৰ্য

সম্পাদিকা—গাল্সি কমন রুম

#### বিরামাগার

আলোচ্য বছরে এই বিভাগ থেকে অস্তান্ত থেলার সরঞ্জামের মধ্যে কেনা হয়েছে ২-টি টের্টেনিশ্ টের্ এবং ২-টি ক্যারম্ বোর্ড্। টের্টেনিসের বল্ ও র্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে নিয়মিত ভাবে— (কেনা হয়েছে যথাক্রমে ৩২৪টি এবং ১-টা)। খেলার সরঞ্জামের সমন্ত অভাবই দূর করা গেছে, একথা বল্লে অত্যুজি হবে কী ?

প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিরামাগারগুলিতে এতকাল ধ'রে নিয়মিতভাবে কোনও সাময়িক পত্র পড়ার জন্স পাওয়া যেত না, বই তো আকাশ কুত্বম! এ'বছর থেকে আমরা কিছু ইংরিজি ও বাংলা দৈনিক, সাপ্তাহিক, পান্সিক ও মাসিক পত্রপত্রিকার গ্রাহক হয়েছি। আশ্চর্য এই যে, আমাদের সরকারী কলেজে এ'বিধয়ে কোনও সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়নি।

প্রথার ব্যতিক্রম না ক'রে, এবারেও আমরা ( তেসরা ফেব্রুআরি ) প্রমোদবিহার ক'রে, সোজা বাংলায় স্টীমার-পার্টি উপলক্ষ্যে, বিরামাগারের জন্ত বরাদ্দ অর্থের ৮০% গঙ্গাবক্ষে বিসর্জন দিয়ে এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে বিরামাগারের উন্নতির অনেকখানি সন্তাবনাও। তেরোশ' ছাত্রছাত্রী যে টাকার অংশীদার, সে টাকায় মাত্র আড়াইশ' ছাত্রছাত্রী আনন্দ করলেন—এর মধ্যে যুক্তিটা কোধায় থুঁজে পাইনি। স্টীমার-পার্টির বিকল্প কোনণ্ড কিছু নতুন ছাত্রপরিষদকে চিন্তা করতে অন্নরোধ করেছি যাতে সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে যোগদানের স্তুযোগ দেওয় যাবে। এ উক্তিতে যুক্তি যতটাই থাক, সকলকে প্রীত করতে পারবেনা, জানি। কারণ সেদিনকার জলবিহারে যে আনন্দপ্রাচুর্য ছাত্রছাত্রীরা পেয়েছিলেন, সেকথা মনে ক'রে তাঁদের অধিকাংশই একে অপব্যয় মনে করেন না। যাই হোক্, এ বছরে প্রতিষ্ঠ্তু-সন্তাহ জলযাত্রায় কোনও আফুটানিক ক্রটী হয়নি। যে কারণে এই জলযাত্রায় আমরা আধিক ক্ষতিগ্রন্ত হই তা হ'ল যোগদানকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাল্পতা। আগের বছর ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক যোগ দিয়েছিলেন, এবছরে মাত্র ২৫০। সে'দিন আমার অর্হন্তাজনিত অন্থুগহিতিতে প্রয়েঙ্গনীয় ব্যবহাগুলি খাঁরা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীসঞ্জিৎ বস্থে, শ্রীঅমিত মণ্ডল ও শ্রীপ্রদীপ রায়ের নাম কুতজ্ঞসনে স্বর্গ করছি।

আলোবাতাসের সঙ্গে আমাদের বিরামাগারের চিরবৈরিতা। ফলে সেগুলি অন্ধকৃপের সঙ্গে তুলনীয় না হ'লেও মধ্যযুগীয়-আবহাওয়া-সম্পন্ন এ'কথা বললে সত্যভাষণের চেয়ে বেশী কিছু করা হবে না। এই জন্থ, এবং ত্থানসঙ্গোচের জন্থও বটে, বারান্দা ও অলিন্দে গুঞ্জনরত ছাত্র এবং গুঞ্জরনরতা ছাত্রীদের সংখ্যা ক্রম-বর্ষিয়ে। ব্যাপারটী যদি কত্পিক্ষের অপ্রিয় মনে হয় তবে তাঁরা বিরামাগারের সার্বিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি দেন। সম্প্রতি অধ্যক্ষের সহায়তায়, বিরামাগারের আসবাবপত্রের সংস্কার হয়েছে বটে, কিন্তু অন্তান্থ দিকে প্রচুর অভাব। কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি সর্বাগে একটী অতি প্রয়োজনীয় অভাব দূর করতে। কমনক্ষমে একটী অবসরণাঠ্য-প্রস্থাগার গঠন করুন।

এ'বছর টের্টেনিস ও ক্যারম প্রতিযোগিতা প্রচলনান্ডুসারে অন্নপ্রিত হয়। গত বছরের সম্পাদক কয়েকটা বিশেষ অন্তরিধার জন্ত টের্টেনিস্ প্রতিযোগিতাটীর অন্নষ্ঠান করতে পারেন নি; এবছরে সেটা হয়। ক্যারম প্রতিযোগিতা নতুন ক'রে শুরু করা হয়েছে। ছাত্রীদের আগ্রহে, অধ্যাপিকা শ্রীমতী কাজল

বহু'র সহায়তায়, ছাত্রীদের ক্যারম প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু রহস্ত এই যে, ব্যবস্থা করার পর, তাঁরা শুরু করলেন বটে কিন্তু সারা করতে পারলেন না। ফলে প্রতিযোগিতাটী অর্ধসমাপ্ত হয়ে রইল। অধাক্ষের কক্ষে, ১৪ই নভেম্বর, তাঁর পোরোহিত্যে ১৯৫৯ সালের বিজয়ী ও বিজিতদের রোপ্যাধার ও মান-পত্র পুরস্বার দেওয়া হয় এক সংক্ষিপ্ত উৎসবে। এ'বছরে অফুপ্তিত সবকটী আন্ডান্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজয়ী ও বিজিতদের নাম দেওয়া হল।

প্রতিযোগিতা	চূড়ান্ত খেলায় বিজয়ী	চূড়ান্ত খেলায় বিজিত	বছর
টের্টেনিস্	দেবীপ্ৰসাদ মুখোপাধ্যায় ( ৪ৰ্থ বিজ্ঞান )	আলোক সরকার (২য় বিজ্ঞান )	22CA
টের্টেনিস্	দীপক ঘোষ ( ৩য় বিজ্ঞান )	তিমির চক্রবর্তী ( ৪র্থ কলা)	2262
দাবা	দীপ্তিপতি মুখোপাধ্যায় ( ৽য় বিজ্ঞান )	কল্লোল চৌধুরী ( ২য় বিজ্ঞান )	2965
ক্যারম্	তপন চক্ৰবৰ্তী ( ৪ৰ্থ কলা )	যশোবন্ত কর ( ২য় কলা )	2262

ছাত্রীরা অভিযোগ করেছেন উাদের টেব্র্টেনিশ্ খেলতে দেওয়া হয় না। পৃর্বতন সম্পাদকের উপদেশে ছাত্রদের কমনরুমে ছাত্রীদের টেব্র্টেনিশ্ খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাঁরা নিয়মিত কয়েকটা নিয়ম মেনে খেলতেন, কোনও অস্থবিধা হ'ত না। কিন্তু জানাতে বাধ্য হচ্ছি অকস্মাৎ একদিন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এ'ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয়। অতএব।

আমার কৃতজ্ঞতাভাজনদের নাম শ্বরণ করে ইতি করছি। অধ্যক্ষ ডক্টর সনৎকুমার বহু, বিভাগীয় অধ্যাপক শ্রীদিলীপকুমার বিখাস, শ্রীপ্রণব রার্য়, শ্রীসঞ্জিৎ বহু, শ্রীহৃস্নাত রায় এবং কলেজের প্রত্যেক অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

> রামচন্দ্র রায় সম্পাদক— বিরামাগার

## ইংরাজী সেমিনার

আলোচ্য বছরের প্রথম অধিবেশনে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে সেমিনারের কার্যাবলীর উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে ভারত পরিদর্শনরত যুক্তরাষ্ট্রের রোটারিয়ান গর্ডন চাইল্ডার্স কবি ওয়াণ্টার হুইট্ম্যান সহস্কে আলোচনা করেন। তৃতীয় অধিবেশনে অধ্যাপক অমল ভট্টাচার্য অন্তত্ত বদলী হওয়ায় তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জালানো হয়। চতুর্থ অধিবেশনে বৃটিশ কাউসিলের সহযোগিতায় কয়েকটি আবৃত্তির রেকর্ড বান্ধিয়ে শোনানো হয়। কাউলিল কর্তৃপক্ষ তাঁদের রেকর্ড-প্লেয়ারটি এই অনুষ্ঠানের জন্থ পাঠিয়েছিলেন। এই প্রসন্ধে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমাদের কলেজের নিজস্ব একটি স্বযুঠেন্দের রেকর্ড-প্লেয়ার থাকা প্রয়োজন। কাউলিল কর্তৃপক্ষ একাধিকবার বলেছেন যে কলেজ যদি নিজস্ব রেকর্ড-প্লেয়ার থাকা প্রয়োজন। কাউসিল কর্তুপক্ষ একাধিকবার বলেছেন যে কলেজ বদি নিজস্ব রেকর্ড-প্লেয়ার ব্যবহা করে তাঁরা কিছু কিছু রেকর্ড উপহার দিতে প্রস্তত আছেন। এই বিষয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ ও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। সেমিনারের পঞ্চম অধিবেশনে কলেজের প্রান্তন অধ্যাপক শ্রি বিধ্যায় রাখার ব্যবহা করে তাঁরা কিছু কিছু রেকর্ড উপহার দিতে প্রস্তে আছেন। এই বিষয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ ও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। সেমিনারের পঞ্চম অধিবেশনে কলেজের প্রতন্ধ অধ্যাপক গণ হামনিট নীরবতা পালন করে অধ্যাপক ইন্দ্রের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। ষঠ অধিবেশনে যুক্তরাব্যোর লীঙ্গ বিধিবিঢ়ালযের অধ্যাপক ওয়াল্শ্ ''Development of Sensibility in Keats'' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ইতিপূর্বে একটি অন্নষ্ঠানে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে নবাগত ছাত্রছাত্রীদের স্থাত জানায়। শেষ সন্থাতে কলেজের ভূত্বপূর্ব অধ্যাপক শ্রীন্বজ্বলামান চর্যুন্দ্র বৃত্ত বেদী দেয়ে শ্বেদান জন্দের স্থাত জানায় । শেষ সেমিনারের ছটি লাইব্রেরীর কাজ যথাপূর্ব চলছে। সেমিনার লাইব্রেরীতে বহু নতুন বই পাওয়া গেছে, এবং আরও বই পাব—এই মর্মে এক প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গেছে। এর জন্স আমরা অধ্যপক শ্রীতারকনাধ সেনকে ধন্সবাদ জানাই। অনাস লাইব্রেরীতেও বহু নতুন বই এসেছে। ইউ. এস্. আই. এস্. কর্তৃণক্ষ সেমিনার লাইব্রেরীকে আটখানি মূল্যবান বই উপহার দিয়েছেন। বইগুলি অনাস লাইব্রেরীতে রাধা হয়েছে।

আমাদের সেমিনার কক্ষের দিকে মাননীয় অধ্যক্ষর দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। ঘরটি কোন দিন পরিকার করা হয় বলে মনে হয় না—চেয়ার টেবিলের উপর সব সময় পুরু ধুলো জমে থাকে। চেয়ারগুলি মেরামত করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

ইংরাজী বিভাগের সব অধ্যাপককে, বিশেষ করে শ্রীস্থবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীতারকনাথ সেনকে, তাঁদের সহযোগিতা ও মূল্যবান উপদেশের জন্থ ধন্তবাদ জানাই। বিভাগে নবাগত অধ্যাপক শ্রীকালিদাস বহুকে স্বাগত জানাচ্ছি। পরিশেষে বৃটিশ কাউসিলের স্থানীয় প্রতিনিধি শ্রী আর্গল্স্ ও শব্দযন্ত্রী শ্রীমলন্ন বন্ধী এবং কলেজে অবস্থিত ইলেক্টি ক অফিসের কর্মচারীদের তাঁদের সহযোগিতার জন্থ অসংখ্য ধন্তবাদ জানাই।

> দিব্যত্তি হাজরা সম্পাদক—ইংরাজী সেমিনার

সৈয়দ তনবীর মুরশেদ সম্পাদক—ইংরাজী অনাস লাইব্রের

## ইংরাজী অনাস´লাইব্রেরি

পূর্ববর্তী স্থযোগ্য সম্পাদক সৈয়দ তনবীর মুরশেদের পর গত জান্মুআরি মাদে আমার হাতে অনার্স লাইবেরির ভার পড়ে। ৬১০ থানি বই আর ৬৭.২১ টাকা মূলধন নিয়ে আমার কাজ আরস্ত হয়। লাইবেরির জন্ত এ পর্যন্ত ১০ থানি নৃতন বই কিনতে পেরেছি। উই লেগে অনেকগুলি বই ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রন্ত হয়েছে। তবুও ইংরাজী বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকর্দ্দের ও কলেজ কতৃপিক্ষের আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতায় অন্তান্ত বইগুলিকে অক্ষুগ্ন রাখতে পেরেছি। তাঁদের সকলকে আমার অকুঠ ধন্তবাদ জানাছিছে।

আমাদের বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীকালীপদ দাশগুপ্তের আকস্মিক মৃত্যু সকলকে শোকাভুর করেছে। তাঁর আন্ধার কল্যাণ কামনা করি। এ বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মৃত্যুও কলেজের অপুরণীয় ক্ষতিস্বরূপ। তাঁর পরলোকগত আন্ধার শান্তি প্রার্থনা করি।

> ৪ই ফেব্রুআরি তারিখে ইংরাজী অনাস কক্ষে আমরা চতুর্থ বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। তৃতীয় বর্ষের বন্ধু-বান্ধবীদের অকুঠ সাহায্য ও সহযোগিতাই অনুষ্ঠানটিকে সফল করে তুলতে পেরেছে। তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্তবাদ জানাই।

সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

রণেন্দ্রমোহন বস্থ সম্পাদক—ইংরাজী অনাস বিভাগ

#### বাংলা পাঠচক্র

পাঠচক্রের প্রধান কাজ বই দেওয়া-নেওয়া। সে কাজ নিয়মিত হয়েছে। তবে বন্ধুদের মুখে বারবার প্রয়োজনীয় বই-এর অভাবের কথা গুনতে হয়েছে। সে অভাব মেটাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু নানা সরকারী নিয়মের ফলে সে অভাব শেষ পর্যন্ত মেটান সন্তব হয় নি। আশা করি, আগামী সম্পাদক সে অভাব মেটাড়ে

পারবেন। সরকারের কাছ থেকে নৃতন আল্মারি দেবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। তবে 'নোটিশ বোর্ড' সম্পর্কে কোন কথা এখনও শুনি নি।

সময় অভাবে ড্র'টির বেশি আলোচনা-সভা করা সন্তব হয় নি। প্রথমটিতে শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ নাগ ''কাব্য-নাট্য ও মালিনী'' সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেন। দ্বিতীয় সভায় গ্রীন্থলেখা দে ''প্রমথ চৌধুরীর গত্বরীতি'' সম্পর্কে আলোচনা করেন।

্ণাঠচক্র পরিচালিত 'আশাবরী' পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকা প্রকাশে নানাভাবে সাহায্য করেছেন গ্রীস্থশনিলয় ঘোষ।

মলয় মণ্ডল

সম্পাদক--বাংলা পাঠচক্র

### রাজনীতি সেমিনার

প্রথমেই মনে পড়ছে শিক্ষাবিভাগ আর সরকারী কর্মসংস্থার কথা খাঁদের কর্মনৈপুণ্যে আমরা এখনও সেই "শতাব্দীর অন্ধকারে" অ লোকের আরাধনায় মগ্ন।

সেমিনারের আসল কাজ বলতে প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা এবং বই দেওয়া-নেওয়া। প্রবন্ধপাঠের দিক থেকে আমাদের সেমিনারের তৎপরতা চিরদিনই বেশি। অধিকাংশ সময়ই আমরা সকলকে হথোগ দিতে পারি না। ভবিষ্তৎ সম্পাদক এদিকে দৃষ্টি দিলে ভাল করবেন। নিমলিখিত প্রবন্ধওলি হুলিখিত হয়েছিল।

Prospects and Future of Democracy in India- কল্যাণ বিখাস

Future of Capitalsm-উৎপল দত্ত

Future of Communism-সঞ্জিৎ বোস

Theory of Totalitarian State-তপন গস্থোপাধায়

প্রথম প্রবন্ধটি ভাষার মাধুর্যে ও চিন্তার সমারোহে সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছিল। প্রত্যেকটি প্রবন্ধপাঠের সঙ্গেই যে আলোচনা হয় তা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিল।

অর্থনীতি ও রাজনীতি সেমিনারের পক্ষ থেকে একটি প্রাচীরপত্র প্রকাশিত হয়। এ বছরের প্রাচীর-পত্রের ভার রাজনীতি সেমিনারের হাতে ছিল এবং তার সাফল্যের বা অসাফল্যের পরিমাপ পাঠকরা করবেন। বই দেওয়া-নেওয়া এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়, শুধু লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষকে আর একটু তৎপর হতে বলি। পরিশেষে পরবর্তী সম্পাদকের উদ্দেশ্তে শুভকামনা প্রেরণের পূর্বে তাঁর প্রতি এই অন্থরেধে যে তিনি যেন রাজনীতি সেমিনারে বই-এর সংখ্যা বুদ্ধি করেন।

পাহাডী রায়

#### শিবশংকর বস্থ

যুগ্মসম্পাদক—রাজনীতি সেমিনার

### দর্শন সেমিনার

সেমিনায়ের প্রথম ও প্রধান কাজ বই নেওয়া-দেওয়া। এই প্রধান কাজে হাত দিয়েই হু'ট অহবিধার সামনে পড়তে হলো। এক---বই-এর সংখা। প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। ছই---যে অল্পসংখাক বই আছে তাতেও দরকারী বই-এর একান্ত অভাব। প্রয়োজনীয় ভাল বই যে ক'টি আছে, সেণ্ডলোও এত

পুরোনো যে, জীর্ণতার জন্তে ব্যবহারের অযোগ্য। আমার কার্যকাল গুরু হবার পর কিছু নতুন এয়োজনীয় বই অ্যন্য হয়েছে। কিন্তু তা এত অপর্যাপ্ত যে বিরাট চাহিদার মাথা ছুঁতে পারে না।

সেমিনারের প্রথম অধিবেশন অন্থুন্ঠিত হয় দিয়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশান্ত্রের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক লী এন. ভি. ব্যানার্জীর উপস্থিতিতে। এই সভায় Philosophy of Science সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ ভাষণে তিনি আমাদের মুগ্ধ করেন। সেমিনারের অস্তান্ত আলোচনা সভাগুলিতে মোট পাঁচটি প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়। প্রবন্ধকারদের সাগ্রহ প্রয়াস ও সতীর্থদের আন্তরিক সহযোগিতার সঙ্গে দর্শন বিভাগের অধ্যাপকদের সন্ডাপতিরূপে উপস্থিতি এই সভাগুলোকে পরম আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। নীচে প্রবন্ধ ও রচয়িতাদের নাম দেওয়া গেল:

- 1. Object and Content of Knowledge-মৃণাল সিরি।
- 2. There is nothing in the intellect which was not previously in the senses-অতমু কয়াল।
- 3. Philosophy-futile or fertile-তপনকুমার চক্রবর্তী।
- 4. Can the existence of God be morally justified ?-- পুরবী দেব।
- 5. Matter, life, mind as stages of evolution-প্রশান্তকুমার চটোপাধ্যায়।

আমাদের তৃতীয় বর্ধে থাকাকালীন মাননীয় অধ্যাপক এযুক্ত তারাশক্ষর ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেন। সেই উপলক্ষে এক বেদনামধুর বিদায়-অন্মষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। তাঁর ভবিয়ৎ জীবন আরো উজ্জ্বল ও মঙ্গলময় হ'য়ে উঠুক, এই আমাদের প্রার্থনা। তাঁর পরিবর্তে আমরা অধ্যাপক একাতাায়নী দাস ভট্টাচার্যকে পেয়েছি। তাঁর আন্তরিকতা ও সহাদয়তা অল্পদিনের মধ্যে তাঁকে সর্যজনপ্রিয় করে তুলেছে। গত বছরেই আমাদের অধ্যাপক গ্রীযুক্ত প্রবাসজীবন চৌধুরী কিছুদিনের জন্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চ'লে যান সেখানকার কয়েকটি বিশ্বজিলেয়ের সাদর আমন্ত্রণে। তাঁকে বিদায় দেবার জন্তে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দীর্ঘদিনের বিরতির পর সেমিনারের প্রাচীর প্রত্রিকা আবার নতুন নাম দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এর প্রকাশ সবার সপ্রশংস মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। সময়ের অভাবে একটি মাত্র সংখ্যা আমরা প্রকাশ করতে পেরেছি। আর পত্রিকার সম্ভাপরিসর স্থানে ইচ্ছা থাকলেও একটি প্রবন্ধ ছাড়া আর কিছু আমরা দিতে পারিনি। প্রথম সংখ্যার কৃতিত্বের প্রায় সবটুকুই তপনকুমার চক্রবর্তীর প্রাপ্য। এই পত্রিকার সম্পাদনার ভার সেমিনার সম্পাদকের উপরই হুন্ত ছিল। প্রথম সংখ্যাটি দিলীপ রায়চক্রবর্তীর 'Science and Religion' নামক একটি প্রবন্ধ ভূষিত ছিল।

সেমিনারের পরিচালনার ব্যাপারে সাহচর্যের জন্থ সমন্ত সহপাঠীই সন্মিলিতভাবে ধন্থবাদার্হ। সেমিনারের সম্পাদক হিসেবে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি অধ্যাপক শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আন্তরিকতাপ্রসাদে চিরক্তন্ত। ধন্থবাদ জানিয়ে তার ঝণ পরিশোধের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে চাই না।

> নীহাররঞ্জন চক্রবর্তী দ্রস্পাদক—দর্শন সেমিনার

### শাহীরবৃত্ত পরিষদ

নিরুপায় হয়েই আবার আমি বিভাগীয় স্থানাভাবের কথা উল্লেখ করছি। পরিসংখ্যান বিভাগের জায়গাঁট শারীরবৃত্ত বিভাগকে দেবার কথা অনেক দিন থেকেই চলে আমছিল। কিন্তু আজও তা পাওয়া গেল না।

আমাদের সেমিনারে আরও বই দরকার। এদিকটায় দৃষ্টি দিলে আমাদের খব্ই উপকার হয়।

বিদায়ী ষষ্ঠ বর্ষকে হুন্দর ঘরোয়া পরিবেশে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের কাজ শুরু করি। তাদের মধ্যে শ্রীমতী শকুন্তলা গুস্তা ও ডাঃ শ্রীহথেন্দু মুথোপোধ্যায় যথাক্রমে first class first ও second হয়েছেন। তাদের এবং অন্তান্তদেরও আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এবারে আমাদের দশম বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসব ধুবই উপভোগা হয়েছিল। বিজ্ঞানের ছাত্র্ছাত্রী হয়েও আমাদের মধ্যে যে সাহিত্য, কলা, সঙ্গীত ও শিল্প রসবোধ আছে, এবং আমরা যে তা যথাযথ ভাবেই ফুটিয়ে তুলতে পারি তার প্রমাণ পাওয়া যাবে আমাদের বিচিত্রাফুষ্ঠানে, সঙ্গীতে ও নাটকাভিনয়ে। বিশেষ করে ছাত্রীদের নাটকাভিনয় সত্যিই অপূর্ব হয়েছিল। ২৬শে ও ২৭শে সেপ্টেম্বর, এই তুদিনব্যাপী যে উৎসবের হুর বেজে উঠেছিল আমাদের অন্তরে, তার স্মৃতি কখনও ভুলবো না।

আমাদের মুখপত্র দেয়াল-পত্রিকা "প্রাচীরিকা"র বৈশিষ্ট্য আজও অস্লান।

আগে এখানে Physiology ও Biochemistry-তে প্রচুর গবেষণার কাজ হ'ত। কিন্তু আগাতত তাপ্রায় বন্ধ আছে। অদূর ভবিয়তেই তা আবার শুরু হবে বলে আশা রাখি।

অধ্যাপক শ্রীহৃনীলচন্দ্র সেন তাঁর কাজে আবার পুনর্নিযুক্ত হওয়ায় আমরা সতিাই আনন্দিত হয়েছি। এই বিভাগে অধ্যাপক সংখ্যা কমের কথা আমরা অনেকদিন থেকেই বলে আসছিলাম। এই জন্তে বিশেষ করে বর্তমান B. Sc. পরীক্ষার্থীরা যথেষ্ট ক্ষতি সহু করেছে। তাদের অবস্থার কথা চিন্তা করা উচিত ছিল।

এ বছর এ বিভাগে ত্ব'জন অধ্যাপকের সমাগম হয়েছে। তুজনেই এখানকার প্রাক্তন ছাত্র। Dr. Sukhhamoy Lahiri, M. Sc., D. Phil. (Oxon), assistant professor হিসাবে এবং Dr. Achintya Kumar Mukherjee, M. Sc., D. Phil. M. B. B. S., Head of the Department-জপে যোগ দেওয়ায় আমরা আনন্দিত হয়েছি এবং উাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করি Dr. Mukherjeeর অধীনে অচিরেই আবার পূর্ণজোমে গবেষণার কাজ গুরু হবে।

আমর! প্রতি সপ্তাহেই একটি করে Seminar lecture এর ব্যবহা করে থাকি। এগুলো ছাড়া আরও নানা কাজের জন্ত আমরা নিজেরা চাঁদা তুলে থাকি। কিন্তু ড্রংখের বিষয় এ বছর ছাত্রছাত্রী বক্ষু ও বান্ধবীরা অনেকেই আমাদের নিরাশ করেছেন তাঁদের উৎসাহের অভাব দেখিয়ে। তার ফলে অর্থনৈতিক ব্যাপারে যথেষ্ট অন্ধবিধা ভোগ করতে হয়েছে। এজন্ত তাঁদের দায়ী না করে পারছি না। আমাদের মধ্যে অনেকেই নিজে থেকে বেশী চাঁদা না দিলে সত্যিই আমাদের কাজের অনেক অন্ধবিধা হ'ত।

বিদায়ী ৪র্থ বার্ধিক ছাত্রছাত্রীদের বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা এক হুন্দর অনুষ্ঠানের মধ্যে বিদায় সংবর্ধনা জ্বানিয়েছে। গান, বাজনা, খেলাধূলা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সেই ২০শে ফেব্রুমারির দিনটা বেশ কেটে গেছে। আমরা Dr. A. Mukherjee ও Dr. S. Lahiriকে স্বাগত সংবর্ধনা জানিয়েছি সমন্ত অন্তর দিয়ে।

এ বছর এই Seminar lectureগুলি আমরা করেছি :---

- (1) Work Physiology-Dr. Sushil Kr. Maitra.
- (2) Regulation of Body Temperature-Dr. D. P. Sadhu.
- (3) Adrenal Function in Experimental Nephrosis-Dr. D. Dasgupta.
- (4) Succinic Thiokinase-Dr. Rajarshi Majumder.
- (5) Coagulation of Blood-Sree Asis Kr. Sinha.

এছাড়াও U. S. I. S. এর তত্ত্বাবধানে গত ১৮. ১২. '৫৯ তারিখে একটি film show করা হয়।

Oxford University থেকে Mr. B. B. Lloyd, Ascorbic-acid in Blood সম্বন্ধে আমাদের এখানে গত ১-ই ডিসেম্বর একটি lecture দেন। অনুষ্ঠানটি খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

যদি কিছু ভুল করে থাকি তো সন্নেহ মার্চনা নিশ্চয়ই পাব। তবে যা-ই করেছি তাতেই সকল ছাত্র-ছাত্রীদের যে সহৃদয় সহযোগিতা পেয়েছি তা ভুলবো না। আফুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এথানেই শেষ করহি।

#### অমল রায়

সাধারণ সম্পাদক—শারীরবৃত্ত পরিষদ

## গণিতবিন্তা সেমিনার

পাঠচক্রের বাধিক বিবরণ চতুর্থবর্ধের বিদায়ী সম্পাদকের দেওয়ার কথা; কিস্ত তার কাছ খেকে কোনো বিবরণ না পাওয়াতে কাজটা তৃতীয়বর্ষের সম্পাদকেরই হয়েছে। স্থতরাং এটা বোধ হয় বেশ মন্ধার কথা যে আমরা বিদায়ের বহু পূর্ব্বেই আমাদের কথা বলছি।

সেমিনারের কথা বলতে গিয়ে এথমেই বইয়ের আদানপ্রদানের কথা আদে। আমাদের সেমিনার পুস্তকের সংখ্যা খুব বেশী নয়; আবার তার মধ্যে কতকণ্ডলি বহু প্রাচীন ও জীর্ণ। সেই কারণে বইয়ের দেওয়া নেওয়াটা আমাদের সাম্মানিক ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে; গণিতের অন্তান্ত বিভাগের ছাত্রদের বই নেওয়ার হ্যোগ দিতে পারা যায় না—তার জন্ত আমরা ছুঃখিত। প্রদ্বেয় অধ্যাপক শ্রীবিলাসন্দ্র ভট্টাচার্যের পরিচালনায় আমাদের মধ্যে বইগুলি তাড়াতাড়ি দেওয়া নেওয়ায় আমরা অনেক বই ব্যবহারের হ্যোগ পাই। ছেঁড়া বইগুলি বাঁধালে ভাল হয় কিন্তু সরকারী দপ্তরথানায় বাঁধাতে পাঠালে, সেগুলি আমরা যে আবার ব্যবহারের হ্যোগ পাব, তাতে সন্দেই থেকে যায়।

গত বছরে আমাদের সেমিনারে যে সকল আলোচনা-সভার আয়োজন হয়েছিল, তার মধ্য উল্লেখযোগ্য প্রধান অধ্যাপক জ্রীনন্দলাল ঘোষের Mathematical Spaces এবং কলেজের অধ্যক জ্রীসনৎকুমার বস্থর Amusement in Mathematics.

বর্তমান বংগরে বীক্ষণাগারের ডিমন্স্টেটর শ্রীকাশীনাথ নন্দীর উচ্চতর শিক্ষার্থে বিলাত গমনের গুর্বে এক বিদায় সভা হয়। তাতে গণিতের সকল অধ্যাপক, প্রধান অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ও গণিতের ছাত্রদের উপস্থিতিতে সভার কাজ ভয়াবহ প্রাকৃতিক দ্রর্ঘোগের মধ্যেও হুসম্পন্ন হয়েছিল। এই সভায় অধ্যক মহাশয় শ্রীকাশীনাথ নন্দীর ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে ভাষণ দেন এবং প্রধান অধ্যাপক মহাশয় বর্তমান বিজ্ঞানে জ্রাতিবগণিতের গুরুত্বের কথা বলেন। আমাদের বিভাগে কিছুদিন পূর্বে অধ্যাপক শ্রীহ্বশীলচন্দ্র দাশগুগু শিবপুর কলেজে অধ্যাপনার জন্স তানাতরিত হন। তাঁর বিদায়ের জন্স চতুর্থ বর্ধ ছাত্রদের পক্ষ কিছু ব্যবস্থা না করায় আমরা অত্যস্ত হুংখিত হই; অবস্থ এজন্স তাদেরও কিছু বলা যায় না-কেননা সে সময় তাদের পরীক্ষা ছিল। যা হোক, আমরা হুশীলবাবুর ছাত্রদের নিকট আন্তরিকতার, হুমধুর ব্যবহারের এবং নিপুণ অধ্যাপনার অনুঠ প্রশংসা করি এবং আশা করি তাঁর ভারে ভারের ভার্যাল গল যোগদান করোগালনায় সাবলীল ও মঙ্গলময় হয়ে উঠুক। আমাদের বিভাগে নৃতন অধ্যাপক শ্রীগোপাল পাল যোগদান করেন।

পরিশেষে আমাদের সেমিনার স্বষ্ঠু পরিচালনায় আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক জ্রীনন্দলাল ঘোষ ও কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্যের আন্তরিক সহায়তার জন্ম অক্ঠ কৈতজ্ঞতা জানাই। আশা করি, আমাদের মধ্যে সামান্স চাঁদা তুলে সেমিনারের একটা নিজস্ব fund গঠন করে আমাদের সমস্তা আমরা নিজেরাই সমাধান করতে সমর্থ হব; এর জন্ম আমার সতীর্থগণের নিকট সহযোগিতা কামনা করি।

> গৌরহরি সাহা সম্পাদক—গণিতবিছা সেমিনার

## ম্মল্ এরিয়া গেম্স্

আমার পূর্বস্থনী কে ছিলেন জানি না। কিস্তু মল্ এরিয়া গেম্স সেক্রেটারীর কাজ সামান্তই সেটা বুঝলাম কাজ হাতে পেয়ে। কারণ এ' কলেজে ভলিবল, ব্যাডমিন্টন বা বাস্কেটবল, কোনটারই প্রথা নেই। আমাদের এই প্রথাসবাঁষ কলেজে ছাত্রদের ব্যাডমিন্টন খেলার ব্যবস্থা করতে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। ছাত্রীদের ছিল বটে, কিস্তু ছাত্রদের ব্যাডমিন্টন খেলার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আমার কার্যকালে সে ব্যবস্থা করতে পেরে আমি ধন্তা। সমস্ত শীতকালটাই এবার ব্যাডমিন্টন খেলা হয়েছে।

অনেকের উৎসাহে, অনেক চেষ্টায়, ভলিবলের গ্রাউও্ তৈরী এবং নেট ফেল। হয়েছিল কিস্তু দিন সাতেক খেলবার পরই উৎসাহীরা হতোৎসাহ হলেন। একটি টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল কিস্তুযোগদানকারীর অভাবে সেটি পণ্ড হয়।

একটি অভিযোগের উত্তর দিয়ে শেষ করছি। ছাত্রীদের এ' বছর ব্যাডমিন্টনের ব্যবহা ছিল না, তাই তাঁরা একই গ্রাউণ্ডে থেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কতৃ⁄পক্ষের আগত্তি থাকায় সে ব্যবহায় অগারগ হয়েছিলাম।

এই অবস্থায় এই বিভাগটির দায়িত্ব উত্তরস্থ্রীকে দিয়ে যাব ভেবেছিলাম ; কিন্তু ঘটনাচক্রে আমিই হলাম পুনর্নির্বাচিত। আমার সেই দ্বিতীয় কার্যকালে, আমার ধারণা, মল্ এরিয়া গেমস্'এর কিছুটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সে বিবরণী আগামীবারের জন্ত।

সকলকে, বিশেষ ক'রে বিভাগীয় অধ্যাপক ডক্টর অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে অশেষ ধন্তবাদান্তে ইতি।

রামচন্দ্র রায় সম্পাদক—স্মল এরিয়া গেমশ

## ভূ-জ্ঞান-পরিষদ

আমাদের পরিষদের কার্যহটী কেবল মাত্র ক্লাসের পাঠ্যক্রম এবং কার্যাবলীয় মধ্যে সীমাগদ্ধ নয়, এর উদ্ধেশ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ভূ-জ্ঞান সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানার্জনে সাহায্য ও বিভিন্ন কার্যাবলীতে সহায়তা করা। এর কার্যাবলী কয়েকটি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত:

সভা : সাধারণতঃ তিন ধরনের সভা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত হয়ে থাকে, যথা :---

- (ক) বাৎসরিক সভা বা পুনর্মিলন উৎসব
- (খ) সাধারণ সভা
- (গ) বিশেষ সভা

আমার কার্যকালে গত ১৯৫৯ সালে আমাদের বাৎসরিক পুনর্মিলন উৎসব অন্থর্ভিত হয়। এই অন্থ্রুগনে পোরোহিত্য করেন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডক্টর নিশীধরঞ্জন কর এবং প্রধান আতিথ্য গ্রহণ করেন কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভু-জ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর এস. পি. চাটাঞ্চি।

সাধারণ সভাতে বিশিষ্ট অধ্যাপক, দেশ-বিদেশের শিক্ষাবিদ্ এবং বজাদের আমন্তণ জানিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা এবং বজ্ততার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। আমাদের বিভাগ চলচ্চিত্র প্রদর্শনের উপযোগী মেশিন ও যন্ত্রপাতিতে সমৃদ্ধ। এরপ সভায় বজ্ততা শেবে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থাও হয়ে থাকে। গত ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাসে অধ্যাপক ডক্টর নিশীধরঞ্জন কর জার্মান বিশ্ববিভালয়ে তাঁর গবেষণামূলক পরিভ্রমণের উপর রঙীন চিত্র-প্রদর্শনসহ বজ্ততা করেন। তাঁর বজ্যতার বিষয়বস্তু ছিল, "An Excursion to a German University'। এ বৎসরই ডক্টর কর কাশ্মীর উপত্যকা এবং পির-পাঞ্জাল অঞ্চলে field-workএর উপর রঙীন চিত্রসহ বক্তৃতা করেন। এ ছাড়াও আমাদের জনপ্রিয় অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডক্টর করের ব্যবস্থাপনায় আরও কয়েকটি সাধারণ সভা অয়োজিত হয়েছিল।

গত ১৯৫৯ সালে পরিষদের সহ-সম্পাদক ও অন্ততম উৎসাহী সদন্ত শ্রীনিধিলকৃষ্ণ দে "Evolution of the Himalayan Hydrography"-র উপর একটি লিখিত বিবরণী পাঠ করেন। গত ডিসেম্বর মাদে শ্রী দে সাম্রতিক বন্থা প্লাবিত আমতা অঞ্চলে field-workএর উপর চলচ্চিত্র সহ একটি লিখিত বিবরণী (Field-Report) পাঠ করেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকমণ্ডলী শ্রী দে-র এই উৎসাহমূলক কার্যের ভূষণী প্রশংসা করেন।

ঐ দিনই তৃতীয় বর্ষের উৎসাহী ছাত্র শীরবীন্দু রায় "Problems of our Cotton Textile Industry"-র উপর একটি গবেষণামূলক লিখিত বিবরণী পাঠ করেন। এই বিবরণী-প্রস্তুতিতে তিনি যে অধ্যবসায়, শ্রম এবং ধী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা' ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপকবৃন্দের তরফ থেকে অকুষ্ঠিত প্রশংসা লাভ করেছে।

এই মাসেই তৃতীয় বর্ষের উৎসাহী ছাত্রী শ্রীমতী অঞ্জনা রায়চেধিরী "Glaciation, the Puzzling Phenomenon"-এর উপর একটি গবেষণামূলক বিবরণী পাঠ করেন। শ্রীমতী রায়চেধিরী বিভাগের ছাত্রীদের মধ্যে সর্বপ্রথম অগ্রণী হয়ে এই আলোচনা-চক্রের আয়োজন ক'রে যে প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন সেজন্ত তিনি সতি।ই ধন্তবাদাই।

১৯৬০ সালের ফেব্রুআরি মাসে প্যারি বিশ্ববিত্তালয়ের Geographer-Engineer অধ্যাপক আর. ড্যানিয়েল চলচ্চিত্র সহ "Photogrammetry"-র উপর বক্তৃতা করেন। এই ধরনের বক্তৃতাগুলিতে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই রঙীন চলচ্চিত্র প্রদর্শনের বাবস্থা করা হয়ে থাকে। এজন্ত আমি বিশেষ ভাবে ধন্তবাদ জানাই U. S. I. S., British Council, ভারত সরকারের প্রচার বিভাগ, প্রধান অধ্যাপক ডন্টর কর এবং এই ব্যাপারে আমাদের বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত গোপাল রায়কে।

### বিশেষ সভা

১৯৫৮ সালে এই বিভাগের জনপ্রিয় অধ্যাপক শ্রীঅমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের উচ্চতর গবেষণার্থে বিদেশ যাত্রার প্রাকালে একটি বিশেষ অন্থষ্ঠানের আয়োজন হয়। এই অন্থষ্ঠানে পরিষদ-সম্পাদক রমাপ্রদাদ মুথোপাধ্যায় অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের উজ্জলতর ভবিষ্ঠৎ কামনা ক'রে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে গাঁর সহদয়তাপূর্ণ আচরণ এবং সহযোগিতার কথা উল্লেখ ক'রে একটি বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক-প্রধান ডক্টর কর, অধ্যাপক ডক্টর সত্যেশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক শ্রীসত্যব্রত গোস্বামী অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের গুণাবলী ও তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। এই বৎসরে ডিসেম্বর মান্দে বিদায়ী চতুর্থ বর্ষকে একটি বিশেষ প্রীতি-সম্মেলনে বিদায়-সংবর্ধনা জানানো হয়।

>>৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাদে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের নবাগত ছাত্র ছাত্রীবৃন্দকে এক বিশেষ সভায় অভ্যর্থনা জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে সর্বপ্রথম পরিষদ-সম্পাদক নতুন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দকে স্বাগত-সন্তাষণ জানিয়ে ভাষণ দেন ও সহকারী সম্পাদক শ্রীনিখিলকৃষ্ণ দে নবাগতদের সন্মুথে একটি বিবরণী পাঠ করে পরিষদের কার্যাবলীর পরিচয় প্রদান করেন। পরিশেষে পরিষদ-সন্তাপতি অধ্যাপক কর পরিষদের উদ্দেশ্ত এবং কার্যাবলী বিশ্লেষণ করেন।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষামূলক আলোচনা-সভাগুলি পাঠচক্রের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হণার কথা। কিন্তু ক্ষোভের কথা হ'ল এ-বিভাগের ভারপ্রাপ্তা ছাত্রী-যুগলের এ-বিষয়ে চরম উদাসীন্ত এবং এরণ সভাতে তাঁদের সম্পূর্ণ অন্পুহিতি।

### শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ

আমাদের প্রথম পরিভ্রমণের গন্তব্য স্থান ছিল 'Gondwana Coal basin'। দ্রগ্রপুর, মাইথন, চিন্তরঞ্জন প্রভৃতি স্থানে এই পরিভ্রমণ পরিচালিত হয়। আসানসোলের একটি অঙ্গার-আকরের অভ্যন্তরও আমরা পরিদর্শন করি। অধ্যাপক ডক্টর কর ও অধ্যাপক শ্রীসত্যত্রত গোস্বামী এই Field-Work এর পরিচালনা করেন।

পরবর্তী পরিভ্রমণ হয় জন্মু, কাশ্মীর এবং পির-পাঞ্জাল অঞ্চলে। এর পরিচালনা করেন অধ্যাপক ডক্টর কর ও অধ্যাপক ডক্টর সত্যেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

বিগত শারদীয় ছুটিতে আর একটি গবেষণামূলক পরিভ্রমণ হয় দার্জিলিং এবং পূর্ব হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে। পরিচালনায় ছিলেন অধ্যাপক ডক্টর কর এবং তাঁর সহযোগী রূপে যোগদান করেছিলেন পরিষদ সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক।

পরিশেষে গত ডিসেম্বর মাসে বস্তা-প্রাবিত আমতা অঞ্চলে শিক্ষামূলক আর একটি পরিভ্রমণ হয়। এই পরিভ্রমণে স্নাতকোন্তের, চতুর্থ ব্যধিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা এবং অধ্যাপক ডক্টর সত্যেশচন্দ্র চক্রবর্তী, অধ্যাপক জীবিদলেন্দু ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জীতরুণবিকাশ লাহিড়ী, অধ্যাপক শ্রীসতাত্রত গোস্বামী এবং অধ্যাপক জীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যোগদান করেন।

উপরে উল্লিখিত Field work ছ'ড়াও বিভিন্ন অধ্যাপকদের পরিচালনায় প্রথম ও দ্বিতীর বর্ষের ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন স্থানে আরও কয়েকটি পরিভ্রমণ আয়োজিত হয়েছিল।

#### পাঠাগার

পরিষদের পাঠাগার বর্তমানে বেশ সমুদ্ধ বলা চলে। এই বিভাগের তত্থাবধানে আছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীতরুণবিকাশ লাহিড়ী। তাঁর হুষ্ঠু পরিচালনায় পাঠাগারের প্রশংসনীয় উন্নতির জন্ত আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্তবাদ জানাই। সহকারী লাইব্রেরিয়ান শ্রীমতী সায়দা মুরশেদকেও আমার ধন্তবাদ।

### আলোকচিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী (Photo corner)

পরিষদের চিত্র প্রদর্শনীর কার্যকলাপ খুব সন্তোষজনক নয় সন্দেহ নেই। আমার কার্যকালে মাত্র চারটি চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা সন্তব হয়েছিল।

### প্রাচীর পত্রিকা

প্রাচীর পত্রিকার সম্পাদিকার কার্যকালে পত্রিকা বেরিয়েছে মাত্র তিনটি।

পত্রিকা প্রকাশনায় শ্রীমতী রাথী থোষ, শ্রীমতী গোপা রায় ও শ্রীমতী ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত ; পুনর্মিলন অন্ধুণ্ঠান আয়োজনে শ্রীনিখিলকুঞ্চ দে, শ্রীমতী ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত, শ্রীমতী রাথী থোষ, শ্রীমতী মীরা আগরওয়ালা, শ্রীমতী সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী মালতী দত্ত ; এবং পরিভ্রমণ ব্যবস্থাপনায় শ্রীমতী পাবতী বস্থ, শ্রীতিমির চক্রবর্তী, শ্রীস্তজয় শ্রীমাল, শ্রীনীরেন সেন ও শ্রীজগলুল কবীরের কাছে অনেক সাহায্য পেয়েছি। আমি ওাদের আগুরিক কুতজ্ঞতা ও ধস্তবাদ জানাচ্ছি।

পরিষদের প্রতিটি কাজে অধ্যাপক-মণ্ডলীর তরফ থেকে পেয়েছি অনেক উপদেশ, সহযোগিতা ও সহাদয়তাপূর্ণ আচরণ। তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করছি।

রমাপ্রসাদ মুথোপাধ্যায়

সাধারণ সম্পাদক- ভূ-জ্ঞান পরিষদ

### সমাজ-সেবা-সমিতি

আমাদের কলেজের সমাজসেবা সমিতিকে তত্তটা প্রাধান্ত দেওয়া হয় না। ছাত্রপরিষদের বাছেটের সবচেয়ে ছোটো অংশটা এই বিভাগকে দেওয়া হয়।

সবিনয়ে বলছি যে এই বিভাগের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাতে পেরেছি। যখন কাজের ভার পেয়েছিলাম তখন এই বিভাগ-পরিচালিত পাঠ্যপুস্তকসংগ্রহের বইয়ের সংখ্যা ছিল দশ। আমার বিদায়কালে সেই সংখ্যা অন্যন যাটে দাঁড়িয়েছিল। এই সংগ্রহ বাড়াবার কাজে কয়েকজন ছাত্রের দান এবং যুক্তরাষ্ট্র সংবাদ-সংস্থার বদান্ততা থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। তা সত্ত্বেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, এত বড় কলেজের পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহের সংখ্যা যদি যাট হয় তবে তা হাস্তকর।

প্রচলনান্নযাগ্রী হ্রঃস্থ লোকেদের আমরা কিছু অর্থসাহায্যও করতে পেরেছি। পূর্বস্থরীকে ধন্তবাদও উত্তরস্থরীকে ওভেচ্ছা জানাচ্ছি।

অমিত মণ্ডল

সম্পাদক—সমাজ-দেবা-সমিতি



( 1959-60 )



## THE

## PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

VOL. 4 VOL-41

APRIL, 1960

Editorial

## Student Indiscipline

As we write, the Intermediate Examination in Arts and Science of the University of Calcutta continues, the University apparently undisturbed. Students have stampeded out of the examination Hall, compelling others to follow; desks have been broken, ink has been spilt, invigilators and high officials of the University have been manhandled and ejected. Nothing beyond normal expectations, of course. And therefore the Syndicate decides to let the examination continue.

Over the last five or six years, examination disturbances have become a regular feature of Calcutta life. Amusingly enough, even M.A. examinees complain of "stiff" questions. About the only genuine protest against this state of affairs made so far is the one by Professor Bhabatosh Dutta and Professor Tapas Majumder of this college, who have severed their connexion with the University's Post-Graduate Department of Economics. One wonders whether the significance of this gesture has been appreciated by the University or the students.

"Student indiscipline" has earned for itself a place among the more "fashionable" topics of discussion. Pseudo-intellectuals murmur vaguely about "revolution", about "blowing up the façade of the intrinsically rotten social superstructure" to get at the root of the problem. Diehards bluster about our ancient ideals of education. Both suggestions undoubtedly have their attractions. The former, however, is a trifle impracticable. The latter may be dismissed as at best a Utopian precedent, inapplicable in a modern industrial set-up.

The factors that have emerged, out of more serious considerations of the problem, as the reasons for the present situation, are economic, social and political.

To-day's economic imbalance is too pronounced to be ignored. Education has been inevitably commercialised into a "vocational" process. It

#### PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

is a means to an end. It is not knowledge or the acquisition of it thay matters, but the all-important degree, a passport to a job. "Education" being an exchangeable commodity, all obstacles to it ("out-of-syllabus", i.e., out-of-the-beaten-track, questions, for instance) must be therefore summarily removed. The best answer to examination questions is force.

This attitude is fostered by the academic despotism to be encountered in most of our colleges. We are held down to a groove by the examination, the "course", "probable questions". The business of education has been accordingly reduced to the passing on of a basic minimum of stereotyped information. The questioning spirit, the creative urge, is unknown in the average student.

With industrialisation, urbanisation, democracy and growth of masseducation, the impersonal collective has come to be emphasised. The objective of education is to fit the student to a basically vocational bias.

The social factor runs parallel to the economic one. To fit the students into a technocratic background, fundamental studies are becoming insignificant. The social reflection of the present economic position is gradually reducing professors to commercial entities. In the place of the pursuit of education, the modern youth concerns himself with "the pursuit of self-sufficiency in a modern educational set-up".

The position of the college professor in West Bengal is not at all enviable from the socio-economic point of view. It is extremely unfortunate that many of them feel and show signs of frustration. It cannot be denied that lack of social assurance robs a professor of much of his dignity. The students' contempt for him is perfectly condemnable but not entirely unnatural.

The political situation lends itself to condemnation just as easily. Ever since the days of the Freedom Movement, the students of Bengal have been extremely interested and even involved in politics. Pre-Independence political feelings amongst students had a certain urgency and unity of approach. After the Independence the political passion has lost coherence. The student community has split into groups lacking the former centripetal character. A tendency towards "slogan thinking" has developed. It is very rarely that a student understands, or is even aware of, the precise and entire meaning of the particular -ism to which he subscribes. The result is not only a neglect of studies *qua* studies, but also a development of insincerity, irresponsibility and entirely unjustified pretensions.

An additional source of trouble is the relation between the Government and the University. The Government supply the funds, and exercise the ultimate control over universities. The clash between political power and academic freedom has not been very happy.

All this is undoubtedly the truth, but not the whole truth. For instance, speaking of economic imbalance, we must remember that even though economic causes necessarily bring about intellectual impoverishnent, it does not follow that the removal of the first would correlatively remove the second. A telling example is that of the United States where economic affluence has only led to a general lowering of intellectual standards.

Neither is it very relevant to consider the social position of the teacher in analysing the attitude of the student. If education, in the ordinary sense, "may be defined as the formation, by means of instruction, of certain mental habits and a certain outlook on life and the world", social sentiments are not of signal importance in the determination of its quality. It is a matter of communicating "instruction" (not information): the academic structure is necessarily intellectual. It is the intellectual position of the teacher that should determine the attitude of the student. Thanks to the examination despotism and the information-mongering, it is this intellectual position that has suffered most.

Not that the intellectual position of the student is very secure. The so-called student intellectualism thrives on a few carefully built-up cults of the personality. Mysterious are the ways of the wise: it is impossible to know by exactly what process these select few come to exert such tremendous influence. Scholastic achievements or personal excellence are by no means necessary conditions. However, the cults flourish and undigested erudition is their greatest legacy. It is obvious how very conducive this is to the development of student indiscipline.

We feel that this "unrest" is not by itself a bad thing. What is really deplorable is that its form of expression should be such. A group of young people breaking out against the established order have not always been proved wrong. The point, however, is that to-day's young people are *not* breaking out against the established order. Organised student movements have concerned themselves with political disturbances in Hungary and Lebanon but never with our own educational problems at home. If the student feels that the present system of examination, the quality of the teaching personnel and the method of questioning are worth breaking out against, he has the right to do so in an organised protest. Why is he unconscious of this right? Why are undignified and ludicrous walk-outs and rowdyisms the only form of protest he can think of when organised movements are launched in plenty in support of or against more or less remote political problems?

The cult of the personality, of course provides the explanation, and, in this case, the "personalities" are peculiar. The Students' Unions of most Colleges and educational institutions are controlled by "professional

Bertrand Russell: The Place of Science in a Liberal Education (Mysticism and Logic).

students" (and amateur politicians). Basically unimaginative, their sole objective is to win college elections. Years of practice give them a certain technical skill at this, and they do win. Perhaps, it was under such leadership that boys in their early teens and even younger children marched along the corridors of the University—shouting anti-American slogans—at the time of the Lebanon disturbances. We do not mean to question their sincerity or even their integrity. It is, we repeat, the quality of imagination that they lack.

We offer no trite suggestion for a remedy. It is obvious that an imaginative and concerted approach on the part of the students is at least necessary. The expression of, or the protest against, student unrest should not be as it is now--sound and fury culminating in futile private or sectional rages.

# A Newcomer's Impressions

### GAUTAM CHAKRAVARTI Fourth Year, English

I had sat for my Cambridge examination and after its completion had come to Calcutta to take the first step towards my long-cherished goal —to enroll myself in the premier college of the country, Presidency (neé Hindu) College. Since I was a newcomer I was not aware of the holidays in this place and I had the luck to see the college premises in the most suitable garb which left a fitting impression upon a neophyte. I saw it in a deserted condition, since it was a holiday. As I had no cicerone to guide me I wandered in by myself, all alone and tingling with expectation.

Nor was I disappointed. My attention was first drawn by the tall, stately trees which rose as high as the massive building; furthermore they were then in full plumage and unshorn of any of their branches. I went ahead and stood under the porch. Directly ahead of me was the broad staircase, the steps hollowed out in places by the tramp of numerous feet and not a few of them illustrious ones. The solitary gong, suspended by a thick chain, was silhouetted against the clear blue sky behind. I wondered how many times it must have tolled the hours to call the students to their task. Then I started walking with slow steps the high-vaulted corridors supported by broad old pillars. A soothing atmosphere of cool richness pervaded the whole place and the flagstone floors bore eloquent testimony to the antiquity of the building.

When I had completed my aimless wanderings over the ground-floor I had to retrace my steps as the access to the upper stories were barred. I then saw the embossed plaque dedicated to the foremost scientist of India. Once more the spirit of rich heritage of the place assailed me and I tried to visualise the great man starting his dedicated research in these premises which ultimately led to the astounding discovery that plants have life. A little distance away the statue of the illustrious watch-maker proudly stood, drawing attention to the mechanism originated by him and which had made the slumbering brain and heart of India to whirr and tick.

Afterwards, as the classes were held my first impressions were rounded off. To me the college library was a source of undying interest. Housed in a lofty hall it hoarded painstakingly accummulated treasures both in the form of books and in rich, unforgettable associations. 1 remember, looking at the various busts and oils with which the library is decorated, **I** used to marvel at the great deeds of scholarship performed by these persons. Especially did I remember Professor Concll who was so greatly responsible for the translation of that immortal book. Rubaiyat of Omar Khayyam. Many similar associations of great men and their minds were continually conjured up by the records of this college which were on display in cases. The library was so cool and silent, with the quaint black floors that faintly suggested a cellar where the works of honoured persons were stored and ripening to a rich mellowness of the tarest vintage. "O for a draught of vintage! that hath been Cooled a long age in the deepdelved earth." Truly, a draught of such precious liquor would transport anyone into ecstasy. The rest of the college was also quite impressive. The spacious classrooms with high ceilings, the heavy beams, the tall doors and windows, the names curved on the polished and blackened benches, everything contributed to the impression of a rich heritage which the place exuded.

Such was the impression which I carried away with me and I found the words of Dr. Rajendra Prasad quite apt "... even as the Presidency College is no ordinary educational institution ... a college which has not only witnessed in all its phases the great changes India has been passing through in one of the significant periods in her long history, but which has contributed through its alumni in a large measure, to the conduct and eventful success of the various national movements launched one after another, till their culmination in the country's liberation in August, 1947." When I came back after a year I was fully convinced of the assessment.

# Economic Development and the Intellectual

PRANAB KUMAR BARDHAN

Sixth Year, Economics

'Progress! You politicians are always talking about it. As though it were going to last. Indefinitely. More motors, more babies, more food, more advertising, more money, more everything for ever. ..... Progress indeed !'

> A. HUXLEY, Point Counterpoint.

It is now widely recognised, though that recognition is often only lipdeep, that economic development is not a mere matter of manipulating your  $\lambda k$  or  $\lambda c$ —the instrument variables of your growth models so neatly constructed and so frequently emptied of even the barest essentials of sociology the ignorance of which is sure to make any development effort ridiculously barren. A proper study of the dynamics of growth should consider along with changes in production functions and other economictechnological growth factors, the vitally important elements of the sociology of the development process, its socio-cultural background, changing value complex and the structure of social and economic leadership. This paper confines itself to only one aspect of the last-mentioned factor: the role of the intellectual in economic development, India being its immediate frame of reference.

No discussion of the 'take-off' and all the economic aeronautics of it can be complete without reference to the pilot and his performance. But the history of 'take-off's at least in important countries informs us that this 'leadership function' was never consciously and directly assumed by people whom we can call intellectuals. The Schumpeterian entrepreneur, despite all his 'dynamic' virtues, was not, by any stretch of imagination, an intellectual. In those days people with a high I. Q. went into Scholarship, into theology and the Church, into administration (first in Germany, and then gradually in the rest of the countries of Europe), into medicine and the law, but they did not enter into the commercial and industrial life of their countries. The then great intellectual centres of Europe—Paris, Heidelburg, Berlin, St. Petersburg etc.,—had very little direct connection with the progress of industrialisation. It was only in the 20th Century that the great laboratories of scientific research established by big corporations and trade
#### ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE INTELLECTUAL 7

associations harnessed scientific intellect in achieving advances in industrial technique. Even so, much of the driving force of contemporary industrial development in Canada, the United States, Belgium, Italy, Western Germany etc., still comes from outside the educated classes.<sup>1</sup>

The most striking example, in the earlier part of this century, of some sort of intellectual leadership in economic development was that provided by the avant-garde of the Communist Party in Soviet Russia. Lenin, Trotsky, Bukharin, Chicherin, Gorky, Litvinov, Zinoviev, Rakovsky were all intellectuals of a high order. Carrying on the great intellectual tradition of the Glorious Russian Enlightenment--the Russian Renaissance--and seduced by their own utopian visions, it was the intelligentsia (incidentally, the term 'intelligentsia' itself has its probable origin in 19th century Russia), and not the proletariat, that had thought up and carried out the Revolution. And after the Revolution, they not merely engineered the Socialist construction through the political cadres of a semi-militarily disciplined Party but also supplied the necessary intellectual and ideological inspiration. As Raymond Aron puts it with his typical anti-Communist sarcasm, "The emperors of old were often poets or thinkers; for the first time the emperor actually reigns qua dialectician, interpreter of the doctrine and of history."2 In China, not to speak of the leadership of an intellectual like Sun-Yat-Sen in the past, Communist intellectuals-who are both warriors and scholars-like Mao-tse-tung, Liu-shao-chi and Chou-en-lai are now leading her 'great leap forward'. In fact Communist countries perhaps provide the singular case of a determined band of intellectuals (or workers intellectually inspired) sparking off social and economic progress in industrially backward countries.

In the resurgent undeveloped countries of South-east Asia and Africa too, the urge for development and progress is felt, articulated and activised primarily by the intellectuals-the most sensitive and voluble section of the people. But in view of the scarcity of indigenous entrepreneurship and its 'Zero-Sum' orientation, socio-structual variables cannot be relied upon for the automatic creation of the conditions for industrial development, as has been historically the case with Western Capitalism, and the task largely devolves upon the intellectuals themselves. The universitytrained civil servants, engineers (social as well as technical), specialists in exact sciences and all the others who form the so-called 'brain-trust' (which Roosevelt mobilised in his New Deal) are to supply the personnel for industrial progress. Economic planning, industrial management, construction schemes, agricultural research and extension work and the various welfare services-all these will require the active participation of a large

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Edward Shils : The Intellectuals, Public Opinion, and Economic Development, Economic Development and Cultural Change, October, 1957. <sup>2</sup>Raymond Aron: L'Opium des Intellectuels (The Opium of the Intellectuals).

number of intellectuals. The intellectual has to come out of his house-top garret or coffee-house corner.

But emptying the coffee-houses would have very poor returns (both in quality and quantity) unless and until the whole pattern of our education, and more fundamentally, our value system, is reoriented. The need for technical training and the study of experimental sciences and a change in the literary-philosophic bias of our intelligentsia have long been emphasised. Shils has traced the origins of the relative indifference towards science and technology in our classical tradition as well as the traditions set up by colonial administration. He has also drawn attention to the 'xenophile' pseudo-intellectualism so painfully rampant in our coffee-houses as well as secretariats. Intellectual leadership will be fake and misdirected so long as xenophilia afflicts our educated classes, perverts the social tradition and widens the elite-mass dichotomy.

While the intellectuals have thus to remodel themselves according to the growing needs of leadership in economic development, they in their turn have to reshape the cultural pattern of society as much as it is possible for them, and infuse growth-oriented values into it. We know how such dynamic social values, properly diffused, have opened the floodgates of productive ventures in the formative centuries of the now-advanced countries. In the words of Mumford, 'Behind all the great material inventions of the last century and a half was not merely a long internal development of technics: there was also a change of mind. Before the new industrial processes could take hold on a great scale, a reorientation of wishes, habits, ideas, goals was necessary.' This reorientation now in the context of the undeveloped countries has to be piloted by the intellectual class. What is of primary importance is the development of a historical sense and a basic form of rationality among the people. (This rationality need not have its emphasis on accounting and calculation, the zeitgist of capitalism Sombart talked of). Those familiar with the Levy-Parsons scale of social attitudes have underlined the need for rationality in cognition, and intellectuals are to devise systems of thought which permit an open and rational view of the world and instil desire in the people to harness the blind forces of nature or of social systems. It is important to note here how the leaders of the Indian Renaissance tried to galvanise the stagnant society with their concept of secular, human reason-a form of rationality different from that of Hindu logic or of Buddhist disputations.<sup>3</sup> We also know how an attempt was made to 'dynamise' the Hindu religious doctrines and extend them to a more generalised social and national responsibility by Bankimchandra, Vivekananda, Tilak and others. In contemporary Burma too, we have been told how Buddhism which was formerly of an other-worldly

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>D. P. Mukherjee: 'Man and Plan in India: The Background', Economic Weekly, Aug. 15, 1953,

## ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE INTELLECTUAL 9

orientation, is in a process of subtle conversion to a banner of economic advance. Dating far back into history, the gradual change in the tone of religious approval of economic activities in Western Europe from Luther to the Puritans has been noted by Max Weber and Tawney. It is obvious that the social mutation of religious and cultural ideas (and other 'pattern variables', to use Hagen's term) may not be a totally impossible task.

So far we have tried to cover, superficially at least, the more or less familiar ground of the necessity of intellectual leadership and some possible directions in which it might choose to flow in underdeveloped countries. What is perhaps more controversial is the degree of intellectualism most compatible with the commercial and industrial values of an economically progressing society.

The fact that historically the intellectual class--if there is any such class—has not come out for conscious direction of the development process in many important countries is perhaps not without a pointed suggestion, and one is not absolutely unjustified in suspecting something basically antiintellectual in the whole affair. America's industrial advance, for instance, is not totally unconnected with the populist tradition in her culture and her typical distrust of the 'eggheads'. France, on the other hand, is a country with a tradition of intellectual maturity (the Paris of the left Bank is still regarded as the 'intellectual's paradise') and it is not a chance phenomenon that she is lagging behind in the march of Western capitalism. Nor can it be totally explained away by reference to her deficiency in certain basic resources, her peculiar class-structure or to certain familial attitudes. In India too, if one ventures to take an interregional comparison, the economically most developed section of her people is not always intellectually the most advanced, or conversely, the most 'cultured' regions have not been very successful from the material point of view. To come to a more concrete case (even at the risk of rousing provincialist suspicions), we may take the example of Bengal. If someone says that her rather luxuriant intellectual growth (even discounting for the not-quite unjustified imputation of intellectual arrogance to her) and the concomitant attitudinal change have not been very conducive to her material advancement, he is not perhaps merely rationalising the frustration of the Bengalee in the material field, but, I believe, emphasising what is at least a partial truth. It is also remarkable that since the 1920's one can discern a gradual shift in the Indian leadership to those areas more or less affected by the populist ideology of Gandhism (which emphasises moral fervour but not intellectual sensibility); and Bengal, admittedly, has been one of the least-affected areas.

Generalisations are always oversimplifications. Still a hypothesis will not perhaps be quite illegitimate if it states that disproportionate intellectual development (relatively speaking, of course) is in some way not very congenial to material aggrandisement and *a fortiori* to industrial growth.

This is no doubt a very blunt way of putting it. But the broad meaning is perhaps clear. Industrialisation may have its own ethics, but in an advanced philosophy of life they might have no place. The positivist rationalism of industrial civilisation has long proved miserably inadequate.<sup>4</sup> In a developing society apotheosising the cult of science and technology, the intellectual might feel a sense of hollowness (a sense of the 'absurd') and develop a cynical outlook-qualifications which ill befit the leaders of economic progress. The intellectual can hardly be faithful to his job of mass-leadership if his advanced intellect gradually drives him to introversion that This is a state of "critical tension between the produces 'Schizothymia'. person's inner and his outer world which in extreme cases may impair his capacity to maintain normal social contacts. Wherever a stratum of literati has emerged, as Max Weber pointed out, it has shown an inclination towards private intellectual ecstasies, as contrasted with the communal rapture of peasants. This is still true today. The philosophy of contemporary 'existentialism' is basically a product of this process of withdrawal and estrangement from the public realm of reality."5 The intellectual's capacity for social (and economic) leadership is thus limited in a very significant sense.

We have spoken earlier of the intellectual leadership in Communist countries. Now the question can be raised whether the same anti-intellectual bias cannot be discerned in the collectivist-materialist ideological inspiration of economic development in these countries. The development of the forces of production has been underlined as the great theme of history. The Marxist eschatology flattering as it does in Russia the messianic idealism of the Slavs (or in China, the nationalist urges whipped up by centuries of foreign domination), the myth of proletarian liberation and the cult of technique-all these have produced a mass hypnosis for the fanatic endurance of the rigours of rapid industrialisation. (The great 'purges' of the 30's not merely rid Stalin of his political rivals but also purged the Soviet Communist movement of the intellectualism that vitalised its earlier leadership). When the exigencies of Communist industrialisation circumscribe the intellectual horizon to the narrow confines of Marxist-Leninist dialectics, Socialist realism, forced optimism, Pavlovian reflexology and a particular form of genetics and biology, the true intellectual who has not prostituted his soul is bound to feel crushed. Boris Pasternak's is a tragic figure.

If the course of economic development of a society is influenced by

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 'Scientific rationalism did serve man well as long as it was moving towards its false ideals from a great distance. But this could not last. Eventually the truth-bearing power of its absurd ideals was bound to be spent and its stark absurdity to assert itself. This is what has happened in the twentieth century'. Michael Polanyi, 'The Two Cultures', *Encounter*, Sept. 1959. <sup>5</sup> Karl Mannheim: *Essays in the Sociology of Culture*,

## ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE INTELLECTUAL 11

its intellectuals, its exigencies in turn might thus affect the course of its intellectual development. A sociology of the intellectual throughout history shows how he has changed with the change in the 'structure' and 'function' of society. In our times, as the logic of industrial civilisation involves a supersession of culture by technology, excommunication of 'art for art's sake' or pure research, and emphasis on the manipulative aspects of knowledge, the decomposition of the intellectual process is bound to set in. The growing society will no doubt require the services of engineers, factory managers, writers, professors and psychologists. But the continued neglect of humanistic values will ensure it only the supply of technocrats, bureaucrats and the 'engineers of the soul'-not the free intellectual," the full cultivated man. [It is for this, and not, as Mr. I. P. Desai thinks (The New Elite, Economic Weekly, July 1959), for the political constraint of catering to the incorrigible spiritual sensibility of the Indian people, that our politician-intellectuals like Nehru and Radhakrishnan 'rarely miss an opportunity to emphasise humanistic values' after 'justifying, eulogising and supporting science and technology'].

This paper is not meant to belittle in any way the imperative necessity of the intellectual's leadership in the under-developed countries now launching out an industrial career. On the contrary, it has already emphasised that in unequivocal terms. In fact, it was the 'creative minority' to use Toynbee's term, that has always solved the problems of man in history. Once more in the hands of one such creative group has devolved the task of pulling the backward economics out of the quagmire of stagnation and gear them on to the path of economic prosperity. But always it has to be remembered, as Tawney once cautioned us, that economic ambitions are good servants, but they are also bad masters. Harnessed to a social purpose, they will turn the mill and grind the corn. But the question to what end the wheels revolve still remains. This is the big note of interrogation of our age.

Also Polanyi, loc. cit., 'Scientific obscurantism has pervaded our culture and now distorts even science itself by imposing on it false ideals of exactitude'.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Readers of Ortega y Gasset's *The Revolt of the Masses* will remember his concern about the implications of technicism. To him, the scientist was the prototype of the mass-man, a 'learned ignoramus' incapable of understanding the complex historical and cultural factors which were necessary for the creation of modern society.

# On Saying No

#### SAMIR DAS

#### Fifth Year, English

One half of the troubles of this life can be traced to saying yes too quick and not saying no soon enough.

- JOSH BILLINGS.

Are you one of those people who find it difficult to say no? I am. I find it next to impossible. And the money it costs me. And the time. Plus the worry. My goodness!

I suppose those people to whom one ought to say no admit of a twofold classification—friends and strangers. Take the strangers. Some time ago a man landed on my doorstep with a huge string of onions. He had a bicycle with him and the onions dangled from the handlebars like a bunch of outsize grapes. He had come from Bihta, he said, him and the onions.

Now I didn't want onions; and even if I had, I could have bought them from the greengrocer across the street. But there was something singularly tragic in the contemplation that this man had pedalled all the way from Bihta to Patna just to sell me onions. And the cold fact that onions were available locally made the tragedy all the more poignant. Somehow he reminded me of that frail, old, Wordsworthian character of *Resolution and Independence*, undaunted by the batterings he had received, carrying with him his own fortitude and the necessities which an unjust state of society had laid upon him.

And so, as you have imagined all along, I bought those onions, a whole wedge of them. That was nearly a year ago. Most of them are in the larder still.

Then there was that water-softener man. This loony had the impertinence to stand on my doorstep and tell me that my water was hard. For a nominal charge, he hastened to add, he would soften it. (Somehow or the other it was firmly ensconced in his gray matter that fifty rupees was a paltry, insignificant sum that I could without the slightest of misgivings bestow upon his humble self for the inestimable good he would do me). I contested his attitude. I denied point-blank that my water was hard. But the man was manifestly made of sterner stuff. He produced facts and figures. He embarked on a laudatory discourse about acidulous waters, hepatic waters, sileceous waters, chalybeate waters, ferruginous waters, and goodness-knows-what waters! Honestly, I would have given

#### ON SAYING NO

in at this stage but there was no denying the man's oratorical onrush. He spoke at *some* length about ordinary scaps consisting of the soluble sodium salts of stearic acid, palmitic acid, and oleic acid; and finally ended with some tripe concerning the use of sodium hexametaphosphate in the "Calgonisation" of water ("Whew !", I muttered under my breath, "that sure *was* something.")

Frankly, half of what he said was unintelligible gibberish, but by the time he had finished I was convinced that the next time I took a bath I should emerge from it black and blue with bruises. I didn't particularly cherish the prospect of massaging my painful body all over with "Iodex". I instantly bought that miracle contraption—the water-softener.

There are other people who ring the doorbell, men with combs and laces, salesgirls with anything ranging from toilet soaps to curry powders, organisers of Church fêtes, nuns and children. If I find it difficult to say no to men with combs and laces, I find it totally impossible to say it to nuns and children. To do so would be morally reprehensible, almost caddish, like hitting a man when he's down. The nuns and children instinctively seem to feel this, for they certainly gravitate to my door in ever-increasing numbers; and they seldom go away empty-handed.

Nor do my troubles begin and end at home. Sometimes I walk into a shop to buy, let us say, a shirt. As the assistant wraps up the shirt, he says, almost casually:

"Anything else today, sir? Vests, bush-shirts, trousers, ties?"

Now, when I entered the shop I did not have the slightest intention of buying anything but this shirt. Bush-shirts and ties were farthest from my thoughts. But of course, it is true I need some more bush-shirts. Yes, I say, bring me your bush-shirts. Ties? Let me have a look at them, too.

My experience with the barber is even more mortifying. When he has cut my hair he casually suggests: "Now, sir, how about a nice little shampoo?" Note how cunningly the word 'little' is interposed: it will take a second, it seems to imply, and will cost you next to nothing.

Now, if I happened to be a No-man I would reply quite simply, "No, thanks," and leave it at that. Even if I was but half a No-man I would say, "I don't believe I really have the time, thank you," or "Not today."

In any case I don't *want* a shampoo for the simple reason that I can wash my hair for nothing in the lovely soft water I have at home. But I am afraid that the barber will think me at best dirty and at worst mean; so I reply: "A shampoo? Why, that's the thing. Splendid." And another fiver goes, almost literally, down the drain.

If this is the sort of mess I land myself in with strangers, it is far worse with friends, for with them one's sense of obligation is stronger. Not real friends, of course, to whom one can say just anything, but would-be friends, acquaintances who one thinks might become friends and, as things turn out, don't.

Last autumn, for instance, a would-be friend requested me to spend a week-end at his cottage in the country. I eagerly looked forward to this visit, to the would-be friendship blossoming into a real friendship. But no sooner had we finished our lunch when he came forward with the startling suggestion: "I've nothing laid on this afternoon. I thought we might chop up some firewood."

Now that was a little too much. If there's one thing in life I really can't abide, it is chopping up firewood. (You see my physique does not exactly appreciate this brand of nuisance). But what could I possibly do? Say I didn't feel like it? Pretend I had a pulled muscle? No, it was as clear as daylight that there was nothing to do but chop up firewood. And not only did I lose a beautiful would-be friendship but very nearly two fingers of my left hand as well.

Dinner invitations are another thing. Sometimes I run into a wouldbe friend (would-be on his part, not mine!) who says:

"My wife and I would like it immensely if you could dine with us sometime next week."

I say I am not quite sure what I'm doing next week. But the man is not to be repulsed. He would ring me up in a day or two to find out, he says. And sure enough he does.

"About dinner," he barks into the phone, "we can offer you Monday, Tuesday, Wednesday, Friday and Saturday."

"That sure is bad luck," I respond politely. "I've rather a full week, and as it happens Thursday is my only free day."

"Oh, that'll be all right," he says, "I'm sure we can shift our programme a little to suit you. Please hang on a little while I have a few words with my wife."

I instinctively realise that any such consultation is unnecessary. There is simply nothing that can come between them and me and Thursday. And nothing, to be sure, does.

Clearly I am not the right sort to write an article about saying no. I do it so seldom. Yet I can think of plenty of people who would write such an article admirably. Chou-en-lai, for instance. What a corking piece he would write.

And civil servants. They could certainly furnish us with tips. And policemen on parking duties. And people who are supposed to sell tickets for test matches and shield finals. And girls, yes, very young, very attractive unmarried girls. Now there *would* be an article worth reading.

14

## Pure Poetry

## PARITOSH SANYAL Fifth Year, English

Life was none-too-short for A. E. Housman to concern himself with the 'Name and Nature of Poetry', and A. E. Housman is a celebrated poet. The bare fact is by itself a sufficient reason why in no discussion of pure poetry his view on the subject can pass unnoticed. For, when a poet —especially a poet like Housman—comes to talk about poetry, he has 'nature's prerogatives' of course. But prerogatives at times lead to a total loss of reason.

His essay on Reading Poetry is strangely provocative. It so completely overlooks the problem quite intimately associated with creative activity. Pure poetry, he maintains, will suffer no obtrusion from any 'extraneous' element like nobility of sentiment, greatness of the subject, meaning, philosophy and other things of the category. Pure Poetry is exactly the sort of poetry which has, he thinks, only an emotional impact on the percipient.

But the experience poetry expresses is part of the total imaginative experience of the psyche. When these emotions rise to the conscious psychical level and clamour for an expression they cease to be pure emotions. Relational activity of the mind co-ordinates one individual experience with another and thus turns the whole process into a significant pattern.

So it is that when Housman declares the following piece of poetry to be entirely immune from the degrading element of intellect, one is not sure whether he is talking sense:

> "Tho' thou art worshipped by the names divine Of Jesus and Jehovah, thou art still The Son of Morn in Weary Night's decline, The lost traveller's dream under the hill."

-All this is fine. But one is not sure whether it is free from the intellectual element and whether it is independent of the subject too. Over the first three lines you will probably sway in an emotional stupor, if you happen to be of mawkish disposition; but when you come to the fourth, you will have to be a little alert: You will pause, and ponder, and relate 'The Son of Morn' to 'the lost traveller's dream under the hill' for a genuine appreciation of it. To put it the other way about, the whole affair gains in emotional richness only when you have succeeded in relating these two images, and this relational activity is intellective. However much thin, the

intellective element is always present in an expression of emotion. Now this emotion, even though it is very finely distilled, is not independent of the 'subject'. The subject, in case of poetry at least, means something very different from the episodic content. The subject in poetry refers to the whole imaginative experience that leads to the genesis of poetry. When this imaginative experience is particularly rich and significant we have poetry elevatingly expressed. The emotional content is therefore not independent of the subject, nor is poetry purely emotional. Pure poetry, as Housman understands it, can then only be found in "the Lydian melodies of Beethoven's music".

Indeed, Housman's view suffers from an innocence of the fact that poetry has a composite organic character and that one can hardly disengage the constituent elements without doing prejudice to it. For, what exactly do we mean by the word 'pure' used in connexion with poetry? The word as used elsewhere refers to something 'not-pure' and carries with it an idea of the capability—at least formally—of disengaging the inferior degrading elements from it. When the word serves to narrow down the socpe of a specific literary act like poetry, it possesses no such meaning, however. It refers rather to its composite, unified character. That is why, when Housman says that pure poetry is independent of verbal music, nobility of sentiment, greatness of the subject, tyranny of the intellect, and a thousand other like things, he seems to misconceive the character of poetry as well as the specific application of the word 'pure' here.

For a more sensible approach towards the subject one feels very much indebted to Middleton Murry, although, I will confess, I have found his idea of pure poetry rather inconveniently wide and inclusive. According to Murry, pure poetry "is the mating of the word to entire mental experience of thought and emotional field experienced as one....." But, let alone pure poetry, is not all poetry an act of mating of the word to the mental experience in its totality?

#### "We are such stuff

As dreams are made on, and our little life

Is rounded with a sleep"—of course, it has brilliantly "fixed words" upon the mental experience in its entirety. But is not the ejaculation, 'we are like dream' of a man who is half-way towards one of the dark verities of life, in its own way (—I will lay stress on the phrase—) a perfect fitting of the word to the mental experience in its totality? But is it poetry on that account?

Murry's position is, in fact, a little peculiar: any stuff that has found the right words for the total mental experience is poetry, and pure, too, for the very same reason. I am afraid the logic is not sound. Indeed, if weather-saws and nursery rhymes are not poetry, while Dante's fusion

16

### PURE POETRY

of Thomistic philosophy in poetry is an excellent thing, it is not that in the former instances the word has been ill-mated to the entire mental experience. It is rather because the weather-saws and nursery-rhymes kiss the earth too earnestly.

In order that it may be worth the name, poetry must call up the right word for the unified mental experience. But everything that does so is not poetry, and even when poetry, is not pure poetry. Murray's critical formulation does him an evident disservice by making a curious implication that any poetry, if it is poetry at all, is pure poetry. To this Murry would probably retort (and actually he does as much) that pure poetry is what so places the word as to bring out the mental whole in all its vividity. The qualification, however, would at best mean that anything that can bring out vividly the mental whole by mating 'the' right word to it is poetry, but would not prove his corollary to be true. Murry's definition is, indeed, like a misshapen cap that fits anybody in general but nobody in particular. It very well points to the composite, unified character of poetry, but does not get one far towards pure poetry. What is pure poetry then? Poetry that retains this character in the maximum possible degree is pure poetry.

Let us now try a few instances and see if they are 'pure' :

"Memory hither come And turn your merry notes; And while upon the wind Your music floats I'll pore upon the stream Where sighing lovers dream, And fish for fancies as they pass Within the watery glass"—

This is fine: I am prepared to go thus far and no further to call it pure poetry. Why? The answer may be found in Housman's own reasons for calling it pure poetry: "That answers to nothing real; memory's merry notes and the rest are empty phrases, not things to be imagined; the stanza does but entangle the reader in a net of thoughtless delight". Again, that much-too-handled line of Keats—"A thing of beauty is a joy forever." This is a categorical statement cum verbal felicity; and I have nothing to say against its sheer poetic quality. Further—

> "As proude Bayard ginneth for to skip Out of the way, so pricketh him his corn Till he a lash have of the longe whip, Then thinketh he, 'Though I prance all biforn, First in the trace, full fat and newe shorn, Yet I am but an horse, and horses' law I must endure and with my feetes draw.'"

-This is rather beautiful in its naive, lisping way. But the false note of intellectualism seems pronounced as one sees that Chaucer is here illustrating his own conception of 'law of kind' by a superimposition of rationality on a 'cornfed horse'. Furthermore—

"A little learning is a dang'rous thing; Drink deep, or taste not the Pierian spring."

--I will admire the versification, the neat symmetry of the couplet, the earthy sagacity that underlies it. But this is not pure poetry. Poetry here exhausts itself as soon as the meaning is laid bare. It cannot retain the organic compositeness.

The instances just considered are nothing if not fine. But none of them has that particular property we are looking for—that absolutely complex and homogeneous character which is the absolute attribute of pure poetry. There is that mating of the word to the mental whole which Murry so urges. But the absolute unity of thought and emotional field are not to be found in them. Now consider the line in which Housman did not find pure poetry. "Fear no more the heat o' the sun." My sympathy, however, all goes to this cast-away decanter. It gives us the very thing we are looking for. It gives poetry unadulterated. This is a unique amalgam of Mozartian simplicity and grand morality, of spiritual serenity and smooth-flowing rhythmic unity, of the religion of man on earth and his rationale of it, too. Here is that absolute unity. Here or nowhere is pure poetry.

Indeed, it is this sort of poetry alone that can retain its unified character in the highest degree. Pure poetry is, therefore, the sort of poetry that employs significant symbols. Of course, poetry itself is a symbol—symbol of unity, of coherence in the midst of chaos, of a gleam from the world beyond that we would so love to inhabit. And in pure poetry I would like to have symbols twice imposed.

I am reminded that roughly from 1919 to 1928 the swan is a recurring symbol in all significant poems of Yeats. The poet had gone through a long deep meditation, resulting from spiritual cross-currents, before he actually employed the symbol. This explains why in 'The Wild Swans at Coole' the swan should be the symbol of changeless passion, of solitary pride in 'The Tower', and of the voyage of the pilgrim soul of man in 'Nineteen Hundred and Nineteen'. This is just as it should be. For, a symbol is the result of a fusion of all the levels of consciousness into something extra-mental that has gained in richness through long subconscious associations. One example will suffice:

> "Or that of the hour When the swan must fix his eye

Upon a fading gleam, Float out upon a long Last reach of glittering stream And there sing his last song."

One aspect of symbolism, as Herbert Read points out ('The Meaning of Art') is "a disintegration of the intellect or reason." "The artist, whether poet or mystic or painter, does not seek a symbol for what is clear to the understanding and capable of discursive exposition; he realises that life, especially mental life, exists on two planes, one definite and visible in outline and detail, the other—perhaps the greater part of life—submerged, vague, indeterminate. A human being drifts through time like an iceberg, only partly floating above the level of consciousness." The artist tries to "realise some of the dimensions and characteristics of his submerged being, and to do this he resorts to various kind of symbols". That is why, I will conclude, pure poetry is symbolist poetry—poetry where the composing elements are all dissolved and thus turned into another complex, indissoluble, organic unit.

## Pirenne and the Decline of Antiquity

## DILIP KUMAR CHAKRABORTY Fourth Year, History

As an economic historian Professor Pirenne's research was mainly on the early 'decay' and the subsequent 'revival' of the Mediterranean trade and commerce. It is the former problem which forms the theme of his posthumous publication 'Mohammed and Charlemagne'.

According to Pirenne, "of all the features of that wonderful human structure, the Roman Empire, the most striking, and also the most essential was its Mediterranean character. Although in the East it was Greek, and in the West it was Latin, its Mediterranean character gave it a unity which impressed itself upon the provinces as a whole. The inland sea, in the full sense of the term *mare nostrum* (our sea), was the vehicle of ideas, and religions, and merchandise", (Page 1). In the words of Pirenne again, "thanks to the Mediterranean ..... the Empire constituted, in the most obvious fashion, an economic unity. It was one great territory, with tolls but not custom-houses. And it enjoyed the enormous

advantage of a common monetary unit, the gold 'solidus' of Constantine. containing 4.55 grammes of fine gold, which was current everywhere". (Page 3). This situation continued upto the eighth century. The Germanic invasions destroyed neither the Mediterranean trade nor what may be regarded as the truly essential features of the Roman culture. But the situation changed owing to the advent of Islam. By the middle of the eighth century the Arabs had planted themselves on all sides of the Medi-They had got hold of the coast of Asia Minor and the north terranean. of Africa. They also controlled Spain, Sardinia, Corsica, Sicily, and the "The Christians" said Ibn Khaldun, "could no longer float Balearic isles. a plank upon the sea". The occidental trade and commerce were choked. Western Europe had to fall back upon its own resources. Land gradually became the main wealth. The consequent social change was soon discernible. "It was the end of the classic tradition. It was the beginning of the Middle Ages and it happened at the very moment when Europe was on the way of becoming Byzantised", (Page 164).

Pirenne's argument is written in his usual provocative manner but it seems to evade a few problems which must be considered if we are to accept his thesis.

According to him the transformation of Western European society began in the eighth century A.D. and that also was due to a totally external factor—the advent of Islam. But we know with certainty that "this transformation of society in the western provinces of the Empire had already begun as far back as the end of the second century A.D. Its leading feature was the decline of the municipalities and of the middle-classes and the reformation of society on the basis of two classes of landowners and peasants".<sup>1</sup> Slavery was no longer productive. It led to technological stagnation. The free peasants and the slaves of the empire were gradually transformed into serfs.

We should also note that the dependence of mediaeval Europe on land was not due to the 'bottling up' of the west; it was due mainly to the drainage of gold to the east which started as early as the first century A.D. Professor Trevor-Roper elaborates it beautifully: "It was a drainage of gold that reduced Europe to its natural dimensions in the world. The Romans, a poor but warlike tribe, had conquered the gold and thereby the trade of the world, and drawn it westwards; now by a 'perpetual haemorrage' it had run back to the East. There was no purchasing power in Europe nor the military power to recover it", (*Historical Essays*). The fact that the far-flung luxury-trade of Rome must have carried away an enormous amount of gold from her is now beyond dispute. Pliny's lament is well-known. How was the Roman currency fitted into the alien economics of recipients far beyond the boundaries of the Roman Empire? On

<sup>1</sup> The Making of Europe: Dawson.

20

the basis of archaeological evidence, Mortimer Wheeler thinks that "for the most part, it was employed not as currency but as bullion". (*Rome Beyond the Imperial Frontiers*). Thus the disappearance of the gold coinage modelled on that of Rome during the seventh or eighth centuries was doubtless owing to the necessity of paying for imports from the East, with an adverse balance of trade.

The Arabs, then, did not have a big role to play in this transformation. The 'Middle Ages' began not with the coming of the Arabs, but with the internal process of change (partly resulting from the non-productivity of slavery and partly from the decline of trade and commerce due to the drainage of gold) that had been going on in the womb of the Roman society itself. Pirenne is wrong in ascribing this transformation to an external event like the advent of Islam.\*

# The New Moon: A Sketchy Sketch

Syed TANWEER MURSHED Fourth Year, English —and Satellites

It would appear that in so far as the students of Fine Arts and specially of Poetry are concerned, the moon being brought within easy reach of the earth would be undesirable in the extreme. And it is with growing apprehensions, no doubt, that students of Poetry are viewing the spaceflights of rockets, and vanguards and sputniks. They completely ignore the fact that man has made tremendous progress in the field of technology (both in the horizontal and vertical directions !), and instead of applauding their incontrovertible skill and ingenuity, they assume a lugubrious look, for the existence of the Muse it at stake.

Others abide their question, but the moon is free. So far we have succeeded in discovering next to nothing about it (or should we say 'her'?).

The classical attitude was largely determined by the fact that the moon had so long remained behind an impenetrable veil of mystery and awe. It had defied investigation: it was an enigma. And poets like nothing better than mysteries and enigmas.

<sup>\*</sup> The pages referred to in this article are from 'Mohammed and Charlemagne', New York, 1957.

An examination of the history of Poetry will reveal that the moon. and the entire solar system, has been a subject of poetry through the ages. It has been associated with romance and mystery, and multifarious virtues and qualities have been attributed to it. From the times when Sir Philip Sidney looked at the moon and spotted the resemblance between her inconstancy and his mistress', from the times when Kent made sops-o'-th'moonshine of an occasional Oswald or two and aired dark intentions of sending them cackling to Camelot; to the time when she shone on the Empress<sup>1</sup> of Blandings, worried at the sudden (and unexplained) increase in the number of Parsloe-Parsloe (Bart.)s, infesting the Castle, and when, like a strong, silent goddess, she presided over the courtships of Barmy Fotheringay-Phipps and Catsmeat Potter-Pirbright, the moon has held her ground unchallenged. Incidentally, Keats and Coleridge attained supreme imaginative heights in describing the moon which served the chambers of Madeline and Christabel. One reads of lovers flying in the moonlight in Keats' "Eve of St. Agnes". Modern lovers do not fly: one can visualise a pair of them strolling in Hyde Park of an evening. "The moon", says the young man, pointing it out with his umbrella. The girl says that she had noticed the moon. So saying, they pass on their way. But the good old days are gone, or rather, going. Today the Explorer photographs the wrong side of the moon.

The student of Poetry would not like this state of affairs to exist, for what disappointments will be attendant upon a knowledge of the truth one does not know.

I, however, have no such apprehensions. The soul of the poet should, by the very definition and conception of the term, be adventurous. We have taken it for granted that a knowledge of the moon's activity will mean for the poet a loss of poetic subjects. This is not quite correct. For aught we know we may discover some unthinkable and unimagined beauties on the moon. Instead of losing we shall make a positive gain.

In passing, a point. The moon classically was "luna"—hence lunatics. Undoubtedly the lunatics—the modern "moonstrucks"—would welcome a comradeship with the moon. The ancients, we are told, looked at the varying aspects of the moon and predicted the weather. Possibly the tradition is indirectly carried on in modern weather-forecasting circles. Joy and gladness shall be theirs. They look forward to "Moonbeams from a Larger Lunacy".

22

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The porcine heroine of the Blandings Castle Novels of P. G. Wodehouse. Herbert Jenkins. Crown 8vo.

## Encounter

## SASTHIBRATA CHAKRAVARTI Fourth Year, Physics

She was boarding a tram, the day I first saw her by chance.

It was Saturday afternoon. College had just given over. There was a slow viscous drag in the air. The day had spent itself. There was nothing new about this particular Saturday. It had started as always, with a pregnant, insistent Sunday quivering behind. It had lashed and fumed in hopeless despair, as before. And now suddenly, it whimpered out, tame insipid innocuous. Saturday was gone. What remained was its inert corpse, meek and passive but odious. I strove out of College into the thick of this nullity, thoughtless. It was the same dead scene. Those little grey urchins in loin cloths confronted me at the gate, persistent and demanding. I wished to evade them and hurriedly scuttled across to the pavement. One little fellow followed. Tenaciously he pursued me. Here and there among the maze of drifting men he tried to square me. But I dodged him well. Till finally we came to the terminus. Then I was caught. Trapped between his impotent beggar's bowl and that queer burning sensation that revolts against 'Resist no evil'. I couldn't fling him pity even in the shape of a small copper coin. I would have to escape! Escape from the vicious clutches of this gigantic inhuman robot that was masticating me, moment by moment, into shapeless protoplasm. When unexpectedly my tram came. He knew I would be free of him at last. He knew that he would have to let me go. He hated the tram for coming now. So he caught at my leg and tried to tag me with him. I was made helpless. A flush of red hot anger swept through me. I kicked him and jumped inside. Just then, I saw her getting in as well, into the same tram. Shot; I bathed myself out of passionless lethargy, embarrassed, ashamed, but as live as an electric wire.

She had whipped me into a living, thinking, human being with pride and passion. Her cool impassive stare had churned the depths of conscience in me. I wanted to come to terms with her. I could not wage war on all fronts. I was too weak for that. And it was futile to attempt to pierce her inhuman mask as a foe. She could not feel. That is why the girl in her was so enchanting. There was lure in her mystery.

It happened again and again. This tram ride together. She seldom spoke. She did the same things with ruthless, automatic regularity. Waited for her tram at the same wearying time. Stepped into it with the same monotonous propriety. Took her seat in the same pontifical

manner. She was too perfect. Too rigorous to be human. So that she was almost a deity. Strangely alien in a frail erratic world. So remote that one could feel her inert body, soulless. She took leave of herself whenever I sat beside her. Yet she held me strangely. I could not fight her as I had fought all my women before. I wanted to be at peace with her. For she was not a piece of cloud being wafted in the breeze. She had a mind. She could give me anchor.

'You like formality?' I queried one day. Her dark heavy lashes shot up instantly, alert. I persisted with a smile. Pensive, resentful she stared at me. As though I had surprised her in privacy. There was a brooding depth in those wide black eyes that haunted me. I wanted to scream and run away.

'Sorry', I said, 'I'm sure you do'. Those words rolled out of my lips, unconscious and ashamed. I felt bitter with defeat. She was isolated, neutral, self-sufficient. Intrusion she despised. A slow scorching hatred piled up in my throat. So that I could no longer speak. But croak.

We continued in the same tram together. Usually I got down at my own stop and she went on alone. Today I decided I'd follow her. I was so steeped in shame that I sought to be reckless. This cold block of stone by my side, incited me. She was so self-contained that there was no way of mortifying her. I was helpless with rage. My home-stop came and flew past us. I did not get down. Her full deep eyes were set in scorn as she threw me a measured glance. I felt as if an arrow had pierced me. I winced. This made me foam with anger. 'I would see the end of it', I thought.

A slow dreary scene slid past our window. There were the same halfdead men who had wound their watches at six in the morning; the same half-stripped women; the same smothered children. Altogether the same insipid world that had brushed past this window yesterday, last week, last year. And yet she looked out into this deadly monotony, calm, unperturbed, almost dead herself.

She lived on the outskirts of the town. We went as far as the tram could take us and got down. She spoke hostility with her eyes. I was a stranger whom she had known only for a month. She saw me everyday yet persisted in denying my existence. I knew she could not hold out much longer. You cannot fight a man for long if he wishes to be at peace with you. She had reached her last tether. Her defence was about to crumble. And so she was making a last desperate effort before surrender. I walked apace with her.

She turned into a narrow mud lane that branched from the tarred road that brought us from the city. Small happy cottages guarded us on either side. Walls of caked mud and dung hung contentedly on the

24

#### ENCOUNTER

bamboo skeletons of these slow leisurely homes. There was peace here. And a strange cool quiet that almost intoxicated. I loved her instantly.

We walked slowly. She was resigned to me. Some men watched us with curious hungry eyes. I was discord in their harmonious, ordered lives. They could smell in me the garbage of the world that gave me birth. I spelt anarchy to them. They would never approve of me. Nor of her either, if she accepted me. They could not be like her indifferent. They could feel. They knew I was alien to them. Unlike her, they would try to crush me, not remain impassive. They would wipe out this speck of dirt from their clean sluggish lives. She would only soil herself by taking me. Not become dirt herself.

We came to a small green pond. From its edges long lean trees crept uneasily into the sky, swaying gently with the soft breeze that brought the smell of earth from over the fields. Their leaves rustled and sang a tune to the mellowing sun. The pond was silent. The water was green and dead. There were no rippless. The broken steps were covered with moss and jelly. I stood still for a moment. Its death incited me. 1 could not allow a dead pond to go on living. Next moment, the pebble had pierced the dead green skin. I saw the small hole getting bigger and bigger till there was a large patch of clear cool water that lay beneath all the time. Slow dark women with sagging breasts came to fill their pitchers with water. I turned and caught a small smile being rushed out of her lips. Our eyes met.

'Why don't you go?' she faltered, 'you cannot come with me any further'. I knew I had begun to win. Her voice hummed a smooth melody that ravished me. There was lure in her eyes. The strange sad sun had turned to liquid gold. The air was taut with victory. Evening came with slow measured steps. I could not look into her eyes. They hurt me. For a moment I couldn't think. The thick rhythm of village songs crept into the still horizon which was spotted with small dark dots. The farmers were coming home. One second paused, puffed itself and became a minute. And still more time passed. We stood staring at each other. 'We shall meet tomorrow ?' I wondered. She nodded swiftly and vanished. There was darkness around me.

I plodded back through a heavy world. Thick black clouds flew past the sparkling face of the moon. There was a whistling breeze that tousled my hair. Shadows frisked and spelt a strange nostalgia. I thought I was going to be happy. My brooding thoughts slid quietly into a small dark corner of my mind. I felt a sudden warmth spread itself over me. Peace filtered slowly into my body. I walked softly. The dazzling neon lamps flickered on and off at pleasure. Screeching of unoiled brakes vaguely sought to make themselves heard. The racing city blurred into the distance, slow, leisurely, almost non-existent. I was with myself. I felt strange and unliving as if under chloroform. There was that same cool air around me.

I watched the night slowly glow into a bright, bubbling dawn. My hopes flew and spread themselves across the skies. I would talk with her at the tramstop that evening. I would tell her of my dreams. I would be one with her at last. I could not wait any longer. The dead day strove impatiently against me. The hands of the clock spun their hours in slow, revengeful monotony. But evening finally came.

I waited in vain. She did not come to the stop that day. Nor the next day either. Nor even the next. A whole week passed. Each day clawed its hungry toll of despair from me. Some delicate gossamer broke into pieces within. And its sharp splintered edges dug wounds of sorrow in my heart. Yet another week went by. I had not seen her all this while. Until I found myself on that narrow mud lane that branched from the road. Those same lowly huts drooping with melancholy. That old green pond, dead and mossy, with weird trees fanning the breeze. And then, like thunder, she burst into my vision. Her head was covered. She was carrying away a pitcher of water. For a moment she looked at me. The new round vermillion mark on her forehead, spoke with dull fatigue. A still quiet street broke through her eyes. She walked away with slow, wistful steps.

They had seen her speak to a stranger. They had glimpsed the face of a raw and eager world in me. They feared she had been stained. They wanted to keep her inside their little huts of mud and dung. So they had her fettered. Now she was safe for them.

A breaking tide wanted to splash my eyes with tears. I walked away, penitent.

# Betrayal of Democracy Between the World Wars

### PREMENDRA ADDY Fifth Year, History

The conflagration of 1914 helped to set off the first major upheaval in the social order which had dominated the World, more especially Europe, since the French Revolution. It was a social order wherein economic power was concentrated in the middle and upper classes, and used by them to safeguard their privileges. But as history has made clear, the bourgeoisie were never powerful enough to overthrow the feudal aristocracy itself. To do so, it had to invoke the aid of the masses, and that in turn involved the development of capitalist democracy. While the masses possessed the formal shadow of political power, its substantial re-

sidue remained with the owners of property.

For the last hundred and fifty years or so, history has been operating on two interdependent planes—that of economic organisation and that of political organisation. It chronicled the immense growth of the power to produce and of capital accumulation. "But", to quote Prof. Laski "because the power to produce must mean by the logic of that system, the ability to sell at a profit, and because, by the same logic, the incentive to accumulate depends also upon the ability to invest profitably, the drive of capitalism is always to the widest possible market in which the highest profit can be found".

At the turn of the century rival imperalisms competed with one another to exploit the major resources of profit. Upon their ability to obtain that power depended their chance of maintaining the uneasy equilibrium between capitalism and democracy. The absence of this equilibrium would compel them to make a fundamental reorganisation of their political systems. Here lies the root of the 1914 conflict. It was a struggle for markets between the rising power of Germany and the allied empires threatened by that power. Complexity was added to the struggle by the minor motivations of national solidarity, dynastic ambition, the fear of socialism and racial affinity. But in essence it remained a conflict of rival imperialisms bent on obtaining control of the major unexploited sources of profitable enterprise. As such the peace of 1919 was an uneasy one. It was indeed more in the nature of a truce, and it lasted but twenty years.

The background of this peace was marked, above all, by two essential features. The first undoubtedly was the Russian Revolution. A

ramshackle autocracy collapsed under the pressure of defeat and a new economic class found itself in possession of state power. Like its predecessor of 1789 the Russian Revolution was an explicit threat to the existing social order: It brought to a head that conflict over the place of property in society which had been a matter of fierce debate ever since the development of the factory system had made possible effective trade-unionism, whose members, by and large, had linked their political aspirations to socialist doctrine.

The second feature of the peace was the transformation of Germany into a capitalist democracy with a responsible system of Government. It meant a Germany riddled with contradictions which its leaders found insoluble. The concessions desired by the democracy in the social sphere, were made impossible by the economic distress within the capitalist framework. The privileged classes wanted security and strove to recover the prospect of profit; in this they were thwarted by the price exacted by defeat and the general economic misery. The presence of a large standing army of unemployed, the destruction of the middle-class savings in the inflation of 1923, the insulting invasion of the Ruhr, all combined to deprive the democratic system of its roots in the affection of the German people. The failure of the Government to satisfy any class deprived it of the authority to govern with determination. The Communists despised it, business enterprise hated it, the old junker class loathed it, while the main body of civil servants and ex-officers whose minds and habits were shaped by the traditions of previous régimes, remained inveterately disloyal to it. Democracy born in humiliation was nourished in failure. Thus, it could hardly take root in a soil unfavourable to the growth of that agreement upon fundamentals in doctrine which, as Mr. Balfour so rightly pointed out, is the condition of success in democratic practice.

The impact of the Russian Revolution was by far the biggest single factor behind the cleavage in post-war society, a cleavage which manifested itself both in the internal and the international scene. The fierce and suspicious bourgeoisie were roused. It began to be pointed out that the price of social legislation was more than the system could afford. Some considered that too many people were being educated beyond their station; they were even beginning, said an eminent churchman, to compete with the children of the middle-class for the best positions in the State. Then again, too many people were beginning to concern themselves with politics; that was an occupation for the few and the many should devote themselves to religious faith in which could be found consolation for the inadequacies of this world. What is certain is that in the period after 1919 there was a widespread fear that property was in danger from Democracy. The working of the economic system did not satisfy the masses; and there was a profound fear that the masses might use democratic institutions to trans-

## BETRAYAL OF DEMOCRACY BETWEEN THE WORLD WARS 29

form the economic system. Then again, there was the discovery that the weapeons in the hands of the owners of property were far more formidable than had hitherto been imagined. If progressive governments attained power, they had only to withdraw their confidence, and the authority of such governments was rapidly impaired, in 1924, and 1931; it was true of France in 1924, 1928, 1932 and 1936. It was true of the Roosevelt administration in the U.S.A., where Mr Roosevelt had either to sacrifice or water down his major experiments in order to secure the co-operation of the privileged classes. But if as in Germany, Austria, Italy and Spain, the masses did not show signs of accepting the permanent title of those owners to their privileges, they took the direct step for the preservation by suppressing the democratic institutions which seemed to threaten them.

The lesson of the post-war years was a simple one. It was a lesson that the acceptance of democracy by capitalism was conditioned by the implicit understanding that the concessions demanded by the former must not cross the limits deemed reasonable by the latter. The conception of what was reasonable was limited by two factors-the economic crisis on the one hand, and the profound fears engendered by the Russian Revolution on the other. The effects of these were momentous. There was a panicstricken search by property for security; though many of the measures they took in the interests of security only enhanced the sense of insecurity. The result was tragic in that, while the people of the world were hungry for peace and security, they were offered a bleak horizon of insecurity and war. The civilization that was built upon the ruins of mediaeval Christendom ended in division and disillusion. Private interest triumphed over public interest, and it used the state-power in a reckless effort to preserve its privileges. The traditional wisdom of bourgeois society broke down because its operation no longer sheltered the masses from the icy blasts of life in the conditions they deemed adequate to their claims.

These characteristics emerged more clearly in the international politics of the western democracies. On the outbreak of War few democratic statesmen doubted that the régimes of Hitler and Mussolini were a threat to everything good in civilisation. But all that they threatened from September 3, 1939, onwards were the very things they had threatened continuously since their seizure of power. From 1933 the democracies had painful evidence of the ruthless and limitless ambitions of these two aggressive tyrants. They heard the cries of their victims. They were urged to organise collective security against aggression; but according to Mr. Chamberlain, even economic sanctions were examples of "midsummer madness". Austria, Spain and Czechoslovakia were sacrificed in grim succession at the altar of Fascist greed. Then followed the lame guarantees given to semi-Fascist states like Poland, Greece, and Rumania. In the absence of an agreement with the Soviet Union these guarantees could be

little else. Nor did they, except in the eleventh hour, discuss with the Soviet Union the possibility of joint action against aggression. It is instructive to analyse the reasons which lay behind this attitude.

Before the outbreak of the War Hitler and Mussolini had commended themselves to the forces of privilege for two reasons. In the first place, they had crippled working-class institutions and, thereby, had rescued the forces of privilege from the insecurity that these implied. In the second place, they represented themselves as the fervent opponents of Bolshevism. Two implications may be drawn from this. The first was that should either Hitler or Mussolini be overthrown, Bolshevism would be the residuary legatee of his overthrow; to keep them in power was, therefore, to prevent the spread of the most powerful doctrine inimical to privilege. Only this can explain the extraordinary tenderness displayed by the Bank of England to Hitler and by American financial interests to Mussolini, during the consolidation of their power; while the attitude of Mr. Montagu Norman to the Czech deposits in the Bank of International Settlements will for an uncomfortably long period of time be remembered as a shameful episode in British diplomatic history.

The second implication was the eager hope that the Fascist rulers, especially Hitler, might seek an extension of their power at the expense of the Soviet Union. Hitler might thus become the executioner of Bolshevism. It is difficult not to feel, as we survey the history of these years, that there was no surrender the major capitalist democracies would not have made to the dictators so long as their vested interests were not disturbed. Sir Nevile Henderson's account of his final days in Berlin shows clearly that (if he interpreted rightly), the attitude of the British Government would have been quite willing to "appease" Hitler again had not the manner of his demands on Poland been so threatening. Franco-British policy convinced the Soviet Union that their main purpose was to use it as the principal theatre of German attack.

Though Soviet policy was not without its shortcomings as the attack on Finland showed, the breakdown of the plans for a common front with the Soviet Union against the Fascist powers lies essentially at the door of Britain and France. It was the outcome of a twenty-year old hostility and cold neglect, followed by three months of frenzied bargaining in which the negotiators chosen seemed to be so disposed as to contrast the importance attached to "appeasement" of Germany with the contempt felt for the Soviet Union.

The publication of the records from the British Foreign Office<sup>1</sup> has supplied us with the necessary documentary evidence of the Anglo-Soviet negotiations.

<sup>1</sup>Documents on British Foreign Policy, 1919-1939. Third Series, Vols. V-VIII.

## BETRAYAL OF DEMOCRACY BETWEEN THE WORLD WARS 31

The Russians had in the preliminary talks insisted that military agreement must precede political agreement. To this the British agreed but not in the way the Russians had expected. The British Mission to Moscow was given instructions that, "until such time as the political agreement is concluded, the Delegation should go very slowly with the conversations, and until the political agreement is reached the Delegation must treat the Russians with reserve". The members of the Mission cheerfully assumed that the talks would be a long and tedious affair. Russian insistence soon hustled them out of their lethargy. Admiral Drax, the Mission's leader, was even forced to confess that he had no proper credentials, which he got only some few days later. The discussions were barren of any results. Convinced of this the Russians made their decision: they concluded the Nazi-Soviet pact. The time taken to offer the proposals by both sides makes interesting reading. The Russians replied at breakneck speed, usually on the same day. The British took anywhere from a week to a month. If dates mean anything, then the British were content with delay, the Russians anxious to conclude. The story of the Mission underlines the moral that it was the British and not the Russians who negotiated with one eye on Hitler. Yet probably this is not the whole explanation. Both sides wanted agreement, but not of the same kind. The British Government strove for alliance with Russia as a diplomatic manoeuvre, not as a prelude to action. According to Halifax "the Red Army might be efficient for purposes of defence, but not for purposes of offensive operations." A mutual assistance pact might besides, "further infuriate Herr Hitler ... nor must it be forgotten that the Vatican regard Moscow even to a greater extent than Berlin as Anti-Christ."

The Russians then decided to strike out for themselves. First rumours of a Nazi-Soviet pact were dismissed as "inherently improbable". Mr. Kirkpatrick said, "It would be a mistake to imagine that a Russo-German agreement could be so easily concluded as some people in Germany thought." Ignorance was coupled with complacency. A high Foreign Office official, Sir Orme Sargent, referred to Molotov in a letter as "M. Momtchiloff". A footnote adds: "M. Momtchiloff was Bulgarian Minister in London". А slip of the pen, true-but a revaling one. Momtchiloff or Molotov-it hardly mattered. Both were ministers of Slav countries, distant and shadowy. Thus all hopes of an alliance faded, and neither party stood to gain. The British, anxious to keep Russia out of Poland and the Baltic States, failed in the ultimate reckoning to do so. The Soviet Union on the other hand never wholly recovered the moral superiority which it forfeited by making the Nazi-Soviet Pact. Her admirers soon realised that M. Stalin could play at power-politics just as cynnically as Bonnet or Daladier.

The whole affair could be dismissed as comic were it not for its dangerous and ultimately tragic consequences. A contemporary Oxford

historian described "the failure to make an alliance with the Soviet Union in 1939 as the greatest setback for British diplomacy in the twentieth century."

Viewed in perspective, the failure of an Anglo-Soviet alliance is but a step away from the climax to an intensely tragic drama. It began with the unsympathetic Western attitude to the Weimer Republic, its apathetic reaction to Hitler's seizure of power in Germany and the Nazi outrage in Austria, its wavering attitude towards Abyssinia, its callous diregard for Spanish suffering and its final betrayal of the Czechs. One and all they conform to a logical pattern. Two decades and more have passed since then, and the logic becomes all the more apparent. These Foreign Office records have gone a long way to explode the myth that the Nazi-Soviet pact caused the World War of 1939. That the revelation of these records has not caused the stir that we might ordinarily have expected is due only to the "cold war" paychosis. If the Americans are to be believed public memory of the inter-war years has been short. They may be right partially at least. But traditions die hard—or so they should.

## Symmetry, Parity and Antimatter

CHANCHAL KUMAR MAZUMDAR

Sixth Year, Pure Physics

#### I

Most of us, I believe, feel—or once felt—immensely pacified when the result of a problem of 'simplification' in mathematics happens to be a small number, and, best of all, when it is zero. In principle the result may be anything. It may be the oddest fraction, or the longest recurring decimal. But few will pass over such things quite satisfied. Apart from a just belief in the name 'simplification', a feeling for symmetry seems to be hurt at such oddities. We believe, though not very reasonably, that mathematical symbols and numbers will come out symmetrically balanced so that these odd parts will cancel out. The concept of symmetry seems to be fundamental in mathematics, and it is a part of a much more universal idea of 'symmetry'.

We may say that symmetry is a quality of a whole arising out of the blending of the components in right proportions. As with other universal concepts, this is hard to define, for, the "right proportions must be left to the judgment of the observer. Connoisseurs of art may be reminded of Greek sculpture at its best. A mathematician will arrive at the concept by the analysis of the projective properties of a sphere. And love of symmetry is ingrained in human nature. The reason is, suggests Weyl the artist in mathematics, that human beings became conscious of an axis of symmetry—that of the direction of gravity—when they first stalked the earth.

Even a cursory look around will convince us of the inherent symmetry in Nature. Animals have symmetrical bodies. Plants and trees with strange shapes arouse curiosity and always leave an impression. The sun and the moon, the earth and the planets have an axial symmetry about their rotation axes; so also have the stars and some nebulae. There are two kinds of electrical charge, positive and negative, and two kinds of particles, bosons and fermions. The more stable atomic species—the rare gases—have a spherically symmetric structure. The even-even nuclei, i.e., with even numbers of protons and neutrons, are more numerous than the odd-odd nuclei. Then there is the classical example of the crystals, which can be classified in 230 groups from their symmetry properties.

Yet, to compensate for these, as it were, there are physical phenomena fundamentally asymmetric in nature. The internal physical properties of most crystals reveal asymmetry. Perhaps the most obvious example would be the passage of time, with which is connected the increase of 'entropy' of the universe. This is a consequence of irreversibility of all natural processes, as envisaged in the second law of thermodynamics. All the macroscopic phenomena are occurring in a way which makes the available energy of the universe less and less, to *human* beings. However, this is essentially connected with human beings being unable to discern and control individual atoms or molecules, and is really not connected with the symmetry properties of Nature we are considering. The second law should be regarded as a special case.

#### II

Mathematics is a fine tool for investigation of symmetry. The study of recurrent patterns is really its soul, and in this sense the whole of it is the study of symmetry. We may not be inclined to such sweeping generalities, however, and in a restricted sense, geometry and the theory of groups are specially connected with such symmetry properties. While geometry emphasises the graphical approach the theory of groups has the analytical one. A group consists of a class of elements amongst which a process of operation is defined satisfying the 'associative' law, and which

17

contain an element unity or identity and also the inverse of each element among themselves. Thus if a, b, c be the elements, ' $\sim$ ' the operation, we have

$$a \sim (b \sim c) = (a \sim b) \sim c$$
 (associative law)  
 $a \sim 1 = 1 \sim a = a$  (unity)  
 $a \sim a^{-1} = a^{-1} \sim a = 1$  (inverse)

1 being the unit element and  $^{-1}$  denoting the inverse. The symmetry properties of a physical system express the invariance of form under, say, rotation about an axis, translational displacement reflection about a chosen plane or superposition of component parts. Each such class of operations obviously contains the identity and inverse elements, and two successive operations create a single operation of each class separately. We identify that the totality of such operations forms a group in each case. However we shall not go into the gruesome details of representation of these groups through matrices, but having indicated the way, shall turn to more interesting physical considerations.

The concept of symmetry plays a very important role in all discoveries and inventions in Physics. H. Poincare has pointed out two things that help the scientist to grasp the correct solution of a problem from amidt a vast number of possible solutions.<sup>1</sup> First, a keen aesthetic sense leads the scientist to the truth, for there can be nothing more beautiful. When the solution is worked out, an exhilarating correspondence between the theoretical structure and the objective reality persists. On completion, the concept of symmetry, Poincare's second idea, enables him to feel that the solution is correct, if it embraces, in one grand manifold, various possible aspects of the observed facts.

#### III

Let us now consider the part this idea of symmetry plays in Quantum Physics to-day, specially the many body problem, and the space inversion symmetry or parity, and the symmetry between matter and anti-matter.

When a physical system consists of several identical particles, that is, particles that can be substituted for each other in any situation without changing it (for example, molecules of water), any dynamical description should be symmetrical with respect to all of them. Ordinarily this is not imposed, as we take it for granted that at any event we can follow any individual particle, distinct from the rest. Clearly this is not possible in the micro-world, and we can only deal with symmetrical descriptions. When a motion of an assembly of n identical particles is possible, another motion merely consisting of an interchange of order ('permutation') is

<sup>1</sup>Science and Method,

also possible. This is formally introduced as symmetrisation of the wavefunction that gives the state. We may take all the permutations of particles and sum them; or we may take the permutations with alternating positive and negative signs. It is a curious fact that only these two symmetry properties are allowed in nature, the Bose-Einstein and the Fermi-Dirac cases respectively.

The famous Dirac equation in Quantum Mechanics predicted the existence of 'positron'. A 'positron' is identical with the electron in mass, spin, magnetic moment, amount of charge, in fact in every way, except that the sign of charge is positive.<sup>2</sup> The positron is the 'antiparticle' of the electron. The positron was discovered by C. Anderson (1933). Since then a host of material and field particles has been discovered, but there appear to be always 'particles' and 'antiparticles'. The antiproton was artificially produced and detected by E. Segre in the bevatron accelerator machine.

It is perfectly feasible to build an 'antiworld' or an 'antiuniverse'. In our world we have the positive protons in the nucleus with the negative electrons going round it. We may have negative antiprotons in the nuclei, and positrons surrounding them. We cannot distinguish between such anti-matter and matter at all. If there is in any part of the universe a world of anti-matter, its presence would not be revealed in radio echoes at all. Once O. Klein went very far in suggesting that cosmic rays were nothing but the survivors of unhappy encounters of matter and antimatter, because then they annihilated each other.

#### IV

A possible means for distinguishing metter from anti-matter has been suggested through the discoveries of neutrino and anti-neutrino.<sup>3</sup> The neutrino is a mysterious particle. To save the principles of conservation of energy, momentum, and angular momentum, in  $\beta$  decay-literally, to preserve the physical structure from utter collapse--Pauli postulated such a particle. It has no charge or rest mass, but has spin and energy; it takes little part in any nuclear reaction, making its detection extremely difficult. Yet the hypothesis survived through the Fermi theory, and through the lack of any other explanation of  $\beta$  decay, till in 1953, Reines and Cowan performed experiments which were interpreted to confirm its existence. But soon it was called upon to clear up another trouble; the non-conservation of 'parity'.

Parity is a concept referring to the behaviour of physical systems under reflection of co-ordinate systems and all states of motion, and the

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Conventionally the electron has a negative and the proton has a positive charge. <sup>3</sup> With no experimental proof, this should be regarded as semi-scientific.

fundamental particle, have under usual conditions, definite parity. With usual quantum mechanical systems parity is conserved, which is merely an expression of the independence of physical phenomena from the choice of the left or right handed co-ordinate system, that is, of reflection symmetry. It is really surprising that parity is not conserved in  $\beta$  decay and in other weak interactions, as this would imply that looking at the phenomenon and its image in the plane mirror we would find different things ! But as experimental results were unequivocal, masters like Pauli who had put 'his bet against it' accepted this; and Lee and Yang, who had discovered this principle of nonconservation of parity, soon put forward an appealing two component neutrino theory to explain it. The neutrino being a neutral particle can differ from its antiparticle in having a different spin direction. The neutrino has got its spin parallel to the motion thus having a right handed screw sense or helicity; the antineutrino has its spin always anti-parallel to momentum having a left handed helicity. Unlike electrons and protons, which can see their images in a looking glass, the neutrino approaching a mirror, can, unfortunately for its helicity, only see its counterpart. The left handed neutrino and the right handed antineutrino states do not exist.4

We now possess particles with definite 'chiralty' or handedness. In the anti-laboratory of the anti-world, we hope to have no left handed neutrinos and right handed anti-neutrinos, as for neutrinos left and right will not be reversed. We may consider the reactions

$$N \rightarrow P + e^- + \bar{n}$$
  
 $P \rightarrow N + e^+ + n$ 

N, P, e<sup>-</sup> e<sup>+</sup> being neutron, proton, electron and positron respectively. n is the neutrino,  $\bar{n}$  the anti-neutrino. In the anti-world the corresponding nuclear reactions<sup>5</sup> are: (bar denotes antiparticle)

$$\overrightarrow{P} \rightarrow \overrightarrow{P} + e^+ + n$$

$$\overrightarrow{P} \rightarrow \overrightarrow{N} + e^- + \overrightarrow{n}$$
(2)

(1)

The charged component of the nucleus will now give rise to left handed particles. The chiralty can be determined by angular correlation experiments.

Strange and weird are these speculations about the anti-universe. The weak interactions have been explored with the finest intelligence and the two-component theory has cleared the confusion there, only to create it at higher levels.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Weak interaction is modern physics per se. The nomenclature is shifting. I have followed that of the classic paper of J. D. Lee and C. N. Yang in *Physical* Review, 105, 1671, 1957. <sup>5</sup> This assumes the so-called "lepton conservation", i.e., conservation of particle

and anti-particle number.

## The Condemned

#### MANISH NANDY

#### Sixth Year, Economics

I protest against this situation, the situation into which I have been placed against my will.

Not that I dislike the situation as such. Many people no doubt hate it—being caged up in a limited space, being sometimes denied basic amenities, and sometimes even the respect a man may always rightfully claim. Many others hate a gaol because it is a gaol. I admit I entertain no such sentiments.

The rules, the rigours and the confinement of a gaol I find strangely reassuring, almost a relief. Consider for a moment the six walls of a cell not very spaciously arranged, the man in it, and the things around him. The things, thank God, that are so few, so bare, so colourless! The man cannot but be the centre of that universe, be it limited, his hands its axis, his eyes its sun. In this kingdom, I am the king.

Nor are my regal powers in a state of suspended animation. I exercise all the powers I wish to exercise, which means the powers I can exercise. They are so limited that they are defined as in stone; I cannot doubt or ignore them. I make my choice and commit no errors. Remove my present confines and I shall be in confusion. A man like me has several powers—let me be modest enough to say not many—, he sees a thousand cases where to apply these. Where however is the star that would lead him to the manger, or if you like, the principle that would guide his conduct? He is in confusion. That is where I knock the bottom out of my talents; to use the conventional expression, I bury them. But here I enjoy a holiday from the agony of impotence. I achieve a concentration of my powers, a perception of its meaningful direction.

The achievement is not the less because I live under a death sentence. I am like a stranger who is being indulged for the while. I have nothing to lose and everything to hope for. I stand in the middle of the household, and yet I do not belong to it. I stand, as it were, outside of it. What, if my manners are bad? I shall not answer for them. For a while I shall take of the rich food and the good wine, and then open the door, step outside and walk away. But, as long as I am here, I am a god that knows his powers. I was released from the causal chains which bound me from my birth and I breathe freely. It does not matter that I am to be executed ten days hence. For those ten days I *live*.

As I argue, I do not dislike the situation as such. But, now, a new

circumstance is introduced. I have been thrust into this situation against my will. Of course, I have not come here by applying for it. But neither did I come here for reasons about which I have no opinion or at any rate, I do not care. The point is I do care and I have something to say about these reasons.

My crime is sedition. The prosecution counsel (what a beautiful designation!) seemed to be avoiding the word, but that no doubt is what he meant. He was inwardly embarrassed about the job—a feeling which I understood because he looked a sensitive person. Rather discreetly he talked in a low dry voice and gave the impression of being unconcerned about the outcome. His monotony was the greater when he started reading from two of my books with a singular lack of emphasis. I was pleasantly surprised however when he brought out a silly pamphlet I wrote six years back and showed great interest in it. My lawyer raised some objection and, had not the judge done it already, I would have been greatly tempted to overrule it.

A tribute is also due to my own counsel. I knew my friends were paying him, but the amount of such payment could not have been much. He appeared genuinely interested in my views and had read all my works. Since, he said, my writings would figure prominently in the trial, it would be advisable for us to go through some of the books together once again. This would help him, he explained, to affix on certain passages their correct interpretation. It was at this point that I had my greatest joy as well as my greatest shock. While I found that he was no less a master of my ideas than I myself was, I also found that he advocated them with a totally different perspective, even more, a totally different morality.

At the trial therefore I found myself in a strange situation. I was between an understanding enemy and a friend who, while he did not misunderstand, spoke a different language. My innocence was never vindicated.

For I still believe that I am innocent, though maybe not of sedition. I have always lived on my own private resources and did not have to work for a living; which meant that several crimes, of which I would have been temperamentally capable, remained beyond my reach. But it also meant the curse of being without a purpose, without a direction, without an urgency. Rather late in life, I conceived the notion of achieving order, and thereby meaning, through the written word. That notion has persisted with me through the years, though its connotation has changed somewhat. I have come to realise that achieving order is not the same as retaining it, that the point of equilibrium is a moving point. Often after completing a book I have lain for days in a state of mental prostration, then got up and read the book in worshipful admiration for its author. The narcissistic stage has nonetheless never lasted. What seemed

38

#### THE CONDEMNED

at first only technical flaws, soon showed themselves bloated into major weaknesses. The new ideas, in spite of their polish—or is it, because of it appeared more repulsive than the old, to be ever rejected in favour of newer ones. Even then I was like a condemned man, furiously digging his grave so that he could go to paradise.

But what paradise was I really looking for? Was it celebrity? No, I was not so foolish as to crave for the 'intimations of immortality'. Was it a determination to arrive at the Truth? I just had no such determination. My only determination was not to be either a pharisee or a charlatan. For, surely nothing worse can befall an artist than the pretence of being different from what he is or greater than what he is. The lone loyalty I have held has always been to myself. In the jungle of ideas I have groped like a madman for the relevant as against the irrelevant (How could I apply the true-false distinction to my own performance? It was always true), and in the choice my untamed will has been the arbiter. That was my true vocation.

The idea of systematically arraigning a state or a government never appealed to me. Even if it did, it could not be my goal. It could only be a detour, at the end of which I would return to my original preoccupation. To my mind, sedition was an alien concept. I was both too much of a hero and too much of a coward for it. Because I was a coward, I could not work for the destruction of a world without the immediate consolation of a new world. Because I was a hero, I could not consent to the trickery, deceit and pitilessness of a seditious act.

Without doubt, some of my writings went against the existing authority. At the same time, I should expect some went in its favour too. Which preponderated I do not know. Indeed I have no interest in such incidental effects of my work. I have little patience with the scientific classification and sociological evaluation of art, even when it is my own. When asked therefore whether I could satisfy the Court that my ideas were not such as to inculcate disaffection towards the present régime, I replied that it was none of my business, since it was none of the business of a true artist. Certainly, a writer cannot be a policeman with himself!

Also, what harm if the policeman is actually sleeping? What can the artist, at his best or at his worst, do? His hostility is the vomit of society, his revolt its catharsis. Hence his sensitivity is his strongest justification. He can be broken any time, and that is precisely the reason why he should not be broken. It is far better to wait and watch him. If my art does not matter, my life does not. But if my art matters, so does my death as well as my life. By executing me, then, you put a halo round my head, a premium on my work.

The last possibility encourages me. Yet, looking closely, the nature of the premium repels me. Hardly will I have reached limbo, when people will pounce upon my books and devour them with the wistful reverence with which they take the bread in a holy communion. I will be a martyr, each of whose sentences contains a grand prophecy or a profound truth. There will be found in me no hesitancy, no change, no contradiction. I will be condemned again—to be a venerated, worshipped, misunderstood prophet.

After all, these contradictions are dearest to my heart. Without them, all my roads would have turned into blind alleys. They lighted up the crevices in an old mode of thought, and through them, the way ahead. I have been held guilty of seditious ideas, in neglect of the fact that they are not my only ideas. I have repudiated my past in their name on one basic assumption: I shall not hesitate to abjure them if the future calls for a new allegiance. I grow, and I reject as I accept.

In terms of an unhappy distinction, I am a man of words, not a man of action. But my words represent action. Foolish men, who fear the action, proscribe the words and execute the author. What they do not understand is that they do not thus help themselves.

I protest against this situation, the situation into which I have been placed against my will.



Naini Tal lake is perhaps the only beautiful spot in the town itself. It is about three quarters of a mile in length, and a veritable paradise for yachters.







#### Below :

A view across Naini Tal lake; from the "flats"—the area to the west and northwest of the lake.

Bhim Tal lake is about fourteen miles from Naini Tal. The island park in the middle is approachable by boat









The Lucknow Imambara is more like a fort than a place of worship. One section of the building is just a labyrinth of corridors, originally constructed to trap enemies. The central hall of the Imambara is an aconstical wonder. The sound of a small coin dropped at one end of the balcony (a hundred feet in length) is clearly audible at the other. The walls are full of beautiful Mughal carvings.

Photographs by Prateep Ghose, Sekhar Ghosh and Dibyadyuti Hajara.
# India Searches for 'Liquid Mineral Hydrocarbons'<sup>1</sup>

## RABINDU NARAYAN ROY Third Year, Geography

Although the use of petroleum—or of 'rhadinace'<sup>2</sup> (as was termed by the Persians in the fifth Century B.C.) is older than the Book of Genesis, the production of it in the modern line commenced in the latter period of the nineteenth century. In India, oil-drilling began in 1866 when four shallow wells under 200 ft. deep, were bored in Upper Assam. In 1867, three more shallow bores were made near gas and oil seepage close to Makum, and a small quantity of oil was obtained. This led to the initiation of a large-scale search for petroleum. In 1892, oil was struck in Digboi.

It is well-known that the great stores of petroleum are contained in stratified sedimentary rocks laid down in geological periods from Cambrian to Recent. It is formed from organic matter by the catalytic activity of certain natural inorganic compounds. The accumulation of oil into workable pools largely depends on the presence of porous reservoir rock folded into anticlines, domes or monoclines and covered with an impermeable caprock. In India, the lower Tertiaries form the chief source rocks of petroleum. Such Tertiary sediments are found in the following places: Assam, West Bengal, Orissa, Punjab, Rajasthan, Cambay and the Cutch, the Ganga valley, and the Madras, Andhra and Travancore coasts. But at present, oil has been struck only in Upper Assam which constitutes a part of the 'Assam-Arakan geological province'. The oil-bearing belt stretches from the extreme north-east of Assam to the eastern borders of the Brahmaputra and the Surma Valleys. This is a deeply dissected region of high relief, and is composed of almost unfossiliferous rocksmostly sand stones, shales and clays-which range in age from Eocene to Pliocene, and may be classified into six simple series.

(1) Mallet's Disang series: 5,000 to 10,000 ft. deep, composed of unfossiliferous shales, slates and phyllites which are best exposed in Manipur and the Naga hills.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The name is given by Chester, the famous American geologist. It refers to crude petroleum which consists for the most part of an extremely complex mixture of hydrocarbons.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>The word is quoted from Herodotus, the Greek historian (484 to 425 B.C.). Book VI, 119, A. D. Godley translation.

(2) Jaintia series: 3,000 ft. thick, mainly composed of fossiliferous limestones at Ranikot, Laki and Khirthar range.

(3) Barail series: 15,000 ft. thick, composed of shales and sandstones the latter having, in Upper Assam, a number of coal seams.

(4) Surma Series: 13,000 ft. deep, composed of mud-stones, sand. stones and sandy shales.

(5) Tipam series: 12,000 ft. thick, composed of coarse sandstones in the lower part, and of mottled clays in the upper part.

(6) Dup Tila Series: 10,000 ft. thick, composed of sandstones and mottled clays.

Oil shows occur most frequently in the upper part of the Barails and in the lower part of the Tipams. The newly discovered Naharkatiya field produces oil from the Barails, and this has given rise to the muchdiscussed idea that the Barails are the chief source rocks of petroleum in Upper Assam. The Assam-Arakan geological province underwent violent folding and faulting during the Himalayan orogeny. This stands as a permanent set-back in the process of geological and geophysical observations.

There are now broadly two working oil-fields in our country—Digboi and Naharkatiya. The Digboi field covers an area of  $2\frac{1}{2}$  sq. miles in the Lakhimpur district of Upper Assam. It is situated on a "tighty folded asymmetrical anticline with major, thrust fault cutting the steeper flanks". The oilsand of Digboi is in the Tipam sandstone. The crude oil is more or less saturated with solid paraffins of high melting point and yields excellent paraffin wax (which is an important item of our export), lubricating oil and some bitumen. Close to the field, there is a refinery which produces about 1,200 tons of petroleum coke per month

The Naharkatiya field, 18 miles west of Digboi, is situated in a gentle anticline in the Barails. It started on a daily production of 20,000 gallons of crude oil from a depth of 11,715 ft. in March, 1954. Fifty-one wells have been drilled upto December, 1959 by the Assam Oil Company in the area. The discovery of this field is of momentous importance in the history of oil in India for it has opened up a new vista of possibilities of exploration for oil in the alluvium areas within the country.

In 1956, oil was struck at Moran which lies about 25 miles westsouth-west of Naharkatiya. The region is rather a flat alluvial plain and dotted with several tea-gardens. About twelve wells have been drilled so far, eight of them successful. When the Moran and Naharkatiya fields will be on full production, 2.75 m. tons of crude oil will be delivered to the new refineries to be erected at Nunmati, near Gauhati and at Barauni in Bihar.

Arduous efforts have been and are being made to search for new oilbearing structures in Assam. In the Masimpur anticline, there are many oil and gas seepages. The Burmah Oil Co. drilled more than ninety shallow holes here. But no indication of a commercial reserve has yet been proved. On the Kanchanpara and Chatachura anticlines, south of Badarpur (which was a producing field some thirty years ago), a number of test wells were drilled in vain. Various attempts have been made to obtain oil from the Makum-Kamdang lease, but with mostly disappointing results. Besides, test wells have been drilled in the Jaipur anticline as well at Bandersull, Tiru hills, Barsilla, Nichuguard etc. But all are complete failures.

It is to be regretted that India produces a little over 10 m. gallons of petroleum per annum—*i.e.*, about 5% of her total oil requirements, which stand at over 4 million tons. The hiatus between what is produced and what is needed is thus not only great but also rather dangerous. This will remain as a momentous problem until substantial sources of oil are discovered and developed.

India is a vast country with a vast amount of unexplored land. It has been decided by the Oil and Natural Gas Commission that about 4,00,000 sq. miles of sedimentary basin areas in India should be considered for oil and gas exploration. The names of these areas have been already mentioned. Seven exploratory wells were drilled in West Bengal during 1957-59. The drilling of the eighth well has begun at Brt Canning. Besides, drilling works are being carried on at Sibsagar, Hoshaiarpur, Jwalamukhi and Cambay. The first well has struck oil at Cambay. Four wells have been already drilled here, and the prospect of oil in this area is, on the whole, satisfactory. At Jwalamukhi, gas has been found. Strenous efforts are now being made to determine whether it is present in commercial quantities.

A number of problems—mostly technological and financial stand as strong set-backs which often threaten to nullify our eager efforts in search of petroleum. These problems have set before us a challenge that must be answered, for oil must be found to move the rusty wheel of India's economy towards the zenith of material development.

# A Case of Feudalism in India

DILIP KUMAR BASU

Fifth Year, History

A "Sketch of a Feudal System in Rajasthan" is but a leaf from the monumental scholarship of James Tod's Annals and Antiquities of Rajas $than^1$  (1829). From the stray and solitary source materials in his possession. Tod hardly raised the bare framework of a political system in Rajasthan. He admitted with refreshing candour that " it is more than doubtful whether any code or civil or criminal jurisprudence ever existed in any of these principalities." But with his discovery of the so-called 'incidents', apparently trivial and disjointed, the whole picture radically changed. They indicated a widely extended system which, he believed, was analogous "to the ancient feudal system of Europe." (Tod's source of information regarding the feudal system in Europe was Hallam's View of the State of Europe during the Middle Ages, London 1818). This statement is, indeed, startling because of its revelation that long before the appearance of the modern concept of Determinism, Tod believed in the uniformities of history; the 'incidents' he deciphered in Rajasthan, were not a stray array of facts. In his opinion, on the contrary they justified the fact that "in some stages of society the wants of men must everywhere be similar and will produce the analogies which are observed to regulate Tatar hordes or German tribes, Caledonian clans, the Rajput Kula (race), or Jareja Bhayyad (brotherhood)."2

The sweeping generality of these assertions has made Tod the target of severe criticism. In the first place, it has been pointed out, that Tod ignored the warning of his master, Hallam, against the "seeming analogies which vanish away when they are closely observed."3 According to Hallam, the similarities between 'fiefs' and the "Zamindars of Hindostan and the Timariots of Turkey" were based on ties of "imagined kindred and birthnot the spontaneous compact of vassalage".4 Secondly, William Crooke in his Introduction to the Annals observes that the Rajput system and feudalism in Europe "present a factitious similitude," the social development of each progressing along different lines. If we want to make a comparative study of the Rajput "tribal system," continues Crooke, it is useless "to travel to medieval Europe, while we have close at hand the social or-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> James Tod: Annals and Antiquities of Rajasthan; Ed. William Crooke; Vol. I, Book III, Chapter I. <sup>2</sup> Ibid., 154.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hallam: Middle Ages I, 1868, i 186. <sup>4</sup> Ibid., 200.

ganisation of more or less kindred tribes on the Indian borderland, Pathans, Afgans or Baloch or in a more primitive stage, those of Kandhs, Gonds, Mundas, or Oraons."5 Thirdly, A. C. Lyall in his essay on the political institutions of the "Rajput States of India"6 published in 1875, pointed out that Tod "failed to see the radical distinction between the two forms of society tribal and feudal." Finally, the most recent criticism of Tod made by the American Council of Learned Societies' at a conference on Feudalism in History agrees broadly with the arguments of Lyall and Crooke.

But any criticism of Tod should be qualified at the outset, by a clear exposition of the forces that help to bring about feudal forms of society, its conditions and the relationship of its social, economic and political parts. With regard to the forces behind it, it may be observed that feudalism is a series of responses to a certain kind of challenge, the inter-play of which results as a *change* in the superstructure of a highly organised political system. Generally, an empire or a large kingdom is parcelled into the optimum limit where power is largely reduced to a localised, personal and private level. This is the direct outcome of the failure of the central authority to give protection to the subjects against either internal oppressors (internal proletariat) or external marauders (external proletariat) and in some cases against both. But does this pledge of protection presuppose a contract? A contract implies that the parties to it stand on a footing of equality and that it is effected through mutuality of consent. It is obvious that in this sense, feudalism cannot be said to have been based upon a contract because it is found empirically that the pledge of protection under feudalism ultimately degenerates into an instrument of exploitation. Those who are 'protected' within the mores of feudal society surrender, particularly in the lowest level, their independent status and personality. Secondly, while discussing the socio-economic environment and its relationship, we must differentiate between feudalism as a category of technical arrangements discoverable at a particular region and feudalism as a term of general significance, loosely and indiscriminately applied to any system, possessing the apparent characteristics. Maurice Dobb<sup>8</sup> has defined feudalism as virtually identical with serfdom. It may be that serfdom is co-terminous with feudalism in the context of Western Europe. But it is not a necessary concomitant of the 'great estate' worked by serfs simply because serfdom may be seen to exist, even according to the Marxist belief, in societies which

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Annals I, Introduction, XXXIX. <sup>6</sup> Asiatic Studies I, 203-264.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Feudalism In History, Princeton University Press 1956; see the article on India by Daniel Thorner. <sup>8</sup> Maurice Dobb: Studies in the Development of Capitalism: 33-37.

are not clearly feudal.<sup>9</sup> Hence we cannot accept serfdom as the key to feudal relations and reject a priori the claim of other regions in the world on the strength of this definition. It is not that feudal relationships are inseparable from socio-political elements; but any comparative study of feudalism will be feasible only when we take into consideration the merits of these elements.

Tod's treatment of feudalism lacks clarity and as such it is difficult to make out what actually he believed to be the characteristically feudal relationships in Rajasthan. It seems that Tod considers feudalism as a complex of three factors, viz, benefice or fief, commendation, and immunity. Though he does not say anything explicitly about serfdom in Rajputana, we can, however, make a rough assessment of the social and economic existence-form of labour from some stray remraks of his. We can divide his treatment of the subject into four parts. One: the common characteristics of the Rajput system and European feudalism derived from the patriarchal form of society ruled by princes of noble blood. Even the poorest Raiput took pride in his ancestry and the martial spirit, the common heritage of all, was expressed in what Tod considers the paraphernalia of feudal relationship, armorial bearing, banner, palladium, kettle-drum, silver-mace and a bard with a lyre. This hierarchical structure of society was cemented by the caste system. "Only those of pure blood in both lines can hold fiefs of the crown. The highest may marry the daughter of a Rajput, whose sole possession is a 'skin of land': the sovereign is not degraded by such alliance."10

Two: The great chiefs had under them vassals of higher or lower rank, according to the size of the landed estates, which they held as fiefs. This lord-vassal relationship was marked by 'Rakhwali' or preservation' as Tod translates it. 'Rakhwali' gave protection in the "unsettled state of society and the deficiency of paramount protection." Like their European counterparts, the vassals of Rajputana were conscious of their rights and obligations. Mention may be made here of an extract from the letter of the expatriated chiefs of Marwar to the Political Agent of the British Government (Tod himself), Western Rajputana, which runs as follows: "When our services are acceptable, then is he our lord, when not, we are again his brothers and kindred claimants and laying claims to the land."11 The services of the vassals were primarily military. Tod quotes the instance of Mewar where 15,000 retainers followed their Prince into the battlefield. But while in Europe service was restricted to

46

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Transition From Feudalism to Capitalism: see Paul Sweezy's criticism of Dobb's definition of feudalism. <sup>10</sup> Annals I, 165.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid., Appendix 228-29.

40 days, in Rajputana "service was to be performed when demanded."<sup>12</sup> Next, Tod enumerates a number of feudal 'incidents'; he deciphered in Rajputana in the course of his investigation such things as reliefs, escheats, aids and wardships. 'Incidents' on marriage and alienation, prevalent in Europe, were conspicuous by their absence in Rajasthan.

Three: The feudal chiefs were graded into four distinct classes which reveal the extent of subinfeudation. (a) There were 16 first class chiefs whose estates yielded a revenue of Rs. 50,000 to Rs. 100,000. These chiefs claimed the right of administering justice in their own domains in civil matters. (b) The second class consisted of chiefs whose estates yielded a revenue of Rs. 5,000 to Rs. 50,000. (c) The third class consisted of chiefs called *Gol* who held lands yielding a revenue under Rs. 5,000. (d) The fourth class consisted of the members of the younger branches of the Rana's family who were called *babas* i.e., infants.

Four: With regard to the division of land between the Crown and the feudal chiefs, Tod mentions two classes of landholders, one Girasia Thakur or lord, the other Bhumia. "The Girasia Thakur (lord) is he who holds (Giras) by grant (patta) of the prince," for which he performed specified quotas of service at home and abroad. The bhumia lands were freehold tenures which Tod considers the counterpart of the European allodial tenures. These lands were exempt from the payment of the customary share of the crops and the chieftain's revenue officers could not measure bhumia holdings, nor could they assess them. The Bhumia paid no fine for investiture, for their grants did not have to be renewed since they rested on prescriptive possession. The bhumia lands were greatly popular because of these advantages: ma ka bhum (my land) was one of the favourite phrases on the lips of the Rajput nobility.

The lands held as grants were, however, very superior to the lands held under the bhumia tenures. In Mewar, for instance, except the central part of the state, the major portion of land, roughly three-quarters, was usually held as estates by chiefs. The most fertile land lay in the heart of the country and formed the crown demesne of the Maharana. This tract of land was called the *Khalisa* or fiscal land. "To obtain any portion thereof", Tod writes, "was the reward of important services, to have a grant of a few acres near the capital for a garden was deemed a high favour; and a village in the amphitheatre or valley in which the present capital is situated was the *ne plus ultra* of recompense."<sup>13</sup> The right of alienation on the payment of a small fine shows, however, that the peasants were the owners of the soil. And the grant lands, as mentioned above, are similar to the *siyurghal* grants under the Mughals which definitely proves the existence of private right in land. While discussing the institution of

<sup>12</sup> Annals I, 173.

<sup>13</sup> Ibid., 166-67,

basai or hali (< hal-plough), Tod remarks that there was no parallel to the agricultural serfs in Rajasthan. "The institution of basai," continues Tod, "approximates closely to the tributarii and coloni and perhaps to the servi, of the Salic Franks," "who were the cultivators of the earth and subject to residence upon their master's estates, though not destitute of property or civil rights." (Hallam).

An examination of Tod's thesis shows that there was the element of 'protection' in the Raiput lord-vassal relationship of 'Rakhwali.' But what gave rise to the necessity of 'protection'? Was there really any danger to Rajput society either from within or without ? These are the most relevant questions which critics of Tod have ignored. It is now agreed on all sides that the Rajputs came to India during the decline of the Gupta empire and their association by some historians with the Huna-Gurjara stock suggests that they were possibly connected with the Pratihara empire of the 9th Century A.D. When the Pratihara empire was being smitten to pieces by the inroads of the Turko-Afgans, the Rajputs became the natural champion of the forces of Hindu resistance. Rajput society was thus largely shaped by the forces generated from the disintegration of the Pratihara empire, which, in their turn, gave rise to the necessity of 'protection'. Secondly, Tod gives us an account of the extent of feudalisation resulting from the hierarchical structure and the graded classes of peers. Both Lyall and Daniel Thorner<sup>14</sup> have, however, emphasised the importance of bloodrelationships in this respect, and the main force of their argument, that Rajput society was not so much feudal as tribal, has been derived from this assumption. Tod himself has stated that "from the highest of the 16 peers to the holders of a charsa (hide) of land, claim affinity in blood to the sovereign" and "only those of pure blood in both lines can hold (true or hereditary) fiefs of the crown." Thorner has quoted the document regarding the remonstrations of the sub-chiefs of Deogarh with their chief, Maharaja Gokuldas,<sup>15</sup> to show that both the sub-chiefs and the Maharaja belonged to the same branch of the Sesodia clan. The principal defect of these pseudo-historical claims is that they deny the inherent dynamism in any system of growth. We can prove indirectly that Rajput society was not at all immune from changes as the charges of critics of Tod suggest. The term Kshatriya, Dr. Vincent Smith has pointed out, was not an ethnical but an occupational designation in Rajasthan. It usually denoted the Hindu ruling classes which did not claim Brahmanical descent. Occasionally, a Raja might be a Brahman by caste, but a Brahman's political status in Hindu India was usually typified in his advisory capacity as a minister. But this office in Rajputana, as we learn from numerous instances

<sup>14</sup> Feudalism In History: 133-43, <sup>15</sup> Annals I, 230-32,

in the Annals, was often held by members of the Bania class. The "Brahmans of the Desert" were generally illiterate and they, continues Dr. Smith, acquired an equivocal reputation by their laxity of practice. The Rajputs initially always preferred a Bhat or bard to a Brahman. This sharp retreat from the established orthodoxy of the Hindu system would not have been possible without any mechanism of dynamic growth. Besides, the etymological and popular meanings of the term 'Rajput' show that the chiefs of the Rajput tribes were losing their charismatic purity with the passing of time. Originally, Rajput < Rajputra i.e., son of a Raja "seems to have been a name applied to the cadets of ruling houses who. according to the ancient custom of tribal society, were in the habit of seeking their fortunes abroad, winning by some act of valour the hand of the princess whose land they visited and with it the succession to the kingdom vested in her under the system of mother right."16 There is no doubt that the Rajput princes were not of the stay-at-home type; they ventured abroad, conquering and marrying, thus leading to the admixture of races and the heterogeneity of the claims to succession. The popular meaning of the term 'Rajput' came to embrace an element of contempt, denoting a bastard, the son of a King and a Sudra woman. This also explains that the claims to racial purity were more mythical (the Agnikulathesis) than historical in nature. If there is any rationale behind these claims it is the conservatism developed as a defence against Islam.

That the Rajputs were in a state of transition has been indirectly acknowledged by both Lyall and Crooke. Crooke shares the opinion that the conservatism of the Rajput races was due to the impact of the Muhammadan invasions and that the period of Rajput isolation was already coming to a close with the inroads of the British. In his final appraisal of Tod, Lyall says that "perhaps we should not blame him for failing to see that his Rajput feudalism was not the basis of the society, but an incomplete super-structure, and that Rajputana, as he surveyed it, was a group of tribal suzerainties rapidly passing into feudal stage, which we now know to have been largely built up in Europe over the tribal foundations." Feudalism might really have evolved in Rajputana had not British power absorbed the whole subcontinent in the century after 1750.

To sum up: the Rajputs were tribesmen when they submerged north India and associated themselves with the local Gonds during the declining phase of the Gupta empire. But they were gradually emerging from their tribal shell and developing a system which was analogous to European feudalism. The differences between the two are, however, obvious. There was no serfdom, as we have noticed above, in Rajput society, though serfdom in our opinion is not the key to feudal relationship. Next, the Rajput

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Annals I, Crooke's Introduction: XXXII.

system was based on a contract<sup>17</sup> which is not a part of feudalism in the strict sense. But that the Rajputs were not purely tribesmen can be proved from two sets of facts: first, the military mentality of the Rajputs. They were far more quixotically heroic than is normal in tribal leaders. Second, tribalism as a force is too localised and weak to form the basis of either an empire or a large kingdom. The Rajputs, if we believe in their Huna-Gurjara origin, set up the Pratihara Kingdom on the ruins of the Gupta empire. This lends force to our view that the Rajputs were in a state of transition, gradually moving away from their tribal heritage.

# Prosody for Beginners

### NEMAI CHAND ROY (Ex-student)

The English language has seen two systems of rhythm. One was the Anglo-Saxon system, and the other was a lesson from Old French poetry The first is known as the alliterative measure because the rhythm was built upon the repetition of sounds. An otherwise fissiparous medley of sounds was knit together, achieved regularity (which is the essence of rhythm), by alliteration. In this line—

Warigeath, wulf-hleothu, windige náessas,

the only perceptible regularity is maintained by the w repetitions. There are four accents (—no rhythm is possible without sound variations—) and three of them coincide with the repeated w sounds, thus giving it extra cohesive force, but syllabic quantity is totally neglected. Three syllables separate the first two w-s, but the third and the last are separated by two. Again, this line cotains ten syllables, while—

Under naessa genipu nither gewiteth,

has twelve syllables.

The conclusion that emerges is that Anglo-Saxon rhythm ignored quantity and depended solely upon the strength of sounds. Secondly, this ignoring of quantity made the verses rough and comparatively unmusical.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Refer to the letter of the expatriated chiefs of Marwar to the Political Agent of the British Government in Western Rajputana as quoted by Tod in the Appendix 228-29.

This comparison concerning musical quality is drawn with the French system which depended on the regularity of time-lapses. The number of the seperating or weak syllables always remained constant. This system therefore secures a wave-like effect and is much more allied to music proper.

Possibly the greatest virtue of the Anglo-Saxon system is the focussing of attention on the significant words. This was brought about on the one hand, by alliteration, and on the other, by the accentuating. In the line

Stéap stánhlithe stíge néarwe,

the poet wants us to visualise a steep, stony, narrow path climbing upwards. The emphasis is on the steepness as well as on the stonyness. The 'st' alliteration coupled with the accentuation supplements the logical meaning of the words and increases the communicative power of the line. But it has not the magic of music. By 'magic of music' I do not mean the abstract form that music brings to us, but the spell produced by the beats that holds our attention. Beats are so very important because they prepare the condition for the understanding of pure form. Anglo-Saxon rhythm ignores this basic music and consequently, though its precision of expression is great, it fails to produce the hypnotic fertility of the mental soil which is an inferior but essential weapon of the poet. The sound-variations are very rough and the slightest jar on the ear suffices to break the illusion of the poetic world.

Old French poets however, used music as much as they could. This system, as I have said before, utilised regular beats. Naturally it had all the advantages of music proper. This was not a very small gain. The implicit music of the lines held the attention while the words had more power on a receptive ground. Its limitation was as severe as it was obvious. The poet could not always hope for the correlation of meaning and music He could not always juxtapose the beat with the word which had a particular importance. Verse therefore lost the naturalness of speech and acquired an artificial prettiness which must have been irritating to good artists.

I am afraid I must attempt a comparison. A poet in the middle of the eleventh century must have faced the problem in this way: (a) if I go in for the Anglo-Saxon strength and precision, I lose the musical lubrication; (b) if I turn to the quick success of French rhythm, I renounce power of expression. I do not think there was any way out of the dilemma. That the English poet chose the music of quantitative rhythm does not imply its superiority, but the glamour of novelty. The later continuance of this system (—it went on till the nineteenth century—) was probably due as much to the aesthetic reasons that I have tried to show as simply to artistic inertia. This certainly does not mean that one can mechanically

analyse the rhythm of the pre-twentieth century verse, because, in the first place, departures are necessary to maintain interest and do not destroy the prevailing sound-pattern, and secondly, the value of sounds (particularly of vowels) change with the context. One cannot and should not try to reduce all verse to the sing-song articulation of the chansons. What matters is the general impression. In 'King Lear' not every unit is an Iamb, but the total impression is of a rising rhythm.

But men are ambitious. When Gerard Manley Hopkins appeared he found that the accepted system of rhythm had become stale, because of excessive uncritical usage on the one hand and sheer lack of talent on the other. So far as rhythm is concerned, Hopkins' ambition was to increase the expressive power of English verse by strengthening its music. He wanted to hear not one rhythm, but two, in the verse, just as one hears not one, but two tunes in orchestral music. To do this, he developed an elaborate theory of counterpointing which is "the superinducing or mounting of a new rhythm upon the old." He explains that "since the new or mounted rhythm is actually heard and at the same time the mind naturally supplies the natural or standard foregoing rhythm, .... two rhythms are in some manner running at once." This however was not a new discovery in technique, as any student of Coleridge knows; but it is certain that nobody before had thought of variations on such a comprehentive scale. What was original in Hopkins was the further extension of this device of counterpointing, which leads to Sprung Rhythm. A paradox is immediately noticeable, for Sprung Rhythm, arising, as it does, from counterpointing throughout the verse passage, cannot incorporate two rhythms simultaneously "since one only of the counter-rhythms is actually heard, the other is really destroyed."

What, then, is the profit if you "spring" your rhythm? Twice the flexibility of feet, answers Hopkins. It is true that one cannot hear a wellmarked rhythm in such verse, rather a medley of two or three, yet the gain of flexibility in laying the stress is not a small one. But the sacrifice of the single simpler, but definitely more arresting rhythm of ordinary 'running' verse, is open to serious doubt. If the 'springing' of rhythm had been limited to variations in laying the stress, it would not have been very disturbing. But the irregularity of the *length* of feet makes it a hopeless task to perceive the dominating rhythm. Hopkins was a sensitive man but he failed to see the importance of the time-dimension. It is not possible for the human brain to perceive regularity in a piece of sound composition where the time-unit is elastic. Hopkins is right in pointing out that Sprung Rhythm is the most natural rhythm, being that of conversation and written prose; but conversation and prose are not music. It is also true that Sprung Rhythm is more expressive of meaning but I still contend that

ł

it is most unmusical. Whether music or expressive ease is the more desirable, is quite another question.

Those who came after Hopkins, the new writers\* like Ezra Pound or Edith Sitwell or Eliot, were also troubled by the staleness pervading contemporary English rhythm. Possibly that is one explanation of the boosting up of Hopkins. However, even these poets could not achieve much in the way of rhythm. They have rhythms more powerful than the Toms and Dicks because they have better music-sense but their rhythms are not really qualitatively advanced. Eliot's rhythm is not more powerful than Shakespeare's, and what is more important is that there has been no change in the method of arranging the beats. There is of course the hopeless insularity of the Europeans who will never admit more than one system of rhythm in their music, but I should have thought that such eminently intelligent persons as Eliot or Pound would at least consider possibilities. They did not; which only goes to prove how very faithful companions your conditioned reflexes can be. Suppose you arrange words so that the first stress (which is by the way necessary to emphasise the meaning of that particular word) falls on syllable two, the next on syllable five, and take the entire as the unit, would it not be the long visualised blend of music and meaning?

However, I suppose it is no use suggesting improvements to poets, because they are wonderfully obstinate in their own way. And anyway, none but unsuccessful men write poetry now, and as we all know, the Presidency College (ha! ha!) is where successful men club together.

<sup>\*</sup> By 'new writers' I mean only those who were actively interested in the creative process.

# Descartes' Proofs of the Existence of God: A Critique

## Madhumati Hajara

Third Year, Philosophy

In order to arrive at the truth Descartes started by doubting everything till he discovered what he considered to be a principle of indubitable certainty, viz., *cogito ergo sum*—I think, therefore I am. The existence of the self is proved by the fact that it thinks. The existence of the self is thus a matter of certainty.

From this basic fact Descartes deduces the principle that whatever is clearly and distinctly perceived is true. [This at once shows the weakness of his argument and the untenability of his fundamental proposition about the existence of the self. If all that is clearly and distinctly perceived be true, then the self is not the only thing that is true. Therefore the truth of the existence of the self is not unique, and cannot serve as the foundation for other principles or propositions. Again, the awareness of the self is an immediate experience. The awareness of anything outside the self or independently real is not an immediate experience. The idea of it may be clearly and distinctly perceived, but that by itself cannot assure us of the truth of its existence at any time—even when we are not thinking of it.]

Descartes argues that things which we clearly and distinctly perceive are true because God exists, and He is a Perfect Being, and all that is in us comes from Him. If we did not know that all our clear and distinct ideas came from a Perfect Being we would not be sure of their truth. He seems to suggest that any alternative theory would not be tenable. Thus, if, instead of God, there be an Evil Genius who wants to deceive us and who is the source of all our ideas, then what seems to be clearly and distinctly perceived may not be true and may really be false. The weakness of this argument is apparent. If the Evil Genius be the source of everything, then from where do we get the idea of Truth as distinct from Deceit, or the idea of Good as distinct from Evil? The moment we speak of deceit we imply that we have in us the idea of Truth, and the moment we speak of an evil genius we are conscious of the idea of Good. These ideas must have as their source something quite distinct from the Evil Genius.

Though Descartes does not adopt the orthodox theistic interpretation of the origin of things, what he establishes by his arguments is that a nontheistic theory of creation of man and the universe is not possible. He thus arrives at the proposition that God, the Perfect Being, is the source of all creation.

In order to meet any criticism that clear and distinct perception may not necessarily be the test (as it may happen that what is clearly and distinctly perceived may yet be false), Descartes modifies his original proposition by stating that what is perceived in a genuinely clear and distinct manner is true. He observes that ideas which correspond to actual and immediate experience cannot be false. Error may occur when from immediately experienced ideas we pass on to judgment or form mental concepts.

Descartes classifies ideas into sensory or adventitious ideas and factitious ideas. We believe by instinct and not by a process of reason that sensory ideas are caused by external bodies. Factitious ideas like the idea of sirens are an admixture of sense-perception and imagination. They are products of the mind. Neither the one nor the other can be a sure guide to form a judgment about Reality as such, because it has existence independent of our sense-perception.

Ideas as such are thus more or less of the same type in as much as they are mental images. They are neither true nor false-some represent substances (sensory or adventitious ideas) while others represent accidents (the idea of sirens). There is, however, one idea which represents a Supreme Being, eternal, infinite, omnipotent and omniscient, and the Creator of all things.

Among these three types of ideas-namely factitious ideas, adventitious ideas, and the idea of God, adventitious ideas being caused by external bodies, represent more substance than factitious ideas which are mental compounds of substances and imagination. There is again more of substance in the idea of God than in the idea of any created thing. The contents of the ideas thus vary in degrees of Reality (Existence) or Perfection. Descartes thus identifies Reality and Perfection. Our ideas may be imperfect, but whatever reality is in them must be contained in the things which cause them. As the ideas only represent things, they cannot contain greater reality or perfection than the things themselves.

Descartes then proceeds to analyse the types of ideas.

First of all, there are the ideas of the secondary qualities of things, like heat and cold. There may not be anything corresponding to these in the thing itself. It is impossible to say whether there is anything really corresponding to either as we are unable to say whether heat is only the negation of cold or cold is only the negation of heat. The ideas of heat and cold, however imperfect, exist in us and as such must have an origin. That origin may be the self. They cannot have more reality or perfection than the self.

Then there are the distinct ideas, like the ideas of substance (e.g., the weight of a body) and duration (the extent of existence in time, e.g., the visibility of the sun and the moon). These ideas are also derived from the self.

Finally, there are the ideas of primary qualities,—figure (long or short, square or round), situation (extent in space and existence in space) and motion (change from one place to another). These ideas represent not substances, but only *modes* or manners of existence. These may also owe their origin to the self, which is a substance and has, therefore, more reality and perfection than these ideas.

If we eliminate all these types of ideas which owe their origin to the self, we are left with the idea of God. Does it also owe its origin to the self? Now, the idea of God represents the idea of Infinite Substance, an all powerful, all knowing, independent Being, the Creator of the self and of all things. That being so, the source or origin of this idea cannot be the self, which is finite and imperfect. Therefore God, a Perfect and Infinite Being, must exist. The idea of that Being must be a *true* idea, and not an imperfect idea like that which originates from the self.

We are aware of the self as a finite and imperfect thing. How do we know it to be finite and imperfect, unless we have an idea of the Infinite and Perfect? We are, therefore, in a way aware of God, the Infinite and Perfect Being, before we are aware of the self. This is Descartes' causal proof of God's existence.

In forwarding this argument in support of God's existence, Descartes assumes that we are aware of the idea of God, that such an idea represents a Reality having an independent existence, and that the Reality called God has certain qualities, e.g., infiniteness, omniscience, omnipotence etc. Despite all his arguments, however, his conclusions are based on nothing better than assumptions. These assumptions again go against his fundamental proposition-cogito ergo sum. The self is aware of its existence because it thinks. This is a matter of immediate experience. In seeking to prove the existence of God, Descartes relies on the fact that the self is aware of itself as imperfect and finite. This is not a matter of immediate experience. This is a judgment formed, as has been shown above, by a process of reasoning from the proposition that there cannot be an idea of the self as imperfect and finite without its being aware of something which is Perfect and Infinite. ' Therefore, the proposition cogito ergo sum can no longer be looked upon as a fundamental and ultimate proposition -the only thing which is clearly and distinctly perceived.

Since, therefore, the awareness of the self is the product of a complex mental process, and not an immediately perceived fact of indubitable certainty, doubts about the truth thereof are likely to arise.

In order to get over this difficulty Descartes looks for additional arguments. He raises two questions, viz:--

- (1) Whether the self, which possesses this idea of God, could exist if God did not exist, and
- (2) How does the self receive the idea of God?

In answer to the first Descartes says that if God did not exist; (i) either the self must be self-originating, or (ii) it must owe its origin to something less perfect than God.

The self cannot be self-originating because if it were so it would give itself all the perfections it could think of, that is, it would make itself God. As the self has the power to think, it would be aware of the fact that it creates itself and would give itself all the attributes of a Perfect Being.

This argument is unconvincing, as it proceeds on the assumption that Existence itself is a Perfection. To Descartes, the fact that it thinks is proof of the existence of the self. This does not necessarily prove that Existence is Perfection, or that whatever is thought of as the attribute of Perfection exists.

As regards the second alternative, namely, that if God did not exist the self must owe its origin to something less Perfect than God, Descartes says that such a theory would not explain the ultimate origin. The origin which is less perfect than God would again owe its existence to some other cause and so on. Such an infinite regression of causes is not possible, and so we must accept the ultimate origin as self-existent. And nothing but God can be self-existent.

This argument does not explain why we must have an originating cause or a cause which (as the ultimate origin) creates everything. This is nothing but an assumption, though Descartes considers it to be selfevident.

There is another assumption on which this argument is based. That assumption is Descartes' view of time. Time to him is constituted of distinct moments, each independent of the others. To exist, a thing must have the power to conserve itself at each moment. This power to conserve is the same as the power to create. Since the moments are distinct, the thing, in order to continue to exist, must have the power to create itself at each moment. It must thus be self-existent, or the originating cause. There cannot therefore be an infinite regression of causes.

Descartes does not meet the criticism that several causes may have combined to produce the self, and that such causes need not have a common source in any one thing like God. His only answer is that he has a clear idea of the Unity of God in whom are to be found all the Perfections he is aware of. The idea of unity and the ideas of all the perfections must be derived from the same source; otherwise one could never have the idea that they are inseparable.

57

As regards the manner in which the self receives the idea of God, Descartes says that this idea is not received through the senses. It is innate in us like the idea of the self. Descartes' philosophy does not mention what the idea of the self is. He has only stated that the self is aware of its existence. He therefore explains that the self is known by the mind being directed upon it. God cannot however be apprehended in any such manner. It is God Himself who put the idea in us. There would not have been this idea if God did not exist.

Having advanced the causal proofs of God's existence, Descartes gives what he calls another direct proof of the existence of God. The idea of a thing is inseparable from the idea of its essential qualities (when we think of a triangle we are reminded of the fact that its three angles are together equal to two right angles, and that the greatest side subtends the greatest angle etc.). But this does not assure us of its existence. However, existence and essence cannot be separated in our idea of God.

Now, existence and essence may be inseparable in thought—the more so if we think of Existence as a Perfection and God as a Perfect Being. Inseparability in thought, however, cannot assure us that outside the domain of thought there must be an independently Real thing called God.

# Aristotle's Concept of Tragic Katharsis

### SHUKLA ROY

### Fifth Year, English

The word *katharsis* occurs in Chapter Six of Aristotle's 'Poetics'. "A tragedy, then, is the imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete in itself; in language with pleasurable accessories, each kind brought in separately in the parts of the work; in a dramatic, not in a narrative form; with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions."

The surviving fragment of the 'Poetics' offers no possible explanation for the use of this term in this context. This was in fact a habit with Aristotle. In his extant treatises, he frequently introduces a technical term and leaves it unexplained. The explanation usually comes later and in an entirely different setting.

The extant 'Poetics' is a fragment. That there was another part is proved by the opening of Chapter Six. "Reserving hexameter poetry and comedy for consideration hereafter, let us proceed now to the discussion of Tragedy;". There is not a word about comedy in the rest of the book: as we have it now, the 'Poetics' is not complete. Since the book contains no elucidation of such an important term as *katharsis* we may safely assume that it was to be found in the lost second part. Stretching the imagination further, we may even conjecture that the author spoke of comic *katharsis* and there explained the term.

If this loss is great, a greater one is the loss of the Aristotelian dialogue on Poetry. The 'Poetics' is not, properly speaking, a book. In the Greek original it reads like a series of jottings. The master might have made them for his lectures at the Lyceum. Or, dreadful thought, the jottings might have been made on the spot by some students.

To come back to *katharsis*, we must leave much to surmise, although the mere word is used repeatedly in the extant 'Poetics'. In Chapter Seventeen, it obviously means 'purification.' "One must mind, however, that the episodes are appropriate, like the fit of madness in Orestes, which led to his arrest, and the purifying, which brought about his salvation." The Greek word *katharsis* has been given the only possible translation— 'purifying'—in this passage.

The reference here is to Euripides' play 'Iphigenia in Tauris'. This play is based on a certain version of the Iphigenia legend in which the maiden is not ultimately sacrificed. She is spirited away by the goddess

Artemis, unknown to all, to the land of the Tâuri (modern Crimea). Here there is a temple of Artemis, the principal deity of that tribe. Iphigenia is made the chief priestess of the goddess.

Years pass; Iphigenia's brother Orestes takes terrible revenge by slaying his own mother. This however is a crime, and therefore, in the typical Greek manner, Nemesis must follow. The end begins in the shape of a frenzy. Pursued by the Eumenides, the agents of Nemesis—Orestes runs from land to land. At times, there comes over him a distressingly acute fit of unreason. He reaches at last the land of the Tâuri. He is accompanied by a faithful friend Pilades. They are both completely ignorant of the presence of Iphigenia.

According to Tâuri custom, a foreigner is sacrificed to Artemis. Unfortunately Orestes has the fit of madness as soon as he sets foot on the land of the Tâuri. In that state he falls into their hands and is easily discovered to be a foreigner.

Finding that they are Greek, the Priestess Iphigenia proceeds to question them about their birthplace, parentage and the like; and learns that they hail from Argus, her own country. She has been yearning to return home but there was no way of escape. She sees just a chance and she offers the two men an alternative. If one of them consents to bear a message from her to Argus, he will be spared.

There is great disagreement between Orestes and Pilades; each of them is eager to offer himself as a sacrifice. Finally, it is decided to let Orestes be the sacred offering, for life is a great misery to him.

The message is handed to Pilades in the form of a sealed letter. But, on the probability of a shipwreck, he is also given, in the presence of Orestes, a verbal summary thereof. The details in it give out Iphigenia's identity; but Orestes keeps his knowledge to himself. Pilades leaves with the message.

The time of sacrifice arrives. On the point of death Orestes cries out —so the same fate that overtook my sister is going to befall me too! Startled, Iphigenia questions him further and the facts are at last brought out. They must plot an escape, of course. She goes up to the King and says—the sacrifice must be cleansed. He is impure and the goddess will not accept him. Let him be taken down to the sea, for the salt water will purify him.

The king agrees and she adds another request.—Let the entire population keep indoors. Orestes is unclean and it might be harmful to look on him.

So they run away and the tragedy ends. If, after this, we look back to the passage quoted from Chapter Seventeen of the 'Poetics', it becomes clear that the word *katharsis*, as used here, can only mean 'purification', *lustratio* in Latin.

¥

## ARISTOTLE'S CONCEPT OF TRAGIC KATHARSIS

On the application of this concept, the function of tragedy is reduced to the purification of pity and fear. Since the function of tragedy is usually regarded to be a refinement of the emotions, this definition has been readily accepted. It was, in fact, the only interpretation that held the field for centuries.

In Greek literature and in the other writings of Aristotle, there is a use of the word katharsis that simply cannot bear this meaning. Plato, in his 'Phaedo', speaks of "initiatory katharsis"—where lustratio is the obvious meaning. But, elsewhere in the same dialogue, Plato comes to talk about the real nature of virtue. The spokesman in the dialogue observes that real virtue is rarely practised in ordinary life. For example, we are temperate just because we fear the consequences of intemperance. This is simply a matter of fear; real virtue lies rather in the katharsis of such fears.

Here the sense 'purification' is absurd. The context makes it very clear that real virtue is getting rid of fear. There is a glimpse of another possibility. What if Aristotle had meant 'get rid of' rather than 'purify'?

The word *katharsis* in the sense of 'elimination' or 'expulsion' was already well-established in Greek medicine. In fact, even today modern medicine uses that word in a similar sense. A purgative in the technical language is a 'cathartic'.

What is the process involved in the administration of a purgative in medicine? Initially it excites the morbid matter the physician wants to get rid of. It is found on experience that by the very excitation the morbid matter is expelled. A parallel is also found in modern psychology. The psychotherapist intends to get rid of certain morbid matters in the mind of the patient. The working up of such matter makes for its working off. A familiar example of this phenomenon is how sorrow is lightened by being indulged in. The initial effect is to excite it further, the final effect is of relief. The act of weeping or lamentation has the same result. From the psychotherapeutic point of view, loud lamentation is a very healthy act. This process is still known as 'catharsis'.

Aristotle was the son of a physician. His father was Court-physician to the grandfather of Alexander the Great. Moreover, Aristotle in his writings touched on every branch of knowledge. The medical use of the term *katharsis* would therefore be well-known to him.

Going back to Plato, there are further passages in his writings which make out this meaning of *katharsis*. In his dialogue 'Sophist' he speaks of the necessity of freeing the mind from obstacles before the imparting of knowledge and, in doing so, he uses the verbal form of the word *katharsis*. Purifying the obstacles would be an absurd statement. They are got out of the mind altogether. Just as in the case of the body, says Plato,—before the physician administers the medicine he makes sure that the body is free from obstacles and administers a purgative (the original Greek word used has the same etymological origin as *katharsis*); so also the man who is imparting knowledge must make sure that all obstacles in the mind of the learner are removed.

In 'Timaeus' (on Cosmology), speaking of the different varieties of motion Plato says that the best motion is that which arises from the moving body itself; the next best is that of swaying vehicles; the third and the worst is the kind which is there in 'pharmaceutical catharsis',--motions artificially induced in the body from the outside. Plato adds that ordinarily diseases must not be irritated by drugs. The third type of motion, if at all resorted to, must be used sparingly---for irritation is the initial effect of *katharsis*.

In Plutarch's essay 'On Conviviality', he mentions a certain tribe and says that, paradoxically enough, wine has a sedative effect on these people. This is nothing unusual, for at a funeral the sorrow of the mourners is worked off by means of dirges. In saying all this, Plutarch uses that very word *katharsis*.

Time now to find out whether Aristotle used the word katharsis in this sense or not.

His treatise on 'Politics' has come down to us complete. There is a discussion on music at the end of the book. Incidentally, this might seem rather curious on the first hearing. It is just another example of the close integration between life and art to be found in ancient Greece.

In this discussion, Aristotle uses the word *katharsis* more than once, as usual without explaining. But the 'Politics' is a more considerable piece of writing than the 'Poetics'. The use of the word here has a definite context; the complete statements round about it make it possible for us to make a likely conclusion.

"The flute ..... ought not to be admitted into education; ..... the flute is not an instrument which has a good moral effect; it is too exciting. The proper time for using it is when the performance aims not at instruction but at the catharsis of the passions". ('Politics', Book VIII, Chapter VI).

It is not impossible to guess at the meaning of the word here; 'instruction' and *katharsis* have been differentiated. The word 'exciting' prepares us to say that if the flute is used it will excite the passions. A process that starts with excitement ends with what he calls *katharsis*.

The following extract is more enlightening:

"We accept the division of melodies proposed by certain philosophers into ethical melodies, melodies of action, and passionate or exciting melodies ..... Music should be studied not for the sake of one but of many benefits, that is to say, with a view to, (1) instruction, (2) *katharsis* [the

word katharsis we use at present without explanation, but when hereafter we speak of poetry, we will treat the subject with more precision], (3) intellectual enjoyment, relaxation and recreation after exertion. It is clear therefore that all the melodies must be employed by us, but not all of them in the same manner. In instruction ethical melodies1 are to be preferred, but we may listen to the melodies of action and passion when they are performed by others. For feelings such as pity and fear, or, again, enthusiasm, exist very strongly in some souls, and have more or less influence over all. Some persons fall into a religious frenzy, whom we see disenthralled by the use of mystic melodies, which bring healing and katharsis to the soul. Those who are influenced by pity or fear<sup>2</sup> and every emotional nature have a similar experience; others in their degree are stirred by something which specially affects them, and all are in a manner catharticized and their souls lightened and delighted. The melodies of katharsis likewise give an innocent pleasure to mankind". ('Politics', Book VIII, Chapter VIII).

We have to take our stand mainly on these two passages from the 'Politics'. A close examination yields the conclusion that the working off of pity and fear is effected through tragedy by working them up. Both of these are painful emotions and, in abstract terms, they might be described as morbid—they undermine the grit of one's character. (Just on this ground Plato had definitely excluded tragedy from the ideal commonwealth both in the 'Republic' and his last dialogue 'The Laws'). As a means of getting rid of them, Aristotle suggests the kathartic process. Tragedy is a kind of composition—a species of art—that excites pity and fear. The oppressive load may be got rid of through this.

Therefore, coming back to literary criticism proper, what Aristotle is really after in using this word is an explanation of the paradox of tragic pleasure. This was one of the main problems in the poetics of tragedy. At a tragic performance, wrote Plato, we smile through our tears. Aristotle came to light on an explanation of the paradox by the use of that term. It is the pleasure of relief. The mind is 'lightened and delighted' —the load is taken off. That is the nature of tragic pleasure. What makes this explanation extremely likely is the use of the word 'wherewith' in Chapter Six of the 'Poetics'—"with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions".

If the 'purification'-sense is accepted, we do not get that answer to Plato which is implied. Even after purification, the things remain. Plato's objection is to pity and fear themselves—pure or otherwise. In

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Plato's ideal Republic only certain melodies are admitted and others excluded. <sup>2</sup> This makes it very probable that in the definition of tragedy Katharsis is used thus.

this connection it is essential to remember that there is quite an amount of evidence scattered throughout the 'Poetics' that Aristotle has his master in mind. He seems to be making up a case for poetry-dramatic poetry especially-against the indictment of Plato.

Moreover, purification does not logically presuppose pleasure. As an explanation of tragic pleasure, then, this interpretation falls through. Further, it lends a moral tinge to the function of tragedy. This is not quite in keeping with either the general tone of the 'Poetics' or those passages in the Poetics where instruction and *katharsis* are kept apart. This imposition of a moral purpose upon Art has no warrant from Aristotle himself. His is the first 'detached treatment' in European literature. He is concerned with Poetry itself—its nature, technique, requirements etc. Very much unlike his master, he does not drag in other topics. The moral colouring is decidedly out of place. *Katharsis* can be confined to the psychic effect of tragedy, only if the 'purification'-theory is rejected.

During the Renaissance, one form of this theory found a very enthusiastic exponent in Heinsius. Milton, in his prefare to 'Samson Agonistes', writes: "Tragedy, as it was anciently composed, hath been ever held the gravest, moralest, and most profitable of all other poems: therefore said by Aristotle to be of power, by raising pity and fear, or terrour, to purge the mind of those and such like passions, that is, to temper and reduce them to just measure with a kind of delight, .....". The word 'moralest', and the phrase "to temper and reduce them to just measure" indicate that Milton is here expounding the purification-theory of the Aristotelian *katharsis*.

This theory was given a specific shape in the eighteenth century by Lessing in the 'Hamburg Dramaturgy'—through the ethical system of Aristole which is built around the concept of the golden mean. Every virtue is the golden mean between an extreme of excess and an extreme of defect (Spenser took over this theory in his 'Faerie Queene'). Pity and fear are purified from the two extremes of excess and defect. This amounts to the Heinsian and Miltonic explanations.

Therefore, in the light of this Aristotelian definition, pity and fear are transformed into virtues. How exactly does this transformation occur? Milton says: "by reading or seeing those passions well imitated." According to Heinsius and Lessing, pity and fear, by being habitually excited in the theatre, are weakened, therefore 'tempered'.

Here again the palpable defect is contained in the easily discernible moral colouring. Moreover, if one speaks of pity and fear being "tempered and reduced to just measure", one would be left finally with moderate pity and moderate fear. The latter as a virtue seems to be a trifle absurd. As for the former, one might say that it is good for the mind to have some amount of wholesome fear; but then, the function of tragedy is certainly not very exalted. If a man has very little of pity, the function of tragedy would be to increase the amount to the desired level; but if a man has very little of fear, would a similar treatment be very desirable? It *does* require quite a stretch of one's belief and imagination to say that moderate fear is a virtue while the absence of it entirely is a vice. We are led to this very absurd position by this particular definition of *katharsis*.

Heinsius and Lessing also assume that if certain emotions are frequently stirred they would be weakened. But the result might be the very opposite of this assumption: those emotions might get rooted in the mind. And the assumption of frequency of performance would not at all apply to Greek tragedy. Tragedy was performed in Greece only once in winter and once in spring—at the festivals of Dionysius. In winter the power of regeneration was invoked, so that nature would come to life again; in spring the fulfilment of this prayer was celebrated.

This comparative infrequency of performance lends additional strength to the theory of expulsion by excitation. As Plato said, this kind of dangerous process should be applied very rarely. It is rather a drastic form of treatment. Ordinarily, said Plato, diseases should not be thus irritated. If frequent, this kind of treatment would be simply out of the question, in psychotherapy as well as medicine.

In the case of purification, the objects of treatment are the emotions themselves. In the case of expulsion, the object of treatment is the mind or the soul. This is an important distinction.

This, however, does not end the business. It is very important to decide the exact abiding value of such a concept applied to tragedy.

The concept has two distinct parts—the kind of tragic effect aimed at, and the mechanism to bring it about. Only with reference to the latter Aristotle uses the word *katharsis*. The effect intended is quite another thing.

About the mechanism there is room for dispute. Even the acceptance of the expulsion theory does not leave us with an absolutely clear conscience. Why should there be occasion at all for the elimination of pity and fear from our soul? The average man does not live in contact with the darker side of life. It is therefore quite a big assumption that morbidity in him is such a burden that he must visit the theatre and relieve himself. It is not easy to visualise ourselves as completely devoid of pity and fear when we leave the theatre. It does not actually happen. It is also somewhat ludicrous to think that twice a year one needs this specific treatment. It is almost like visiting the dentist twice a year.

All this leaves unaffected the precise tragic effect which Aristotle had in mind. Aristotle demands that tragedy should end in something like a working off, not in a working on. The storm should die down. The final note should not be of upheaveal but of repose.

This ideal of tragedy is necessarily implied by the use of the word *katharsis* in that sense—that the effect of a work of art on the soul is the finer the more it succeeds in leaving the mind in repose rather than unrest. This is the abiding value of the concept. It challenges consideration at all places, in all literature.

This follows as a logical corollary from Greek art itself. If we have to speak of the distinctive features of Greek art—one of them must be repose. Something of the serenity of the Mediterranean regions seems to have passed into Greek sculpture. Aristotle's idea of *katharsis* is a translation of this principle into tragedy.

Hence, when Aristotle says that tragedy should end in a working off, he is voicing a typical Greek demand. Even if it had not been theorised on, the demand would have followed from the practice of their sculpture. Tragedy should rather be like the 'Mourning Athena' than 'Laecuoön'.

Whatever be the controversies regarding the process, this claim can be made for the ideal—even if one says that there might be other ideal, this remains as beautiful an ideal as ever, not only in Tragedy but in all Art.

Thanks to the Greek practice of having the catastrophe off the stage, much of the upheaval of feelings necessarily associated with tragedy was worked off. That tones the thing down immediately—the tragedy must continue for at least a few lines after the catastrophe. The last choruses are always surpassingly beautiful—half-sympathy and half-philosophy. The mood evoked is necessarily one of acceptance and resignation. As Marcus Aurelius says: "Oedipus may cry, Woe, Woe, Satiron, but the spectator knows he must bear his burden."

Most modern plays come to a close when the mind is at the height of a storm. On the Elizabethan stage, even in the absence of a conscious theory and a conscious motive of imitation, by a lucky accident they arrived at the Greek effect. The Elizabethans, barbarians at heart, demanded that tragedy should end with a few deaths performed on the stage. But the Elizabethan stage had no front curtain. The dead bodies had to be carried off, the direction for it being incorporated in the dialogue. After the removal of the dead bodies, a few quiet and dignified lines were spoken. The end was repose:

> "The weight of this sad time we must obey; Speak what we feel, not what we ought to say. The oldest hath borne most: we that are young Shall never see so much, nor live so long."

> > (-King Lear, V. 3. 323-6).

Even on the modern stage here and there one *does* come across plays where the curtain comes down with full realisation of tragic repose. Galsworthy's 'Strife' is a stormy play, full of bitter hatred and acrimonious controversies. At the close the two protagonists—the unyielding Capitalist and the unyielding Labour leader are unintentionally face-to-face. They lose their power of speech and simply look down in silent admiration of each other's magnificent courage. The head is automatically bowed down. The tragedy ends in silence.

John Synge's 'Riders to the Sea' has a very poised and reposeful close. All the sons of Maurya, an old woman, have been taken by the sea. When the corpse of the last one is bourne in, there follows the low moaning in the Irish fashion (keening). After that Maurya gets back to her feet and says "No man at all can be living forever and we must be satisfied". On that, the curtain comes down.

That is perhaps the hallmark of all great tragedy—Greek, Elizabethan and modern—that the tragic experience should be chastening rather than disturbing. That is the essence of the Aristotelian demand about tragedy. That is what he meant when he used that word *katharsis* in that peculiar fashion. This then is the abiding virtue.



N.B. The extracts from the 'Poetics' are from Bywater's translation of Aristotle on the Art of Poetry.

### **Editors**:

- 1914-15 PRAMATHA NATH BANERJEE, B.A.
- 1915-16 MOHIT KUMAR SEN GUPTA, B.A.
- 1916-17 MOHIT KUMAR SEN GUPTA, B.A.
- 1917-18 SAROJ KUMAR DAS, B.A.
- 1918-19 Amiya Kumar Sen, B.A.
- 1919-20 MAHMOOD HASAN, B.A.
- 1920-21 Phiroze E. Dastoor, B.A.
- 1921-22 SYAMA PRASAD MOOKERJEE, B.A.
- 1921-22 BRAJAKANTA GUHA, B.A.
- 1922-23 UMA PRASAD MOOKERIEE
- 1923-24 Subodh Chandra Sen Gupta
- 1924-25 SUBODH CHANDRA SEN GUPTA, B.A.
- 1925-26 ASIT KRISHNA MUKHERJEE, B.A.
- 1926-27 HUMAYUN Z. A. KABIR, B.A.
- 1927-28 HIRENDRA NATH MUKHERJEE, B.A.
- 1928-29 SUNIT KUMAR INDRA, B.A.
- 1929-30 TARAKNATH SEN, B.A.
- 1930-31 BHABATOSH DATTA, B.A.
- 1931-32 AJIT NATH ROY, B.A.
- 1932-33 SACHINDRA KUMAR MAJUMDAR, B.A.
- 1933-34 NIKHILNATH CHAKRAVARTY, B.A.
- 1934-35 Ardhendu Baksi, B.A.
- 1935-36 Kalidas Lahiri, B.A.
- 1936-37 Asok Mitra, B.A.
- 1937-38 BIMAL CHANDRA SINHA, B.A.
- 1938-39 PRATAP CHANDRA SEN, B.A.
- 1938-39 NIRMAL CHANDRA SEN GUPTA, B.A.
- 1939-40 A. Q. M. MAHIUDDIN, B.A.
- 1940-41 MANILAL BANERJEE, B.A.
- 1941-42 ARUN BANERJEE, B.A.
- 1942-46 No publication due to Govt. Circular

Re. Paper Economy

- 1947-48 SUDHINDRANATH GUPTA, B.A.
- 1948-49 SUBIR KUMAR SEN, B.A.
- 1949-50 DILIP KUMAR KAR, B.A.
- 1950-51 KAMAL KUMAR GHATAK, B.A.
- 1951-52 SIPRA SARKAR, B.A.
- 1952-53 Arun Kumar Das Gupta, B.A.
- 1953-54 ASHIN RANJAN DAS GUPTA, B.A.
- 1954-55 SUKHAMOY CHAKRAVARTY, B.A.
- 1955-56 Amiya Kumar Sen, B.A.
- 1956-57 ASOKE KUMAR CHATTERJEE, B.A.
- 1957-58 ASOKE SANJAY GUHA, B.A.
- 1958-59 KETAKI KUSHARI, B.A.
- 1959-60 GAYATRI CHAKRAVORTY, B.A.

\_\_\_\_\_

#### Secretaries :

- 1914-15 Jogesh Chandra Chakravarti, B.A.
- 1915-16 PRAFULLA KUMAR SIRCAR, B.A.
- 1916-17 PRAFULLA KUMAR SIRCAR, B.A.
- 1917-18 RAMA PRASAD MUKHOPADHYAY, B.A.
- 1918-19 MAHMOOD HASAN, B.A.
- 1919-20 PARAN CHANDRA GANGOOLI, B.A.
- 1920-21 Syama Prasad Mookerjee
- 1921-22 BIMAL KUMAR BHATTACHARYYA
- 1921-22 Uma Prasad Mookerjee
- 1922-23 AKSHAY KUMAR SIRCAR
- 1923-24 BIMALA PRASAD MUKHERIEE
- 1924-25 BIJOY LAL LAHIRI
- 1926-27 Lokes Chandra Guha Roy
- 1927-28 SUNIT KUMAR INDRA
- 1928-29 Syed Mahbub Murshed
- 1929-30 AIIT NATH ROY
- 1930-31 AIIT NATH ROY
- 1931-32 NIRMAL KUMAR BHATTACHARJEE
- 1932-33 NIRMAL KUMAR BHATTACHARJEE
- 1933-34 GIRINDRA NATH CHAKRAVARTI
- 1934-35 SUDHIR KUMAR GHOSH
- 1935-36 Provat Kumar Sircar
- 1936-37 Arun Kumar Chandra
- 1937-38 RAM CHANDRA MUKHERJEE
- 1938-39 Abu Sayeed Chowdhury
- 1939-40 BIMAL CHANDRA DATTA, B.A.
- 1940-41 PRABHAT PRASUN MODAK, B.A.
- 1941-42 Golam Karim
- 1942-46 No publication due to Govt. Circular

Re. Paper Economy

- 1946-47 **JIBANLAL DEV**
- 1947-48 NIRMAL KUMAR SARKAR
- 1948-49 BANGENDU GANGOPADHYAY
- 1949-50 Sourindramohan Chakravarty
- 1950-51 MANAS MUKUTMANI
- 1951-52 KALYAN KUMAR DAS GUPTA
- 1952-53 JYOTIRMOY PAL CHAUDHURI
- 1953-54 PRADIP KUMAR DAS
- 1954-55 PRADIP RANJAN SARBADHIKARI
- 1955-56 DEVENDRA NATH BANNERJEE
- 1956-57 SUBAL DAS GUPTA
- 1957-58 Debaki Nandan Mondal
- 1958-59 TAPAN KUMAR LAHIRI
- 1959-60 RUPENDU MAJUMDAR